১৪তম খণ্ড

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে

সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা উত্তরণের উপায়

চতুর্দশ খণ্ড

বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা: উত্তরণের উপায়
Governance Challenges of Bangladesh : The Way Forward
২০২২-২০২৩ সালে প্রকাশিত টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংকলন

চতুর্দশ খণ্ড
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২৪
© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তনির্ভর এই প্রকাশনায় উপস্থাপিত বিশ্লেষণ ও সুপারিশ টিআইবির মতামতের প্রতিফলন, যার দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট গবেষক ও টিআইবির।

সংকলনে অন্তর্ভুক্ত গবেষণাগুলোর উপদেষ্টা

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান
পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
সাবেক পরিচালক, রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ অলংকরণ
সামছুদ্দোহা সাফায়েত

মূল্য : ৪০০ টাকা

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
মাইডাস সেন্টার (৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন) (পুরোনো ২৭)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন : ৮৮০-২ ৪১০২১২৬৭-৭০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৪১০২১২৭২
ই-মেইল : info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ISBN: 978-984-35-6013-1

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ

প্রথম অধ্যায়
শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার রাজনৈতিক অঙ্গীকার **১৫**
কাওসার আহমেদ, মো. জুলকারনাইন ও মুহাম্মদ বদিউজ্জামান

নির্বাচনী হলফনামার তথ্যচিত্র : জনগণের জন্য বার্তা কী? **২৭**
মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, রিফাত রহমান, কে. এম. রফিকুল আলম, ইকরামুল হক ইভান ও কাজী মাহদী আমিন

পার্লামেন্টওয়াচ : একাদশ জাতীয় সংসদ - ১ম হতে ২২তম অধিবেশন (জানুয়ারি ২০১৯ - এপ্রিল ২০২৩) **৬১**
রাবেয়া আক্তার কনিকা ও মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি **৮১**
ফাতেমা আফরোজ

e-Government Procurement in Bangladesh : A Trend Analysis of Competitiveness (2012-2023) **৮৯**
Mohammad Tauhidul Islam, Rifat Rahman and K. M. Rafiqul Alam

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেবা খাত

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় **১২৯**
মো. নেওয়াজুল মওলা, মো. সহিদুল ইসলাম ও মো. সাজ্জাদুল করিম

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় **১৪৭**
তাসলিমা আক্তার ও মো. মাহ্‌ফুজুল হক

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন **১৬১**
ফারহানা রহমান ও মো. সাজেদুল ইসলাম

ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ **১৭৩**
মো. মোস্তফা কামাল, রাজিয়া সুলতানা ও মো. জুলকারনাইন

গবেষক পরিচিতি **১৯৫**

মুখবন্ধ

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারি-বেসরকারি সেবা খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, বিশেষত দুর্নীতির প্রকৃতি, প্রক্রিয়া, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সব অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোয় প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করা এবং এর প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ১৩টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের চতুর্দশতম সংকলন ২০২৪ সালের একুশের বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। এই সংকলনকে দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে : প্রথম অধ্যায়ে শুদ্ধাচারব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা খাত নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সারসংক্ষেপ সংকলিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও নথিপত্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয় বিবেচনায় নিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, শুদ্ধাচারচর্চা ও সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর বিদ্যমান গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র বা রাজনৈতিক ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তির জন্য সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে গণতান্ত্রিক অগ্রগতির পূর্বশর্ত হিসেবে সুশাসন ও শুদ্ধাচারচর্চা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণের জনপ্রত্যাশা এখনো পূরণ হয়নি। মৌলিক জাতীয় বিষয়ে ঐকমত্য অর্জনে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি, প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও পারস্পরিক বিপরীতমুখী রাজনীতি, স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক সুবিধার স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের দলীয়করণ, ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক, সুশাসিত এবং জবাবদিহিমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অপ্রতিরোধ্য বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক দল অন্যতম। একটি রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন ও শুদ্ধাচারচর্চা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক দলের দৃঢ় অঙ্গীকার ও চর্চা ব্যতীত গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় অর্থবহ ও টেকসই অগ্রগতি অর্জন সম্ভব নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে টিআইবি এ

প্রবন্ধে রাজনৈতিক দলের জন্য দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও শুদ্ধাচারচর্চা নিশ্চিতে মোট ১২টি ক্ষেত্রে মোট ৭৬টি সুপারিশ প্রস্তাব করেছে।

এ প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে নির্বাচনী হলফনামার তথ্যাবলি বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহি ও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ কাঠামোতে ফেলে বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বড় পরিসরে হলফনামার সব তথ্যকে আরও বিশ্লেষণযোগ্য ও সহজলভ্য করার মাধ্যমে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ অংশীজন কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার অংশ হিসেবে হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করা ও প্রাপ্ত ফলাফল জনগণের জন্য কী বার্তা দেয়– তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীদের হলফনামা প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন। স্বপ্রণোদিত হয়ে ইসি কোনো পদক্ষেপ নেয় না বা সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করে না। আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে, বিশেষ করে প্রদত্ত হিসাব পরিপূর্ণ কি না এবং অর্জিত আয় ও সম্পদ বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা যাচাই করতে রাজস্ব বিভাগ বা দুর্নীতি দমন কমিশনকেও উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না।

অধ্যায়টিতে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পর্যালোচনাপূর্বক কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করছে টিআইবি। এর মধ্যে রয়েছে-হলফনামায় প্রদর্শিত তথ্য কতটুকু সত্য- তা নিরূপণে কার্যকর ও কারিগরি যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়া, স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদর্শিত আয়-সম্পদ এবং ঋণ-দায় বিবরণী কতটুকু সঠিক এবং আয় ও সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে অর্জিত, তা নির্বাচন কমিশনকর্তৃক যাচাই, হলফনামায় প্রার্থীরা নিজেদের অর্জিত সম্পদ পুরোপুরি প্রদর্শন করেছেন কি না, কিংবা দেশে বা বিদেশে সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন কি না তা নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক যাচাই ও প্রমাণসাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রার্থীদের অবিশ্বাস্য মাত্রায় অনেকেরই সম্পদ বৃদ্ধি বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং তা না হলে জবাবদিহি নিশ্চিত করার কোনো উদ্যোগ নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ের তৃতীয় প্রবন্ধে শুদ্ধাচারব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসেবে একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম থেকে বাইশতম অধিবেশনের ওপর টিআইবির নিয়মিত পর্যবেক্ষণভিত্তিক গবেষণা ‘পার্লামেন্ট ওয়াচ’-এর সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী অনুযায়ী দলীয় সরকারের অধীনে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তবে সব রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষপাতমূলক এবং সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ও বৈষম্যমূলক ভূমিকার কারণে প্রশ্নবিদ্ধ এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (৮৯ দশমিক ২ শতাংশ আসন) নিয়ে সরকার গঠন করে। দশম সংসদের মতো এই সংসদেও সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাচনকালীন

মহাজোটের একটি দল নিয়মরক্ষার প্রধান বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে, যা গণতান্ত্রিক চর্চার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। গবেষণায় দেখা যায়, সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে, বিশেষত আইন প্রণয়ন, বাজেট প্রণয়ন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে তাদের একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চা জোরদার হয়েছে। অন্যদিকে আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ঘাটতি, সংসদীয় কমিটির অকার্যকারিতা ও সংসদীয় তথ্যের উন্মুক্ততার ক্ষেত্রে ঘাটতি, কার্যকর বিরোধী দলের অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে সার্বিকভাবে সংসদের কার্যক্রম অনেকটাই কেবল আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়। পূর্ববর্তী সংসদগুলোর মতো একাদশ সংসদেও স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতের ক্ষেত্রে অনীহা লক্ষণীয় ছিল। সংসদীয় কার্যক্রমে বিষয়ভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক ও গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে সরকার ও দলীয় অর্জন ও প্রশংসা এবং প্রতিপক্ষ দলের প্রতি আক্রমণাত্মক সমালোচনাই প্রাধান্য পেয়েছে। সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রধান বিরোধী হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত দল প্রত্যাশা অনুযায়ী শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারেনি। তবে অনেক ক্ষেত্রে বিরোধী দল হতে গঠনমূলক মতামত উত্থাপিত হলেও তা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি দলের অনীহা লক্ষণীয় ছিল। অন্যদিকে, আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার আগের তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও গঠনমূলক আলোচনা ও বিতর্কের ঘাটতি ছিল। পূর্ববর্তী সংসদগুলোর তুলনায় সার্বিকভাবে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের হার হ্রাস পেয়েছে। সংসদ কর্তৃক জনগণের পক্ষ হয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং সরকারের জবাবদিহির অন্যতম মাধ্যম সংসদীয় কমিটিগুলো প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এ ছাড়া সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত অঙ্গীকারের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নও এই সংসদে দেখা যায়নি।

এ অধ্যায়ের চতুর্থ প্রবন্ধে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UN Convention Against Corruption-UNCAC)-এর সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এই প্রবন্ধে বাংলাদেশে সনদের দ্বিতীয় অধ্যায় (প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাসমূহ) এবং পঞ্চম অধ্যায়ের (সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) অন্তর্ভুক্ত অঙ্গীকারগুলো বাস্তবায়নবিষয়ক পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে চলমান জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে সহায়তার লক্ষ্যে এই গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রবন্ধে বর্তমান সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক এবং সনদের উল্লিখিত অধ্যায় দুটির উল্লেখযোগ্য কিছু অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ, সফলতা, সীমাবদ্ধতা তথা সার্বিক অগ্রগতির পর্যালোচনা এবং সনদের অধিকতর কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নযোগ্য নীতিনির্ধারণী ও দিকনির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে। এই পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাংলাদেশ এই সনদ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ও বিধিবিধান প্রণয়নে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন

করেছে। যদিও বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কার্যকারিতা এবং আইন ও বিধিবিধানের যথার্থ বাস্তবায়নে বা চর্চায় সুস্পষ্ট ঘাটতি বিদ্যমান।

এ অধ্যায়ের পঞ্চম প্রবন্ধে ই-সরকারি ক্রয়ে (ই-জিপি) প্রতিযোগিতামূলক চর্চার প্রবণতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সরকারি ক্রয় সারা বিশ্ব তথা বাংলাদেশে দুর্নীতির ঝুঁকিপূর্ণ খাতগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি খাত। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত টিআইবি পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নির্বাচিত সরকারি খাত এবং প্রতিষ্ঠানগুলোতে সরকারি ক্রয়ে দুর্নীতির কারণে প্রাসঙ্গিক বাজেটের ৮ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ২৭ শতাংশ অপচয় হয়। বাংলাদেশ সরকার সমস্ত সরকারি কাজে ডিজিটাইজেশনের অংশ হিসেবে জুন ২০১১ সালে ই-জিপি নামে পরিচিত ইলেকট্রনিক সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা চালু করে। ই-জিপির মূল উদ্দেশ্য উন্মুক্ততা ও ন্যায্য প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করে সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা এবং সর্বনিম্ন মূল্য ও সর্বোচ্চ গুণমান নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্নীতি হ্রাস করা। ই-জিপি ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ক্রয় প্রক্রিয়া সহজ হলেও, এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রয়কৃত কাজের মানের ক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী ইতিবাচক প্রভাব লক্ষ করা যায়নি। ই-জিপি চালু হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের যোগসাজশের মাধ্যমে সংঘবদ্ধ বিডিং এবং অবৈধভাবে ক্রয়াদেশ বিক্রয় বা সাবকন্ট্রাক্টে দেওয়ার মতো দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যায়। এ প্রবন্ধে ২০১২ সাল থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে সরকারের ই-জিপি পোর্টালে সবার জন্য উন্মুক্ত সরকারি ক্রয়বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে ই-জিপি প্রক্রিয়ায় সম্পাদিত ক্রয় কার্যক্রমে প্রতিযোগিতার মাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। ই-জিপির তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, বিডের সংখ্যা সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (ওপেন টেন্ডারিং মেথড) দরপত্র জমা পড়ার গড় হার কম। ঠিকাদার ও ক্রয়কারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির চেয়ে সীমিত দরপত্র পদ্ধতি (লিমিটেড টেন্ডারিং মেথড) বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং এককভাবে দরপত্র জমা ও কার্যাদেশ প্রাপ্তির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে ৫ শতাংশ দরদাতা কর্তৃক ৩০ শতাংশ ক্রয়াদেশ বা চুক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে। এগুলো ই-ক্রয় প্রক্রিয়ার মূল উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে বাজার দখলের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা নির্দেশ করে। তা ছাড়া, সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রভাব এবং দরপত্র জমাদানের ক্ষেত্রে অংশীজনদের মধ্যে সিন্ডিকেশন ও যোগসাজশেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে সরকারের বিভিন্ন সেবা খাত ও এর অধীনে সেবা প্রতিষ্ঠানের ওপর কয়েকটি গবেষণার সারাংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের প্রথম প্রবন্ধে 'চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণার ফলাফল সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রবন্ধে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত আইনের বিবিধ দুর্বলতা চিহ্নিত করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক বিদ্যমান চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত আইন, বিধিমালা, গাইডলাইন, সম্পূরক বিধি এবং নির্দেশিকা প্রয়োগ ও প্রতিপালনে ঘাটতির চিত্র উঠে এসেছে। চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ)

বিধিমালা, ২০০৮ প্রণয়নের পর ১৪ বছরেও তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি 'কর্তৃপক্ষ' গঠনের কথা থাকলেও তা করা হয়নি। অন্যতম অংশীজন হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতাল ও সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টজন বিদ্যমান আইনিকাঠামো এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত না। একই সাথে চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সমন্বয় এবং অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি রয়েছে। অধিকাংশ হাসপাতাল ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, বাজেট, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। এ ছাড়া চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে বিবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী নিয়োগে বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে অবহেলা এবং বিবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি থাকলেও তা প্রতিরোধে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। ফলে সংক্রমণসহ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশদূষণের ঝুঁকি ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিকভাবে গবেষণায় দেখা যায়, চিকিৎসা বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও ক্ষেত্রটিকে যথাযথ প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।

এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় প্রবন্ধে 'হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়' শীর্ষক গবেষণার সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। এই গবেষণায় হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সেবা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি, বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগে ব্যর্থতাসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিবিধ দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা ক্ষেত্রবিশেষে অনুপস্থিত রয়েছে। বিডিআরসিএসের চেয়ারম্যানের হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং হাসপাতাল পরিচালনা কার্যক্রমে তার অবারিত হস্তক্ষেপ থাকায় সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগে প্রতিকূলতাসহ হাসপাতাল পরিচালনায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব, অস্বচ্ছতা ও জবাবদিহিহীনতা স্বাভাবিকতায় পরিণত হয়েছে। নিয়মিতভাবে লাইসেন্স নবায়ন ও হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনা, ক্রয় কার্যক্রম, তথ্য প্রকাশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই হাসপাতালের বিদ্যমান আইন অমান্য করার বিষয় এ গবেষণায় উঠে এসেছে। হাসপাতালের জন্য সুনির্দিষ্ট জনবলকাঠামো (অর্গানোগ্রাম) না থাকায় অপরিকল্পিত নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ঘটনা এবং হাসপাতালের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জবাবদিহির অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিভিন্ন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার থেকে প্রাপ্ত অনুদান এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব হাসপাতাল কর্তৃক সঠিকভাবে নথিভুক্ত করা হয় না, যা অংশীজনদের আস্থার সংকট তৈরি করেছে। কর্তৃপক্ষ হাসপাতালটিতে আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সুযোগ-সুবিধাসহ সেবার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতেও ব্যর্থ হয়েছে। বিবিধ সক্ষমতার ঘাটতি পূরণ ও আয় বৃদ্ধিতে যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাবও লক্ষণীয়। এ ছাড়া হাসপাতালে অদক্ষ কর্মীদের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

করা হয়েছে। বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের সাথে অসম চুক্তি সম্পাদনসহ বিবিধ অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে চিকিৎসাসেবার মান নিম্নগামী হয়েছে, রোগীর সংখ্যা ও হাসপাতালের আয় হ্রাস পেয়েছে। সমপর্যায়ের অন্যান্য হাসপাতালের সাথে প্রতিযোগিতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়ে এটি ক্রমেই একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি, হাসপাতালটি সুশাসনের ঘাটতির দীর্ঘ পরিক্রমায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতির (মানবতা, পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছামূলক সেবা, একতা এবং সর্বজনীনতা) পরিপন্থী চর্চায় জর্জরিত, যা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বিনষ্ট করছে।

তৃতীয় প্রবন্ধে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন সংশ্লিষ্ট একটি পর্যালোচনা প্রতিবেদনের সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরা অন্যদের তুলনায় বেশি এবং বহুমুখী প্রতিকূলতার শিকার হয়। দুস্থ নারীদের দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি অন্যতম, যা আগে 'ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট বা দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি)' নামে পরিচিত ছিল। এ কার্যক্রমে উপকারভোগী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালনের উদ্দেশ্যে টিআইবির অনুপ্রেরণায় পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সহায়তায় ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যরা বিগত তিন চক্রে (২০১৯-২০২০, ২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩) সর্বমোট ৪৩টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ১০১টি উপজেলায় তালিকা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে। এ প্রবন্ধে এই তিন চক্রের তালিকা যাচাইয়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখা যায়, মাঠপর্যায়ে তৃতীয় পক্ষের যাচাই-বাছাই উপকারভোগী নির্বাচনের ত্রুটি সংশোধন করে প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচনের সুযোগ তৈরি করেছে। টিআইবির উদ্যোগে তিনটি চক্রে সর্বমোট ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই করা হয় এবং সর্বমোট ১১ হাজার ৯৭৪ জন অনুপযুক্ত উপকারভোগী চিহ্নিত করা হয় এবং অনুপযুক্ত উপকারভোগীর স্থলে অপেক্ষমাণ তালিকার ৮ হাজার ৯০৪ জন প্রকৃত উপকারভোগীকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়। এই ত্রুটি সংশোধনের ফলে ৬ হাজার ৪১০.৮৮ (প্রাক্কলিত) মেট্রিকটন চাল প্রতিস্থাপিত প্রকৃত উপকারভোগী ভোগ করতে পেরেছেন। এ ছাড়া তারা বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। প্রবন্ধে আরও দেখা যায়, ভিডব্লিউবি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ভোট প্রাপ্তির আশা, ইত্যাদি অব্যাহত থাকায় প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন ঝুঁকির সম্মুখীন। এ ছাড়া সমন্বিত তথ্যভান্ডারের অনুপস্থিতি, কার্যকর যাচাই-বাছাই এবং সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে সৃষ্ট ত্রুটি ভিডব্লিউবি কর্মসূচি তথা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে সুশাসন নিশ্চিত করা কঠিন হচ্ছে।

এ অধ্যায়ের চতুর্থ প্রবন্ধে 'ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণার সারাংশ উপস্থাপিত হয়েছে। এডিস মশাবাহিত সংক্রামক রোগ ডেঙ্গু, চিকুনগুনিয়া ও জিকা কয়েক দশকজুড়ে সারা বিশ্বের বিভিন্ন গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশে অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এবং প্রতিবছর প্রায় ৪০ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশেও গত দুই দশকে ডেঙ্গু একটি প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ২০২৩ সালে ডেঙ্গুর প্রকোপ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা আগের যে কোনো বছরের অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে গেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলে গণ্য করার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টেও সব ধরনের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের মহামারি নির্মূল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ ধারাবাহিকভাবে বছরব্যাপী বিদ্যমান থাকলেও এই রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক ও সরকারিভাবে পর্যাপ্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড ও আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসরণ না করে এবং কোভিড সংকট মোকাবিলার অভিজ্ঞতাকে কাজে না লাগিয়ে সমন্বয়হীনভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে। সুনির্দিষ্ট কৌশলবিহীন ও বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কার্যকর না হওয়া এবং ডেঙ্গুর প্রকোপ দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া ও বছরব্যাপী অব্যাহত থাকার অন্যতম কারণ হচ্ছে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি। ঢাকার বাইরে এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ডেঙ্গু রোগের পর্যাপ্ত চিকিৎসাব্যবস্থা না থাকা ২০২৩ সালে আক্রান্তরা ও মৃত্যুর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার অন্যতম কারণ।

এই সংকলনের গ্রন্থনা ও সম্পাদনা করেছেন টিআইবির রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের রিসার্চ ফেলো ফারহানা রহমান। সম্পাদনাকাজে তত্ত্বাবধান ও সহায়তা করেছেন রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো মো. জুলকারনাইন এবং সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে ছিলেন রিসার্চ ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মাদ বদিউজ্জামান। প্রকাশনা-সংক্রান্ত কাজ সম্পন্ন করেছেন আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশনস বিভাগের সহ-সমন্বয়ক মাসুম বিল্লাহ। তাদেরসহ অন্য সব বিভাগের সংশ্লিষ্ট সহকর্মী যারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। এ ছাড়া গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট খাত ও প্রতিষ্ঠানের সব পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ বিশেষজ্ঞ ও অংশীজন, যারা তথ্য প্রদানসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন, তাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

সংকলনটি বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার পথে চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণে আগ্রহী পাঠকের ভালো লাগবে–এ প্রত্যাশা করছি। এতে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি প্রবন্ধে মূল গবেষণাপ্রসূত সুনির্দিষ্ট সুপারিশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুপারিশসহ বিস্তারিত গবেষণা প্রতিবেদনগুলো টিআইবির ওয়েবসাইটে

প্রকাশিত রয়েছে (www.ti-bangladesh.org)। এসব সুপারিশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করবে এবং যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে–টিআইবির এ প্রত্যাশা। সংকলন সম্পর্কে পাঠকের মন্তব্য ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

প্রথম অধ্যায়
শুদ্ধাচার ব্যবস্থা

গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার রাজনৈতিক অঙ্গীকার টিআইবির সুপারিশমালা*

কাওসার আহমেদ, মো. জুলকারনাইন ও মুহাম্মদ বদিউজ্জামান

প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ হিসেবে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পরবর্তী ৫২ বছরে অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে, বিশেষ করে দারিদ্র্যবিমোচন, মাতৃ ও শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে মাথাপিছু আয় ১৯৭১ সালের ১৩৪ মার্কিন ডলার থেকে বর্তমানে ২ হাজার ৭৬৫ মার্কিন ডলারে উন্নীত করে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার পথে যাত্রা করেছে।[১] স্বাধীনতা-পরর্বতীকালে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বরাবর অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা বিরাজ করেছে। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে অগণতান্ত্রিক শক্তির উত্থান গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং অগ্রযাত্রাকে প্রতিনিয়িত ব্যাহত করেছে। তবে দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৯১ সালে গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক জোট কর্তৃক একটি রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়েছিল। ওই রূপরেখায় স্বাক্ষর করার মাধ্যমে প্রধান তিনটি রাজনৈতিক জোট অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ, সার্বভৌম সংসদ গঠন, জবাবদিহিমূলক নির্বাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা, গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গীকার করেছিল।[২] পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন হলেও রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার ঘাটতির ফলে বারবার গণতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুতি ও নির্বাচনকালীন সহিংসতার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুশাসন ও গণতন্ত্রায়নকে প্রাধান্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ও কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে।[৩] রাষ্ট্র ও সমাজে দুর্নীতি দমন ও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করা হয়, যেখানে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আইনকানুন ও বিধিবিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ,

---

* ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচার চর্চার রাজনৈতিক অঙ্গীকারে টিআইবির সুপারিশমালা।

প্রতিষ্ঠানের পদ্ধতিগত সংস্কার এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-তে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ'-এর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।[৫]

গণতন্ত্র ও সুশাসন পরিপূরক হিসেবে কাজ করে এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই ও চলমান রাখতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সুশাসন ও শুদ্ধাচারচর্চা গুরুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক চর্চার মূল ভিত্তি হচ্ছে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, নাগরিক ও রাজনৈতিক পরিসরে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা। সুশাসন হচ্ছে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, অংশগ্রহণমূলক, সহজগম্য ও কার্যকর শাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারচর্চা করা।[৬] বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতির ফলে বারবার গণতান্ত্রিক পথ থেকে বিচ্যুতি ও নির্বাচনকালীন সহিংসতার দিকে প্রতিনিয়ত ধাবিত হচ্ছে। এ ছাড়া আইনগত দুর্বলতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, সক্ষমতার ঘাটতি, দুর্নীতি, জবাবদিহির ঘাটতি, বিচারহীনতা, দায়মুক্তি ইত্যাদি কারণে গণতান্ত্রিক ও শুদ্ধাচারচর্চা ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথভাবে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারছে না। এর ফলে গণতন্ত্র ও শুদ্ধাচারচর্চাবিষয়ক বিভিন্ন বৈশ্বিক সূচকে বাংলাদেশের অবস্থানের ক্রমাবনতি লক্ষ করা যাচ্ছে।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে অন্তর্ভুক্ত অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক দল অন্যতম।[৭] গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করে নাগরিকেরা নিজেদের চাহিদা সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বা যোগাযোগ স্থাপন করে।[৮] রাজনৈতিক দলগুলো সুশাসন ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে তাদের অঙ্গীকার ও কর্মপরিকল্পনা সবার উদ্দেশ্যে তুলে ধরার জন্য গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও ইশতেহার প্রকাশ করে। রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকার ও তার কার্যকর বাস্তবায়ন একদিকে যেমন আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে, অন্যদিকে জনগণের কাছে জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক সুশাসনকাঠামো সুদৃঢ় করার অনুঘটক হিসেবেও কাজ করে। আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সুশাসন ও শুদ্ধাচারচর্চা গুরুত্বপূর্ণ হলেও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন, আইনের শাসন, স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত শাসন প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণের জনপ্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

বাংলাদেশে এখনো রাজনৈতিক দলের অঙ্গীকারের যথার্থ প্রায়োগিক গুরুত্ব বা তাৎপর্য অর্জন করতে না পারলেও জবাবদিহিমূলক গণতান্ত্রিক কাঠামো সুদৃঢ়, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কার্যকর করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা অনস্বীকার্য। জাতীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠান, কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন বিষয়ে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ধারাবাহিক গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সুশাসন-

শুদ্ধাচারচর্চা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট বিষয়কে রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গীকার/গঠনতন্ত্রে অন্তর্ভুক্তি ও এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য টিআইবি কর্তৃক এই সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুপারিশমালা প্রণয়নে অনুসৃত-প্রক্রিয়া

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সুশাসন ও শুদ্ধাচারচর্চায় রাজনৈতিক অঙ্গীকারবিষয়ক সুপারিশমালা প্রণয়নে সমসাময়িক রাজনৈতিক ও আর্থসামজিক প্রেক্ষাপটের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নিচের নথিপত্র পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে−

- জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর টিআইবির পূর্ববর্তী গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে প্রণীত প্রতিবেদন।
- প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র ও ইশতেহার।
- রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারের অঙ্গীকার বাস্তবায়নবিষয়ক টিআইবির পূর্ববর্তী গবেষণা ও প্রস্তাবিত সুশারিশমালা।
- প্রাসঙ্গিক আইন, গণমাধ্যমের সংবাদ, প্রবন্ধ ও পুস্তক।
- সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রতিবেদন।

সুপারিশ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিবেচ্য বিষয়

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, শুদ্ধাচারচর্চা ও সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর বিদ্যমান গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র বা ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রণীত সুপারিশমালায় যেসব গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে তা হলো−

১. আইনের শাসন।

২. গণতন্ত্রায়ন ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ।

৩. রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ।

৪. স্বচ্ছ, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর শুদ্ধাচারচর্চা নিশ্চিতকরণ।

৬. অন্তর্ভুক্তিমূলক ও অর্থবহ আর্থসামাজিক উন্নয়ন।

৭. শক্তিশালী, নিরাপদ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার।

৮. সংগঠন করা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা।

৯. পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ রোধ।

গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচারচর্চার রাজনৈতিক অঙ্গীকারবিষয়ক সুপারিশমালা

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, শুদ্ধাচারচর্চা ও সর্বোপরি সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর বিদ্যমান গঠনতন্ত্র, ঘোষণাপত্র বা ইশতেহারে অন্তর্ভুক্তির জন্য প্রণীত সুপারিশমালা−

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও চর্চার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ

কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

১. সংসদীয় ব্যবস্থায় সংস্কার : সংসদীয় ব্যবস্থাকে কার্যকর করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামত গ্রহণ ও গণভোটের মাধ্যমে জনমত যাচাই সাপেক্ষে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

২. প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদ : সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক অর্থবহ নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদ গঠন করতে হবে।

৩. প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা : সুষ্ঠু, দলীয় প্রভাবমুক্ত ও নিরপেক্ষভাবে সংসদীয় ও সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকালে দলীয় প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগের বিধান করতে হবে।

৪. সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ : সংসদ সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে নিজ দলের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব ও বাজেট ব্যতীত আইন প্রণয়নসহ অন্য সব ক্ষেত্রে সদস্যদের নিজ দল সম্পর্কে সমালোচনা ও দলের বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

৫. স্পিকারের ভূমিকা : সংসদীয় কার্যক্রম সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে পরিচালনার স্বার্থে স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণকালে সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগের বিধান রাখতে হবে।

৬. সংসদ সদস্য আচরণ আইন প্রণয়ন : সংসদীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও সংসদের বাইরে সংসদ সদস্যদের আচরণ এবং তাদের কার্যক্রমে জবাবদিহি নিশ্চিতে 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়ন করতে হবে।

৭. কার্যকর সংসদীয় স্থায়ী কমিটি গঠন–

- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, বিশেষ করে সরকারি হিসাব; আইন, বিচার ও সংসদ, অর্থ, বাণিজ্য, স্বরাষ্ট্র, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।
- কমিটিতে কোনো সদস্যের স্বার্থসংশ্লিষ্টতার তথ্য পাওয়া গেলে সেই কমিটি থেকে তার সদস্যপদ বাতিলের বিধান বাস্তবায়ন করতে হবে।
- কমিটির নিয়মিতভাবে সভা করার বাধ্যবাধকতা মেনে চলা এবং এ ক্ষেত্রে স্পিকারের এখতিয়ারের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
- সব স্থায়ী কমিটিতে নারী সংসদ সদস্যের কার্যকর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে হবে।

রাজনৈতিক দলের কার্যক্রমে গণতন্ত্র, সুশাসন ও শুদ্ধাচারচর্চা

৮. রাজনৈতিক দলের সব ধরনের গৃহীত অনুদান, আয়-ব্যয়, বিশেষ কার্যক্রমভিত্তিক সংগৃহীত অর্থ এবং ব্যয়, প্রচারণাসহ নির্বাচনী ব্যয়, মনোনয়নকেন্দ্রিক আর্থিক লেনদেনকে একটি

প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার করতে হবে।

৯. রাজনৈতিক দলের অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য সব ধরনের আর্থিক লেনদেন সুনির্দিষ্ট ব্যাংক বা মোবাইল আর্থিক সেবা হিসাবের মাধ্যমে করতে হবে।

১০. রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দলীয় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেওয়ার পাশাপাশি সবার জন্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

১১. রাজনৈতিক দলগুলোর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে দলের কেন্দ্রীয় বা নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতাদের সম্পদের হিসাব জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।

১২. রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী প্রচারণার ব্যয় আইনে নির্ধারিত সীমার মধ্যে রাখতে হবে এবং এ বিষয়ক তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

১৩. দুর্নীতি ও অনিয়মের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে রাজনৈতিক দলের কোনো পদে না রাখা এবং নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না দেওয়ার বিধান রাখতে হবে।

১৪. রাজনৈতিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক চর্চা ও সুশাসন বজায় রাখতে এবং নতুন নেতৃত্বের বিকাশের সুযোগ তৈরি করতে দলের গঠনতন্ত্র অনুসারে দলের সব পর্যায়ে সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে দলের নেতৃত্ব বাছাই বা কমিটি গঠন করতে হবে।

১৫. রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনতন্ত্র অনুসারে নিয়মিতভাবে সব স্তরের কর্মী-প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সম্মেলন করতে হবে এবং সম্মেলনে দলীয় কার্যক্রম ও আয়-ব্যয় সম্পর্কে কর্মীদের অবহিত করা ও মতামত গ্রহণ করতে হবে।

১৬. 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধিত) আইন, ২০০৯' অনুযায়ী সব রাজনৈতিক দলের কমিটিতে অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং নির্বাচনে ন্যূনতম এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যকে মনোনয়ন দিতে হবে। এ ছাড়া নির্বাচনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী থেকে প্রার্থী মনোনয়ন বৃদ্ধি করতে হবে।

১৭. দক্ষ ও যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্ব গঠন ও দলের পক্ষ থেকে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করতে একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলীয় সংশ্লিষ্টতা ও অবদানকে যথাযথ প্রাধান্য দিয়ে তৃণমূল পর্যায় থেকে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের প্রাথমিক তালিকা সংগ্রহ এবং তাদের মতামতের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মনোনয়ন কমিটি কর্তৃক প্রার্থী চূড়ান্ত করতে হবে।

১৮. প্রতিটি রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে না পারলে বিরোধী দল হিসেবে তাদের রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে দলের সংসদ সদস্যদের নিয়ে একটি ছায়া সরকার গঠন করবে, ছায়া সরকারে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও আইন/নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও এর গঠনমূলক সমালোচনা করবে এবং প্রয়োজনে বিকল্প প্রস্তাবনা প্রদান করবে।

নির্বাচনী শুদ্ধাচারচর্চা

১৯. নির্বাচনকালীন সরকারের ভূমিকা : নির্বাচনকালীন সরকার এবং অন্যান্য অংশীজন, বিশেষ করে প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিরপেক্ষ ও স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত নির্বাচনকালীন ভূমিকা পালনে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক বা আইনি সংস্কার করতে হবে।

২০. নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ : অবাধ, সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত করতে একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত কমিশন গঠনের জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ সব কমিশনার নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনে অন্তর্ভুক্ত যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিতে অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

২১. নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা : গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধনী) ২০২৩-এর ৯১ (এ) সংশোধনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সংসদীয় আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল বাতিল করার ক্ষমতা রহিত করার মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা সংকুচিত করার এই ধারা পরিবর্তন করতে হবে।

২২. নির্বাচনী আচরণবিধি : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিযোগিতার সমান ক্ষেত্র (লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড) নিশ্চিতে নির্বাচন-পূর্ব সময়ে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের নির্বাচনকেন্দ্রিক আচরণবিধি সুস্পষ্ট করা এবং সব দল ও প্রার্থীর প্রচারণার সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

২৩. নির্বাচনী পরিবেশ পরিবীক্ষণ : তফসিল ঘোষণা থেকে নতুন সরকার গঠন পর্যন্ত সময়ে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক পরিবেশ পরিবীক্ষণ এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহায়তায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং সব দলের প্রার্থী ও কর্মীদের নিরাপত্তা সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

২৪. নির্বাচনকালীন ব্যয় পর্যবেক্ষণ : নির্বাচনকালে রাজনৈতিক দলগুলোর মনোনীত প্রার্থীদের মনোনয়নপত্রে বর্ণিত সম্পদ বিবরণী ও নির্বাচনী প্রচারণা ব্যয় পর্যবেক্ষণ ও নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং নির্ধারিত ব্যয়সীমা লঙ্ঘনে প্রার্থীর বিরুদ্ধে দ্রুততার সাথে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ।

২৫. নির্বাচনে 'না' ভোটের পুনঃপ্রচলন করতে হবে।

আইনের শাসন

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

২৬. নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথককরণ–

- মাসদার হোসেন মামলার রায় অনুযায়ী বিচার বিভাগের পৃথককরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।
- প্রশাসনিক কার্যক্রম স্বাধীনভাবে পরিচালনার জন্য বিচার বিভাগের নিজস্ব সচিবালয় স্থাপন ও কার্যকর করতে হবে।

- অধস্তন আদালতের নিয়োগ, পদোন্নতি এবং বদলিসহ সার্বিক নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান এককভাবে সুপ্রিম কোর্টের সচিবালয়ের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

২৭. উচ্চ আদালতের বিচারপতি নিয়োগ ও অপসারণ : উচ্চ আদালতে বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট আইনি সংস্কার এবং সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল করে বিচারপতি অপসারণের এখতিয়ার সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

২৮. শৃঙ্খলা ও আচরণ বিধিমালা : আন্তর্জাতিক উত্তমচর্চা ও জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আলোকে বিচারক এবং অ্যাটর্নি জেনারেলসহ সংশ্লিষ্ট সবার জন্য যুগোপযোগী শৃঙ্খলা ও আচরণবিধিমালা প্রণয়নের দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের কাছে ন্যস্ত করতে হবে।

২৯. বিচার বিভাগের নিয়োগ, পদায়ন, বদলিসহ বিচারিক প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।

শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা

৩০. কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগ: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য

- আইনে সুনির্দিষ্ট যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্ত অনুসরণ করতে হবে;
- পেশাগত জীবনে মানবাধিকার রক্ষা ও শুদ্ধাচার পালনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এমন ব্যক্তিকে মনোনীত করতে হবে এবং
- নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অনুসন্ধান কমিটি কর্তৃক গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩১. তদন্তের এখতিয়ার প্রদান: বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুমসহ সব মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের ক্ষেত্রে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এখতিয়ার প্রদান করতে হবে।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

৩২. পুলিশ আইন প্রণয়ন : আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোকে আধুনিকায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে যুগপোযোগী পুলিশ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৩৩. আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ : আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অনিয়ম-দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুলিশ কর্তৃপক্ষের বাইরে নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে একটি স্বাধীন কমিশন গঠন করতে হবে।

৩৪. পুলিশ সার্ভিস কমিশন গঠন : পুলিশের সব পর্যায়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া স্বচ্ছ, প্রতিযোগিতামূলক ও প্রভাবমুক্ত করার লক্ষ্যে পুলিশ সার্ভিস কমিশন গঠন করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি

৩৫. সরকারি চাকরি আইন : সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮-তে 'সরকারি' শব্দটির পরিবর্তে 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটি প্রতিস্থাপন এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তারে সরকারের অনুমতি গ্রহণের বিধান (ধারা ৪১ এর ১) বাতিল করাসহ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অন্যান্য অন্তরায় ও বৈষম্যমূলক ধারা সংশোধন করতে হবে।

৩৬. সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি : জনপ্রশাসনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিসহ সুশাসন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে 'সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধি, ১৯৭৯'কে হালনাগাদ করতে হবে।

৩৭. জনপ্রশাসনের বিরাজনীতিকরণ : রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতি না দিয়ে, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা মূল্যায়নের ভিত্তিতে পদোন্নতি প্রদান করতে হবে। সরকারি কর্মচারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখতে হবে এবং গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ অনুসারে অবসরের ৩ বছর অতিবাহিত না হলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার বিধান কার্যকর করতে হবে।

৩৮. সরকারি কর্মচারীদের সুরক্ষা ও পুরস্কার : দুর্নীতি প্রতিরোধে সততা, দক্ষতা ও সাহসিকতার সাথে কাজ করে থাকে এমন সরকারি কর্মচারীদের হয়রানি বন্ধ করতে আইনি বিধান কার্যকর করতে হবে। দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানসহ অন্যান্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি প্রদান বন্ধ করতে হবে।

অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ

৩৯. দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ : দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ও কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া দলীয় প্রভাবমুক্ত রাখা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে

- আইনে অন্তর্ভুক্ত যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলি অনুসরণ করতে হবে;
- বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং
- বাছাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪০. আইনি সংস্কার : দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচার বিষয়ে তদন্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণে দুদকের ক্ষমতাকে খর্ব করে বিভিন্ন আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা সংশোধন করতে হবে (যেমন সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট, ২০১৮; মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২; আয়কর আইন, ২০২৩)।

৪১. দুদকের সক্ষমতা বৃদ্ধি : দুদকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতাসহ জনবল নিয়োগ, পদায়ন ও বদলির ক্ষমতা দুদক সচিবের কাছ থেকে সরিয়ে কমিশনের হাতে ন্যস্ত করতে দুদকের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ বাতিল করতে হবে। দুদকের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠায় পরিচালক হতে উচ্চ পদে প্রশাসন ক্যাডার থেকে প্রেষণের মাধ্যমে পদায়ন বন্ধ করতে হবে।

৪২. স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন প্রণয়ন : সরকারি কার্যক্রমে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থতা, স্বজনপ্রীতি ও অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধে 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব আইন' প্রণয়ন করতে হবে।

৪৩. জনপ্রতিনিধি ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের সম্পদের হিসাব : জনপ্রতিনিধি ও প্রজাতন্ত্রের সব কর্মচারীকে জবাবদিহি নিশ্চিত করতে প্রতিবছর তাদের আয় ও সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করতে হবে।

নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

৪৪. নাগরিক সমাজসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে এরূপ সংস্থার গঠন, নিবন্ধন এবং ব্যবস্থাপনা-প্রক্রিয়া সহজতর করতে হবে এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

৪৫. বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন, ২০১৬-এর যেসব ধারা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বিশেষ করে মানবাধিকার ও সুশাসন নিয়ে কাজ করে এমন সংস্থার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করে তা বাতিল করতে হবে।

৪৬. গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিতে অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাপেক্ষে খসড়া প্রেস কাউন্সিল আইন, ২০১৯ পাস এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪৭. গণমাধ্যমকর্মীদের স্বাধীনভাবে কাজ করা ও মতপ্রকাশের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াসে অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার সাপেক্ষে খসড়া গণমাধ্যমকর্মী (চাকরির শর্তাবলি) আইন, ২০১৮ পাস ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্য অধিকার

৪৮. তথ্য কমিশনার নিয়োগ প্রক্রিয়া দলীয় প্রভাবমুক্ত করতে ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে

- আইনে অন্তর্ভুক্ত যোগ্যতা ও অযোগ্যতার শর্তাবলি অনুসরণ;
- বাছাই কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ এবং
- বাছাই-প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতে গণশুনানির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪৯. তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ আপিল কর্তৃপক্ষের জবাবদিহি নিশ্চিতে আইনের সংশোধন করতে হবে।

৫০. তথ্য কমিশনের পূর্ণাঙ্গ জনবলকাঠামো প্রস্তুত এবং জনবল ও আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫১. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার জন্য অফিশিয়াল সিক্রেট অ্যাক্ট বা সরকারি গোপন আইন, ১৯২৩ বাতিল করতে হবে।

৫২. অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা নিশ্চিতে তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা) আইন, ২০১১-এর যথাযথ সংস্কার ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

তথ্য ও উপাত্ত সুরক্ষা

৫৩. ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন, ২০২৩-এ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার আলোকে ‘ব্যক্তিগত তথ্যে’র সুস্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করতে হবে এবং ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষার মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন,

মানুষের ব্যক্তিগত তথ্যের অপব্যবহার, বাকস্বাধীনতা ও ভিন্নমত নজরদারির সুযোগ রয়েছে এমন ধারা সংশোধন করতে হবে। প্রস্তাবিত উপাত্ত সুরক্ষা আইনের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে একটি স্বতন্ত্র কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে।

৫৪. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষার ও নিরাপত্তা বিধানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ তদন্ত ও নিষ্পত্তির জন্য প্রযুক্তি ব্যবহার এবং কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবল নিশ্চিত করতে হবে।

৫৫. সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩-এর যেসব ধারা মানবাধিকারবিরোধী ও তথ্যপ্রযুক্তির সাথে সম্পর্কহীন এবং ব্যাখ্যার বা অর্থের অস্পষ্টতা রয়েছে সেই সব ধারা সংশোধন বা বাতিল করতে হবে।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ

৫৬. স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন : স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করতে হবে।

৫৭. আইনি সংস্কার : স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে সংসদ সদস্যদের সম্পৃক্ততা বন্ধ করতে হবে। সব পর্যায়ের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকার কর্তৃক প্রশাসক নিয়োগ বন্ধ করতে হবে।

৫৮. আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পদ ও তহবিল সংগ্রহে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা-জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। নিজস্বভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রবিধান রেখে আইনি সংস্কার করতে হবে।

আর্থিক খাত ও সরকারি ব্যয়ে সুশাসন

৫৯. ব্যাংকিং কমিশন গঠন : ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন এবং কমিশন কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাতের সংস্কারের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করতে হবে।

৬০. ব্যাংক পরিচালনার নীতিমালা : বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে সব ব্যাংকের পরিচালক, চেয়ারম্যান নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লিখিত নীতিমালা প্রণয়ন করা, যেখানে ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগের জন্য অনুসন্ধান কমিটির গঠন এবং তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

৬১. অর্থ পাচার রোধ : সংশ্লিষ্ট আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে অর্থ পাচার বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব দেশে অর্থ পাচার হয়েছে সেই সব দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে আইনি সহায়তা জোরদার করতে হবে। আমদানি ও রপ্তানির আড়ালে পণ্যের অতিমূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন করে অর্থ পাচার রোধে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৬২. মালিকানার স্বচ্ছতা আইন : ব্যক্তি খাতের প্রতিষ্ঠানে মালিকানার স্বচ্ছতা ও খেলাপি ঋণ এবং অর্থ পাচার রোধে 'মালিকানার স্বচ্ছতা আইন (বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ অ্যাক্ট)' প্রণয়ন এবং একই সাথে বৈদেশিক লেনদেনে নজরদারি করতে 'দ্য কমন রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (সিআরএস)'-এর মাধ্যমে দেশে-বিদেশে আর্থিক লেনদেনের স্বয়ংক্রিয় তথ্যপ্রাপ্তির সুবিধায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে।

৬৩. মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের সক্ষমতা : মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের সক্ষমতা বাড়াতে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল, আর্থিক বরাদ্দ ও লজিস্টিক সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে এবং নিরীক্ষা কার্যক্রমের সংখ্যা বৃদ্ধি ও নিয়মিতভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হবে।

৬৪. সরকারি ক্রয়ে ইজিপি ব্যবহার : সরকারি ক্রয়ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সব দরপত্র ই-জিপি প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করতে হবে এবং উন্মুক্ত ও সীমিত দরপত্র পদ্ধতিতে মূল্যসীমার বিধান বাতিল করতে হবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার

৬৫. শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা খাতে বাজেট বৃদ্ধি : মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের বরাদ্দ যথাক্রমে জিডিপির ন্যূনতম ৬ ও ৫ শতাংশ করতে হবে।

৬৬. অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন : আর্থসামাজিক উন্নয়নের সুফল সবার কাছে, বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো এবং আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট, বাস্তবায়নযোগ্য ও সময় নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিতে হবে।

৬৭. ডাইভারসিটি (বৈচিত্র্য) কমিশন গঠন : বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও পেশাভিত্তিক জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও স্বকীয়তা বজায় রেখে মৌলিক অধিকার নিশ্চিতে এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে শ্রদ্ধাশীলতা, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সংস্কৃতি ও পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি স্বতন্ত্র ডাইভারসিটি (বৈচিত্র্য) কমিশন গঠন করতে হবে।

৬৮. দক্ষ বাজার ব্যবস্থাপনা : নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর ওপর সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করা ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি দক্ষ বাজারব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৬৯. আদিবাসী জনগোষ্ঠীর স্বীকৃতি : বাংলাদেশে বসবাসরত সব 'নৃ-গোষ্ঠী' বা জাতিসত্তাকে আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে প্রয়োজনীয় আইনি সংস্কার এবং তাদের মৌলিক অধিকারসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতে সংখ্যালঘু কমিশন বা আদিবাসী কমিশন গঠন করতে হবে।

৭০. বৈষম্যবিরোধী আইন : সরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তিতে বাধা দূর, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করতে বৈষম্যবিরোধী আইন দ্রুত প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন

৭১. বাংলাদেশে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ক্রমান্বয়ে বন্ধ এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা নিতে হবে এবং সুনির্দিষ্ট রূপরেখা প্রণয়ন করে প্রশমনবিষয়ক কার্যক্রম স্বচ্ছতার সাথে বাস্তবায়নে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ খাতে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও অবিলম্বে বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭২. জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের মতামতের ভিত্তিতে একটি 'ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টারপ্ল্যান (আইইপিএমপি)' প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭৩. জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বাংলাদেশের প্রাপ্য অর্থঋণ, বিমা বা অনুদান নয়; বরং ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদানের দাবি জোরদার করতে হবে।

৭৪. বায়ু, পানি, শব্দসহ সব ধরনের পরিবেশদূষণ রোধ এবং পরিবেশ সুরক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের তদারকি ও পরিবীক্ষণে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ও এর কার্যকর ব্যবহার করতে হবে।

৭৫. বাংলাদেশ জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের প্রত্যাশা পূরণ করার জন্য এই ফান্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা-জবাবদিহির সাথে প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭৬. অর্থের অপচয় ও অনিয়ম, দুর্নীতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডসহ অন্যান্য জলবায়ু তহবিলের ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা*, (ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০২৩)।

[২] "গণতান্ত্রিক উত্তরণের ২৫ বছর" *প্রথম আলো*, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫।

[৩] বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০২১)।

[৪] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, *জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১২)।

[৫] বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, *টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট*, *লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ*, (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭)।

[৬] United States Institute of Peace, *Democracy & Governance,* (Washington: USIP, 2023)।

[৭] মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, *জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল*, (ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১২)।

[৮] Venice Commission, *Guidelines on Political Party Regulation* (Venice: Venice Commission, 2020).

নির্বাচনী হলফনামার চালচিত্র : জনগণের জন্য বার্তা কী?*

মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, রিফাত রহমান, কে. এম. রফিকুল আলম
ইকরামুল হক ইভান ও কাজী মাহদী আমিন

ভূমিকা

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য নির্বাচন। গণতান্ত্রিক যেকোনো সমাজব্যবস্থায় মৌলিক রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে নির্বাচনকে অভিহিত করা হয়েছে।[১] এর মাধ্যমে একটি বড় জনগোষ্ঠী সরাসরি তাদের নেতৃত্ব বাছাইয়ের জন্য রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করে। যার স্বীকৃতি এসেছে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রেও।[২] তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরেও নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদাহরণ রয়েছে– যেমন, স্বৈরতান্ত্রিক সরকারগুলো নিজেদের বৈধতার জন্য নির্বাচনের আয়োজন করে। তবে এমন নির্বাচন এই রচনার আলোচ্য নয়; বরং প্রতিনিধিত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচনে ভোট দিয়ে নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সব স্তরে জনসাধারণের প্রতিনিধি বাছাই এর মূল উপজীব্য। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে (অনুচ্ছেদ ১১-গণতন্ত্র ও মানবাধিকার) প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে।[৩] একইসঙ্গে, প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়নে জাতীয় সংসদ প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে আইন অনুযায়ী তিন শ সংসদ সদস্যকে নির্বাচিত করার বিধান রাখা হয়েছে।[৪]

সংসদ সদস্যদের নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা একইভাবে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে সাংবিধানিকভাবে।[৫] মূলত যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিক ২৫ বছর বয়স্ক হলেই নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন– যদি না আদালত কাউকে অপ্রকৃতিস্থ ঘোষণা করে, দেউলিয়া ঘোষিত হওয়ার পর অব্যাহতি না পেয়ে থাকলে, বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে বা আনুগত্য স্বীকার করলে, কিংবা নৈতিক স্খলনজনিত কোনো ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কমপক্ষে দুই বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তার মুক্তিলাভের পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত না হয় বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। অযোগ্যতার তালিকায় সরকারি চাকরিজীবী বা

---

* ২০২৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত।

১ ROBBINS, J. S. (1997). INTRODUCTION: DEMOCRACY AND ELECTIONS. The Fletcher Forum of World Affairs, 21(1), 1–13. http://www.jstor.org/stable/45288975

২ Article-21 of Universal Declaration of Human Rights, https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/english

৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-29363.html

৪ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30052.html

৫ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-957/section-30053.html

সরকারি চাকরি থেকে অবসরের তিন বছর অতিবাহিত না হয়, ঋণখেলাপি (গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ-১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১২-এর সংশোধনী-১৯৯৬), ঘুষ, দুর্নীতিসহ (সংশোধনী ২০০১) ৭৪, ৭৮, ৭৯ থেকে ৮২, ৮৪ এবং ৮৬ এর অধীন করা অপরাধে কেউ অভিযুক্ত হয়ে দুই বছর সাজা খাটেন এবং তারপর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হওয়া বিষয়গুলোও যুক্ত হয়েছে।[৬]

সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী সব প্রার্থীর এ সকল যোগ্যতা ও অযোগ্যতাসহ সার্বিক বিষয় বিবেচনার জন্য নির্বাচনী হলফনামায় দেওয়া তথ্য বর্তমানে প্রাথমিক দলিল। হলফনামার মাধ্যমে প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের তথ্য জানার বা জানানোর বিষয়টি খুব একটা সহজ ছিল না ২০০৫ সাল পর্যন্ত। এ বছর আব্দুল মোমেন চৌধুরী বনাম নির্বাচন কমিশন মামলায় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ একটি যুগান্তকারী রায় দেয়। যাতে মনোনয়নপত্র জমাদানের সময়ই প্রত্যেক প্রার্থীকে হলফনামার আকারে আটটি ব্যক্তিগত তথ্য ঘোষণা বাধ্যতামূলক করা হয়। পরে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ১২-এর দফায় সংশোধনী[৭] (৩খ) অনুসারে মোট নয়টি তথ্য জমা দেওয়ার বিধান করা হয়েছে।[৮] হলফনামায় দেওয়া এসব তথ্যের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা ও আয়ের উৎস, মামলার বিবরণী, প্রার্থীর নিজের ও তার নির্ভরশীলদের আয়-ব্যয়, আয়কর বিবরণী, সম্পদ এবং দায়দেনা।

২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনের পর থেকে নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা নির্বাচন কমিশন প্রকাশ করলেও এটিকে কেন্দ্র করে জনপ্রতিনিধিদের অস্বাভাবিক আয় ও সম্পদ অর্জনের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা যায়নি। আবার এ সকল তথ্য সাধারণ মানুষের ব্যবহার উপযোগী করে তোলার কাজও খুব দৃশ্যমান নয়। এমন বাস্তবতায় বড় পরিসরে হলফনামার সব তথ্যকে আরও বিশ্লেষণযোগ্যভাবে সহজলভ্য করার মাধ্যমে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসহ অংশীজন কর্তৃক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার অংশ হিসেবে হলফনামায় দেওয়া তথ্যের বিশ্লেষণ করা ও প্রাপ্ত ফলাফল জনগণের জন্য কী বার্তা দেয়– তার একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরতে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর এই প্রয়াস।

নির্বাচনী ব্যবস্থায় হলফনামা

নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা প্রদানের বাধ্যবাধকতার আইনি শুরুটা অবশ্য প্রতিবেশী দেশ ভারতে। দেশটির সুপ্রিম কোর্টের ২০০২ সালের একটি মামলার রায় এ ক্ষেত্রে বড় মাইলফলক।[৯] ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া বনাম এডিআর [(২০০২)৫ এসসিসি] মামলার রায়ে আদালত মূলত দুটি নির্দেশনা দেয়।[১০] এক. কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিদ্যমান আইন অনুপস্থিত/অপর্যাপ্ত থাকলে, সে বিষয়ে

৬ Mahmudul Islam, Constitutional Law of Bangladesh, (Second Edition) 2006

৭ Clauses(3a) and (3b) were inserted by section 6(c) of representation of the People order(Amendment) Act,2009(Act.NO.XIII of 2009) (with effect from 19th August, 2008)

৮ The Representation of the People Order, 1972 (President's Order); http://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2023-11-12-11-06-03-50860_39704.pdf

৯ https://adrindia.org/sites/default/files/Supreme_Court's_judgement_2nd_May_2002.pdf

১০ CASE ANALYSIS; https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/union-india-uoi-v-respondent-association-democratic-reforms-another-peoples-union-civil-liberties-pucl-another-v-union-india-uoi another/#:~:text=Case%20Summary%20and%20Outcome,criminal%20records%2C%20and%20educational%20background.

বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ (এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন) নিজ উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা বা আদেশ জারি করতে পারবে এবং দুই. জনগণের সরকারি কার্যক্রম সম্পর্কে জানার অধিকার রয়েছে, যা নাগরিকের বাক ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা থেকে উৎসারিত এবং এতে সরকারি অফিসের জন্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, তাদের সম্পর্কে তথ্য জানার অধিকারও অন্তর্ভুক্ত।[১১]

আদালত ভারতীয় সংবিধানের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলছে, "(Indian) Constitution, Article 19(1) (a) provides for freedom of speech and expression. Voters' speech or expression in case of election would include casting of votes, that is to say, voter speaks out or expresses by casting vote. For this purpose, information about the candidate to be selected is must. Voter's (little man-citizen's) right to know antecedents including criminal past of his candidate contesting election for MP or MLA is much more fundamental and basic for survival of democracy. The little man may think over before making his choice of electing law breakers as law makers."[১২]

রায়টিতে মূলত নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের রিরুদ্ধে আগে থাকা ফৌজদারি মামলাসংক্রান্ত তথ্য বা মনোনয়ন জমা দেওয়ার ৬ মাস আগ পর্যন্ত রুজু হওয়া মামলা (যেটিতে ২ বছর পর্যন্ত সাজার সুযোগ রয়েছে)'র তথ্য, প্রার্থী ও তার নির্ভরশীলদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ, দায়দেনা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা হলফনামা আকারে জমা দেওয়ার বিধান করা হয়।[১৩] এ রায়কে সমর্থন করে ২০০৩ সালে পিইউসিএল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া রিট মামলায় আরেকটি রায় দেয় ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের পিভি রেড্ডির বেঞ্চ।[১৪]

নাগরিক সমাজের দাবির মুখে এবং ভারতীয় দুটি রায়ের ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে বিচারপতি এম এ মতিনের নেতৃত্বে গঠিত হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ "আবদুল মোমেন চৌধুরী বনাম বাংলাদেশ"[১৫] মামলার রায়ে সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হলফনামার মাধ্যমে তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অতীতের ও বর্তমান মামলার বিবরণী, আয়, সম্পদ, দায়দেনাসহ আট ধরনের তথ্য মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করার ঘোষণা দেয়। একই সঙ্গে আদালত নির্বাচন কমিশনকে এসব তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত করা এবং বিতরণ করার নির্দেশনা প্রদান করে, যাতে তারা পছন্দের প্রার্থীকে স্বীয় বিবেচনায় ভোট দিতে পারেন। যেটি ওই বছর সুনামগঞ্জ-৩ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচনে প্রথম প্রয়োগ করা হয়।[১৬]

---

১১ ibid

১২ Page-23, https://adrindia.org/sites/default/files/Supreme_Court's_judgement_2nd_May_2002.pdf

১৩ ibid

১৪ https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/wp-content/uploads/2015/02/Peoples-Union-of-Civil-Liberties-PUCL-v.-Union-of-India.pdf

১৫ Abdul Momen Chowdhury and others vs. Bangladesh, Writ Petition No. 2561/2005.

১৬ https://shujan.org/wp-content/uploads/2023/03/%E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%AE%E0%A7%8B%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A7%8C%E0%A6%A7%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%80-%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6-%E0%A6%AE%E0%A6-%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-High-Court-Judgment-on-Abdul-Momen-Chowdhury-vs-Bangladesh-Case.pdf

পরবর্তী সময়ে রায়ের বিপরীতে রিট, স্থগিতাদেশ, রাজনৈতিক পটপরিবর্তন পেরিয়ে ১১ ডিসেম্বর ২০০৭ আপিল বিভাগের রায়ের মাধ্যমে প্রার্থী সম্পর্কে ভোটারদের তথ্যপ্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত হয়। ফলে, জাতীয় সংসদ, জেলা ও উপজেলা পরিষদ এবং পৌরসভা নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামা দাখিল করার বিষয়টি চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষেত্রে এ বাধ্যবাধকতা না থাকলেও ২০২৩ সালের 'মোহাম্মদ ফারুক উল আজম বনাম বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন'[১৭] শিরোনামে এক মামলার রায়ের মাধ্যমে ইউপি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের জন্যও একই বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয়।

হলফনামা ও জবাবদিহি

নির্বাচনী হলফনামার তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের সম্পর্কে ভোটারদের সচেতন করা এবং প্রার্থী বাছাইয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তার পরিবেশ তৈরির পাশাপাশি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক জবাবদিহি প্রতিষ্ঠারও একটি সুযোগ তৈরি হয়েছে। হলফনামায় প্রদত্ত আয় ও সম্পদের ঘোষণার তথ্য পর্যাপ্ত কি-না বা বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং এর মাধ্যমে প্রার্থীর বৈধ আয়ের সঙ্গে তার আয় বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পদ বা অর্থের বিকাশ ঘটেছে কি না, তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে রাজস্ব বিভাগ ও দুর্নীতি দমন কমিশন তা নিয়মিত বিরতিতে পরীক্ষা করে দেখতে পারে। জনপ্রতিনিধিদের নিয়মিত আয়, সম্পদ ও ব্যবসা স্বার্থ ঘোষণা মূলত দুটি উদ্দেশ্য সাধন করে বলে মনে করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল।[১৮] এর একটি, জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক কার্যকলাপের ওপর নজরদারি বাড়ানোর মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করা এবং দ্বিতীয়টি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব কমিয়ে আনার মাধ্যমে দুর্নীতি কমিয়ে আনা।[১৯] কেননা দুর্নীতির বিস্তার জনগণকে রাজনীতি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আস্থা ও বিশ্বাসকে নষ্ট করার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে দুর্বল করে ফেলে।[২০]

দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার নিয়ে আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে আলোচনা থাকলেও ১৯৯৬ সালেই প্রথম জাতিসংঘ ইন্টারন্যাশনাল কোড অব কন্ডাক্ট ফর পাবলিক অফিশিয়ালস সামনে তুলে ধরে, যা ১৯৯৭ সালেই গ্রহণ করা হয়।[২১] ২০০৩ সালে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সম্মেলনে (ইউএনসিএসি) পাবলিক অফিশিয়ালদের সংজ্ঞায় জনপ্রতিনিধিদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২২] এদিকে ১৯৯৭ সালেই কাউন্সিল অব ইউরোপের মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে দুর্নীতি প্রতিরোধে ২০ দফা নীতিমালা জারি করা হয় এবং এর পাশাপাশি গ্রুপ অব স্টেটস এগেইনেস্ট করাপশন (গ্রেকো) ২০১২ সালে দুর্নীতিবিরোধী

---

[১৭] https://www.supremecourt.gov.bd/resources/bulletin/17/1.15.%20HCD%20Farah%20Mahbub.pdf

[১৮] RECOMMENDATIONS ON ASSET AND INTEREST DECLARATIONS FOR OGP ACTION PLANS published by TI (2020); https://www.opengovpartnership.org/wp-content/uploads/2020/07/Recommendations-on-Asset-and-Interest-Declaration-for-OGP-Action-Plans.pdf

[১৯] Ibid.

[২০] A comparative analysis of financial disclosure obligations on members of parliaments by EPRS (2023); https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747911/EPRS_STU(2023)747911_EN.pdf

[২১] United National General Assembly, International Code of Conduct for Public Officials, Annex to Resolution 51/59, Action against corruption, adopted on 28 January 1997

[২২] Ibid,EPRS(2023)

মানদণ্ড অনুসরণের সিদ্ধান্ত নেয়, যেখানে জনপ্রতিনিধিদের নৈতিকতা এবং নিয়মিত সম্পদের হিসাব দেওয়ার একটি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে জোর দেওয়া হয়।[২৩] এ ক্ষেত্রে গ্রেকো ঘোষিত তথ্যের সঠিকতা, নিয়মিত হালনাগাদ তথ্যপ্রাপ্তি এবং জনপ্রতিনিধিদের নিকটাত্মীয়দেরও এর অন্তর্ভুক্ত করে। একই সঙ্গে ঘোষিত তথ্য কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই ও নজরদারি করতে একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা গড়ে তুলতে জোর দেয় গ্রেকো সদস্যদেশগুলো।

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী, বর্তমানে ১৬০টির বেশি দেশে পাবলিক অফিশিয়ালদের সম্পদের ঘোষণা দেওয়ার বিধান রয়েছে।[২৪] এন্টিকরাপশন রিসোর্স সেন্টারের তথ্য বলছে, বাংলাদেশে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হতে হলে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ অনুযায়ী আয় ও সম্পদের ঘোষণা দেওয়ার বিধান রয়েছে।[২৫] তবে নির্বাচিত হয়ে গেলে জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। একই সঙ্গে নির্বাচনের সময় হলফনামার আকারে দেওয়া তথ্য নির্বাচন কমিশনের হয়ে রিটার্নিং অফিসার তা পরীক্ষা করেন যে দেওয়া তথ্য সব শর্ত পূরণ করেছে কি না? তবে ঘোষিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা হয় না এবং এর জন্য কোনো আলাদা স্বাধীন ব্যবস্থাও নেই।[২৬] কিন্তু সম্পদের ঘোষণা না দিলে প্রার্থিতা বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে কমিশনের। এর বাইরে প্রার্থী অবস্থায় জনপ্রতিনিধিদের দেওয়া তথ্য পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হলে সংসদ সদস্য পদ খারিজ হওয়ার বিধান রয়েছে।[২৭]

ওপরের আলোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে হলফনামার আদলে আয় ও সম্পদের ঘোষণা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হলেও এটি জনপ্রতিনিধিদের আর্থিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ টুল হতে পারে। এমন বাস্তবতায় হলফনামার প্রকাশিত সকল উন্মুক্ত তথ্যকে একটি স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনায় জবাবদিহি ও সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ কাঠামোতে ফেলে সবার জন্য ব্যবহারযোগ্য একটি ড্যাশবোর্ড উন্নয়ন করা এবং তার ভিত্তিতে সর্বসাধারণের কাছে বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণপদ্ধতি

২০০৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত নবম, দশম, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর হলফনামায় প্রদর্শিত আটটি তথ্য সন্নিবেশ করে ‘হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি’ শীর্ষক একটি ইন্টার অ্যাকটিভ ড্যাশবোর্ড তৈরি করে টিআইবি। ড্যাশবোর্ড প্রস্তুতির প্রাথমিক পর্যায়ে নবম, দশম

[২৩] Ibid,EPRS(2023)

[২৪] Asset and Interest Declarations(Chapter 8); https://thedocs.worldbank.org/en/doc/419301611672162231-0090022021/original/AssetandInterestDeclarations.pdf

[২৫] Asset declaration regimes in selected Asian countries; https://www.u4.no/publications/asset-declaration-regimes-in-selected-asian-countries

[২৬] Global Integrity Report. 2010a. Bangladesh Scorecard. http://www.globalintegrity.org/report/Bangladesh/2010/

[২৭] World Bank. 2008e. “Public Accountability Mechanism Bangladesh.” http://www.agidata.org/pam/QuickLinksByAbc.aspx

ও একাদশ সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া সব প্রার্থীর হলফনামা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট[২৮] থেকে সংগ্রহ করা হয়।

সংগৃহীত পিডিএফ হলফনামার যাবতীয় তথ্য KoboToolbox[২৯] দিয়ে তৈরি ডেটা ফরমের মাধ্যমে একদল প্রশিক্ষিত ডেটা অ্যাসিসট্যান্ট সম্পূর্ণভাবে ডিজিটাইজড করার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে। একইভাবে পরবর্তীতে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের দুই হাজারের বেশি হলফনামার তথ্য ডিজিটাইজড করা হয়।

ডেটা প্রক্রিয়াকরণের জন্য পাইথন ও পাওয়ার কোয়েরি এবং ডেটা বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনায় পাওয়ার বিআই ও ড্যাক্সের ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রায় ছয় হাজার হলফনামায় দেওয়া আটটি তথ্যের বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি' ড্যাশবোর্ডটি প্রস্তুত করা হয়। পাশাপাশি, বহুমাত্রিক ও তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে টিআইবির পর্যবেক্ষণ তুলে ধরতে এই পুস্তিকাটি প্রকাশ করা হচ্ছে।

চিত্র-১ : উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ-পদ্ধতি

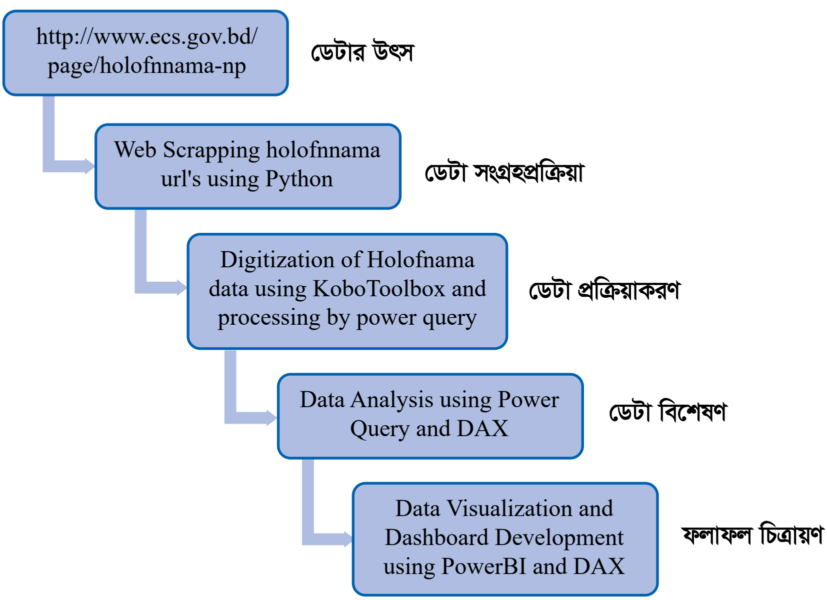

২৮ http://www.ecs.gov.bd/page/holofnnama-np
২৯ https://www.kobotoolbox.org/

হলফনামার তথ্য বিশ্লেষণ ও ফলাফল

দল ও প্রার্থী সংখ্যা

নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের নির্বাচনী হলফনামায় সংখ্যাগত বিশ্লেষণ বলছে, অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক দল বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকলেও ২৯টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছিল। যেখানে মোট বৈধ প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯৭৯ জন। যা সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে ৩৮টি রাজনৈতিক দল ও মোট ১৫৬৭ জন প্রার্থী। ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত হওয়া একাদশ নির্বাচনেও সমানসংখ্যক দল অংশগ্রহণ করলেও প্রার্থীর সংখ্যা বেড়ে হয় ১৮৬১ জন। এই চার নির্বাচনে সবচেয়ে কম ১২টি দল অংশগ্রহণ করে ২০১৪ সালের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে, ১৪৭ আসনে প্রার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৯০ জন। ৩০০ সংসদীয় আসনের বাকি ১৫৩টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন প্রার্থীরা।

সারণি-১ : নির্বাচনভিত্তিক দল ও প্রার্থীর সংখ্যা

নির্বাচন	দলের সংখ্যা	প্রার্থীর সংখ্যা
নবম নির্বাচন (২০০৮ সাল)	৩৮	১৫৬৭
দশম নির্বাচন (২০১৪ সাল)	১২	৩৯০(১৪৭)*
একাদশ নির্বাচন (২০১৮ সাল)	৩৮	১৮৬১
দ্বাদশ নির্বাচন (২০২৪ সাল)	২৯	১৯৭৯

(* ১৫৩টি আসনে কোনো ভোটাভুটি হয়নি)

দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর হার

এবারের নির্বাচনের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রার্থীর ২২ দশমিক ৫৪ শতাংশ, অর্থাৎ ৪৪৬ জন প্রার্থী স্বতন্ত্র নির্বাচন করেছেন (চিত্র-৩) বা দলীয় পরিচয়ের বাইরে থেকে নির্বাচন করেছেন। যা ২০০৮ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত চার নির্বাচনের মধ্যে সর্বোচ্চ। ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৪০, ১০৫, ১৩৪ জন। (চিত্র-৪) বিএনপিসহ বেশ কয়েকটি দল নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তের পর ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দেখাতে দল মনোনীত প্রার্থীর বাইরেও বিদ্রোহী প্রার্থীদের নির্বাচনে উৎসাহ দেওয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়। ফলে একাদশ নির্বাচনের তুলনায় নয়টি দল কম অংশ নিলেও, প্রার্থীর সংখ্যা ছিল সর্বশেষ চার নির্বাচনের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৯৭৯।

চিত্র-৩: দ্বাদশ নির্বাচনে স্বতন্ত্র ও দলীয় প্রার্থীর হার

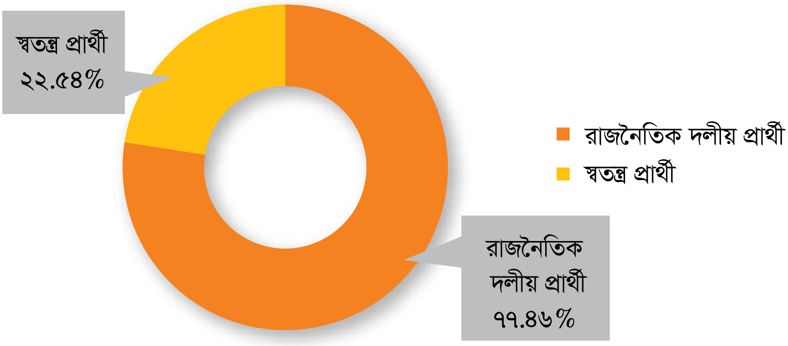

চিত্র-৩ : নির্বাচনভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রার্থী সংখ্যার তুলনা

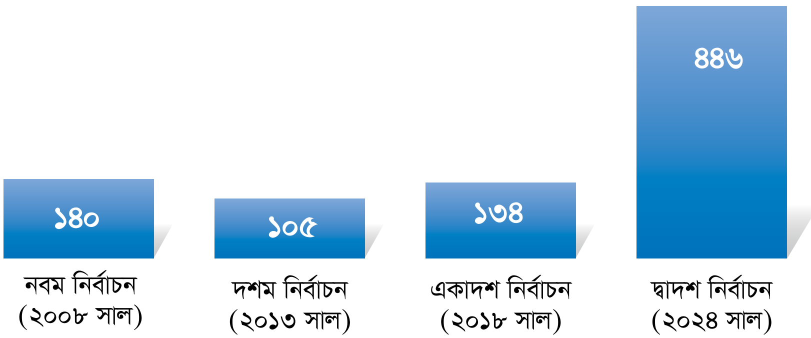

দলগত মনোনয়ন

প্রার্থীর সংখ্যা আগের তিন নির্বাচনের চেয়ে বেশি হলেও, দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দলগতভাবে কোনো দলই শতভাগ আসনে (৩০০) প্রার্থী দেয়নি। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ সর্বোচ্চ ২৬৬, জাতীয় পার্টি থেকে ২৬৫টি আসনে প্রার্থী দেওয়া হয়। এরপরই মনোনয়নের দিক থেকে দলগত অবস্থান তৃণমূল বিএনপির, প্রার্থী ১৩৫, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি) থেকে ১২২ জন এবং বাংলাদেশ কংগ্রেস ৯৬টি আসনে নির্বাচন করে। (চিত্র-৫) আর ২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রার্থীই স্বতন্ত্র, তারা কোনো রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচনে অংশ নেননি।

চিত্র-৪ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলীয় ও স্বতন্ত্র প্রার্থী

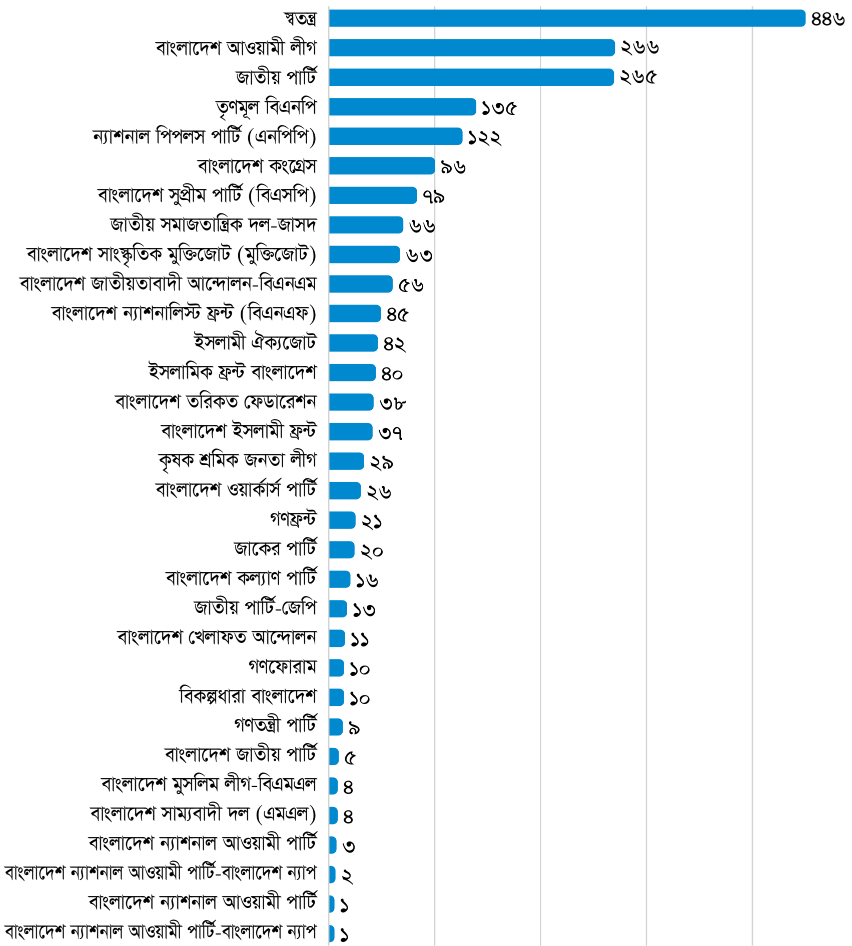

দলগত মনোনয়ন

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে সর্বোচ্চসংখ্যক প্রার্থী অংশ নিলেও, সরাসরি ভোটে নারী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার এখনো হতাশাজনকভাবে কম। মোট প্রার্থীর ৯৪ দশমিক ৮৫ শতাংশ পুরুষ প্রার্থীর বিপরীতে মাত্র ৫ দশমিক ১৫ শতাংশ নারী প্রার্থী অংশ নিয়েছেন (চিত্র-৬)। সংখ্যার বিচারে অবশ্য বিগত তিন নির্বাচনের তুলনায় নারী প্রার্থীর সংখ্যা দ্বাদশ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ছিল, ১০২ জন। চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তুলনা করলে দেখা যাবে নবম নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের হার ছিল ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ বা ৫৫ জন, দশম নির্বাচনে ৫ দশমিক ৫৫ শতাংশ বা ৩০ জন এবং একাদশ নির্বাচনে নারী প্রার্থীর হার ছিল মাত্র ৩ দশমিক ৮১ দশমিক বা ৭৩ জন।(চিত্র-৭)।

চিত্র-৫ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী নারী ও পুরুষ প্রার্থী

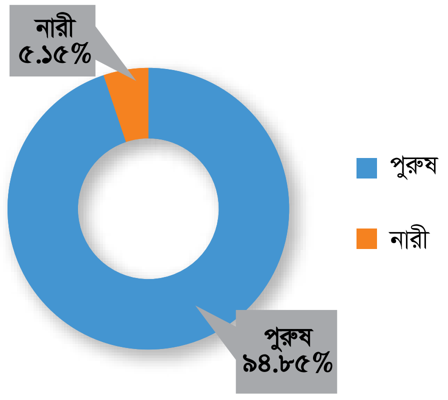

চিত্র-৬ : নির্বাচনভিত্তিক নারী ও পুরুষ প্রার্থীর তুলনা

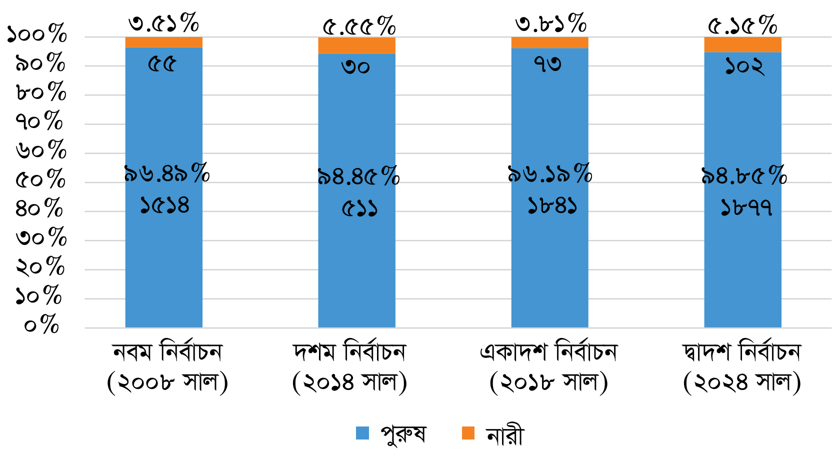

প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতার বিশ্লেষণে দেখা যায়, অর্ধেকের বেশি প্রার্থীই স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। প্রার্থীদের মধ্যে ২৯ দশমিক ৩৫ শতাংশ স্নাতক ও ২৯ দশমিক ২০ শতাংশ স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী (চিত্র-৮)। উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছেন ১২ দশমিক ২৫ শতাংশ, মাধ্যমিক ৮ দশমিক ২৭ শতাংশ, আর স্বশিক্ষিত প্রার্থী ১২.৪৬ শতাংশ। দল বিবেচনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের ৮২ ভাগের বেশি প্রার্থী স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী। অন্যদিকে জাতীয় পার্টির ৫৫ শতাংশ প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সমপর্যায়ের।

চিত্র-৭ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

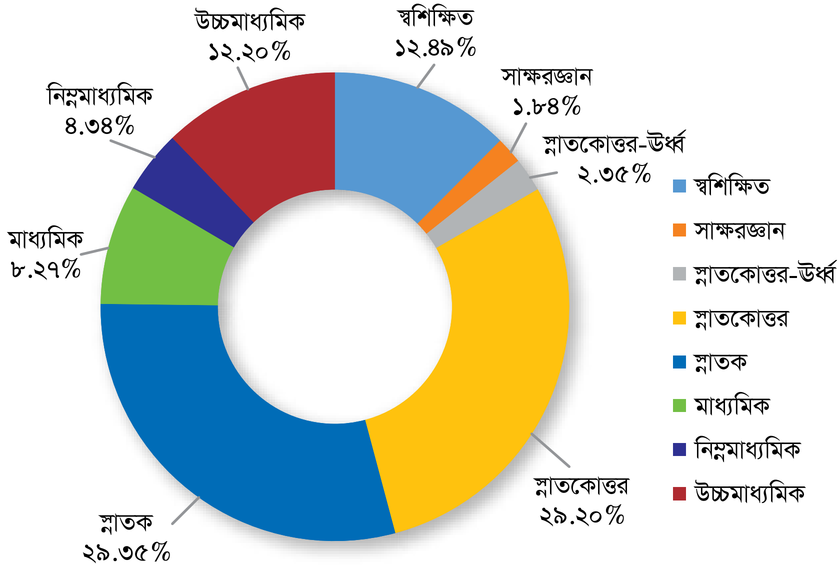

প্রার্থীদের পেশাগত পরিচয়

২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া ১৯৭৯ জন প্রার্থীর ৫৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ প্রার্থীই মূল পেশা হিসেবে ব্যবসাকে উল্লেখ করেছেন। এরপর রয়েছেন- আইনজীবী ৯ দশমিক ৯৫ শতাংশ, ৬ দশমিক ৮৭ শতাংশ কৃষিজীবী, ৫.১৬ শতাংশ, ৫ দশমিক ৫১ চাকরিজীবী এবং ৫ দশমিক ৩১ শতাংশ শিক্ষকতায় যুক্ত। এ নির্বাচনে রাজনীতিকে পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন মাত্র ৩ দশমিক ০৮ শতাংশ প্রার্থী (চিত্র-৯)। এর বাইরে অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ২ দশমিক ৮৩ শতাংশ, চিকিৎসক ২ দশমিক ০৭ শতাংশ। ২০০৮ সাল থেকে অনুষ্ঠিত সবগুলো নির্বাচনের প্রার্থীদের পেশাগত পরিচয় তুলনা করলে দেখা যায়, নির্বাচনে ব্যবসায়ী প্রার্থীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত বাড়ছে। ২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট প্রার্থীর যথাক্রমে ৪৭ দশমিক ৪০ শতাংশ, ২০১৪ সালের নির্বাচনে ৫৬ দশমিক ৭২ শতাংশ এবং ২০১৮ নির্বাচনে ৫১ দশমিক ৪০ শতাংশ প্রার্থী ব্যবসাকে নিজেদের প্রধান পেশা হিসেবে দেখিয়েছেন। সেই তুলনায় আইনজীবী, রাজনীতিবিদ কিংবা অন্য পেশাজীবীদের অংশগ্রহণ ক্রমাগত কমছে (চিত্র-১০)। নবম নির্বাচনে আইনজীবী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার ছিল ১১ শতাংশের কিছু বেশি। পরবর্তী নির্বাচনে এটি ১২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়লেও একাদশে সেটি নেমে যায় সাড়ে ন শতাংশে, দ্বাদশেও তা দশ শতাংশ ছাড়াতে পারেনি। একইভাবে কমেছে শিক্ষক পেশার প্রার্থীদের অংশগ্রহণও।

চিত্র-৮ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ

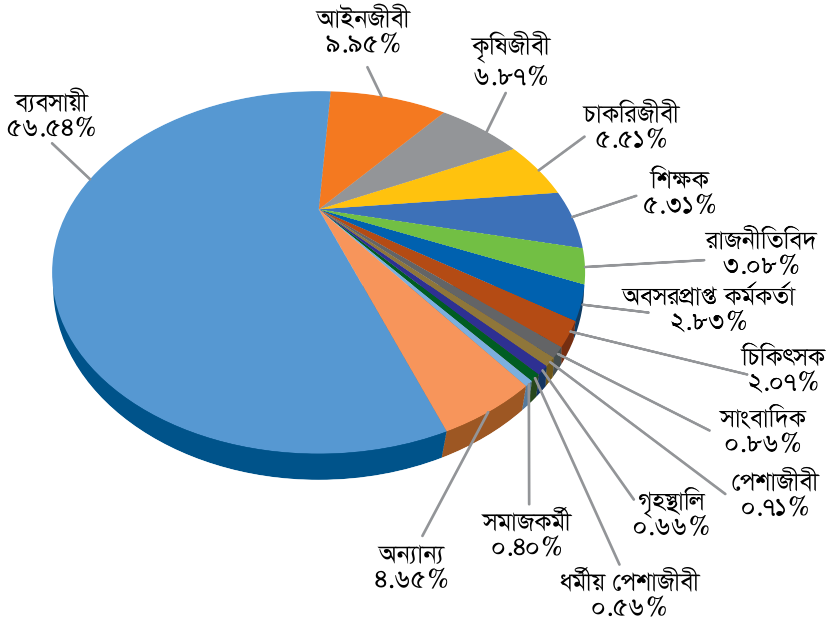

চিত্র-৯ : সর্বশেষ চারটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ

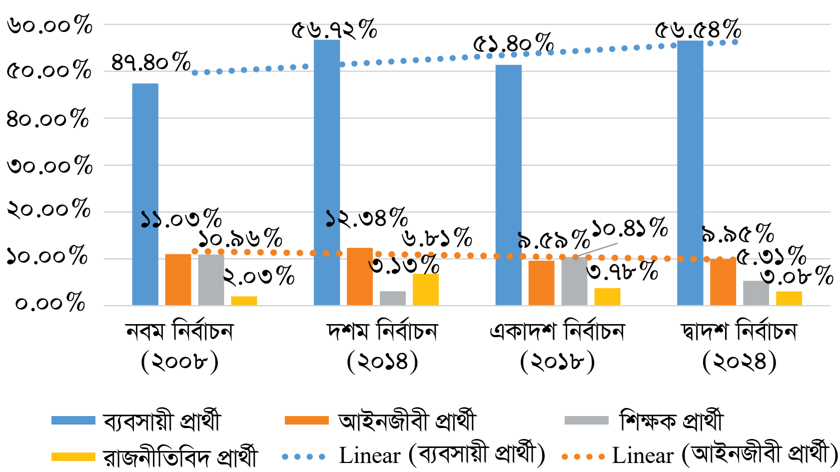

প্রার্থীদের আয়ের তুলনামূলক চিত্র

দ্বাদশ জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীরা হলফনামায় নিজেদের বার্ষিক আয়ের যে উল্লেখ করেছেন তা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আয়কর স্ল্যাব অনুযায়ী বিশ্লেষণে দেখা যায়, বার্ষিক সাড়ে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত আয় করেন মোট প্রার্থীর ২৭ দশমিক ৩৯ শতাংশ প্রার্থী। আর সর্বোচ্চ ২৮ দশমিক ২১ শতাংশের আয় বার্ষিক সাড়ে ১৬ লাখ টাকার বেশি। ৩ দশমিক ৫ লাখ + থেকে ৪ দশমিক ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় ১৫ দশমিক ৬৯ শতাংশ প্রার্থীর, ৪ দশমিক ৫ লাখ + থেকে ৭ দশমিক ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক আয় ১৪ দশমিক ৩১ শতাংশ প্রার্থীর। সাড়ে সাত লাখ + থেকে সাড়ে ১১ লাখ টাকা আয় ৮ দশমিক ৭৯ শতাংশ ও সাড়ে ১১ লাখ থেকে সাড়ে ১৬ লাখ টাকা আয় ৫ দশমিক ৬২ শতাংশ প্রার্থীর।

চিত্র-১০ : দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের আয়ের তুলনামূলক চিত্র

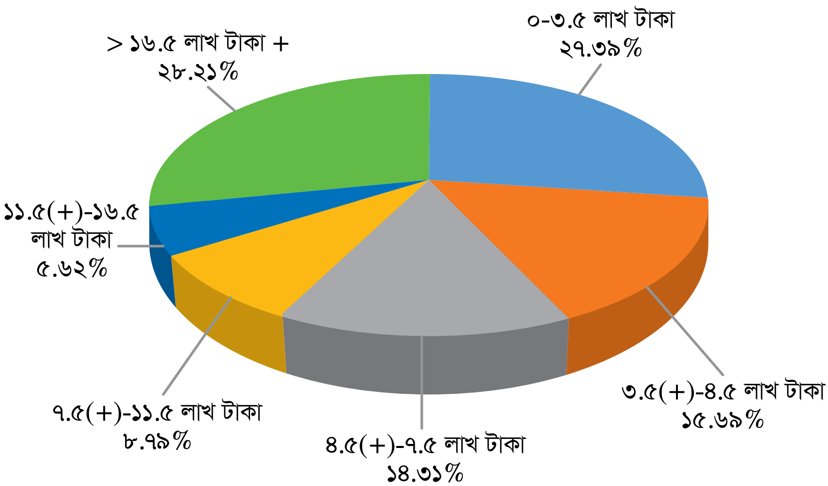

বছরে অন্তত এক কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা আগের তিন নির্বাচনের তুলনায় বেড়েছে ২০২৪ সালের নির্বাচনে। দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের মধ্যে ১৬৪ জন বছরে অন্তত এক কোটি টাকা আয় করেন। ২০০৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ৪৩। ২০১৪ সালের নির্বাচনে তা কিছুটা বেড়ে ৬২ হয়, ২০১৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৪৩। একইভাবে বেড়েছে বছরে অন্তত ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যাও। ২০২৪ জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে ৭১৪ জন বছরে ১০ লাখ টাকা বা তার বেশি আয় করেন, যা মোট প্রার্থীর ৩৬ দশমিক ১৩ শতাংশ। এমন আয়ের প্রার্থীর সংখ্যাও বেড়েছে ২০০৮ সালের পর থেকে। বছরে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা আয় করা প্রার্থীর সংখ্যা ২০০৮ সালে ছিল ৩৪৭, ২০১৪ সালে যদিও তা কমে দাড়াঁয় ২৫১ জনে। ২০১৮ সালে তা একলাফে গিয়ে ঠেকে ৬৩৩ জনে (চিত্র-১৩)।

স্মারণি-২ : বছরে ১ কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর নির্বাচনভিত্তিক সংখ্যা

নির্বাচন	নবম নির্বাচন (২০০৮ সাল)	দশম নির্বাচন (২০১৪ সাল)	একাদশ নির্বাচন (২০১৮ সাল)	দ্বাদশ নির্বাচন (২০২৪ সাল)
প্রার্থীর সংখ্যা	৪৩	৬২	১৪৩	১৬৪

চিত্র-১১ : বছরে ১০ লাখ টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার (নির্বাচনভিত্তিক)

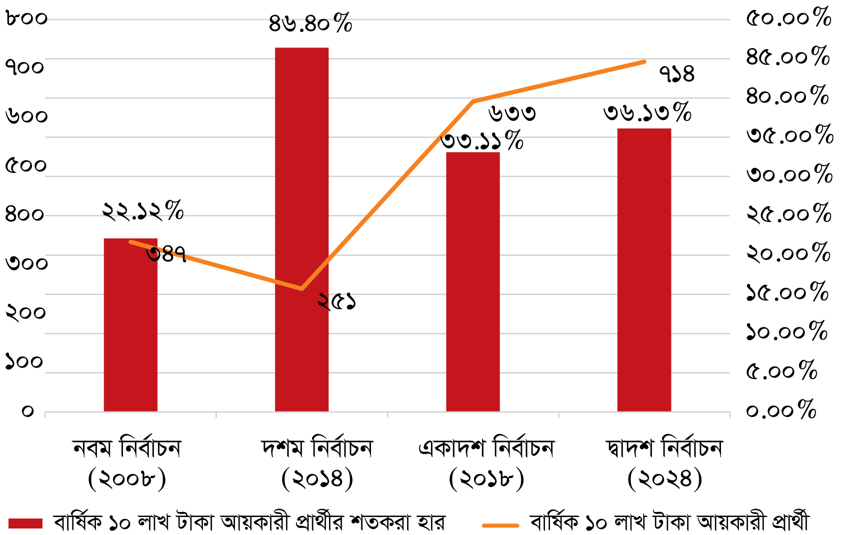

প্রার্থীদের অস্থাবর সম্পদের তুলনামূলক চিত্র

নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামায় ২০২৪ সালে সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীরা নিজ নামে, স্বামী/স্ত্রী ও নির্ভরশীলের নামে অস্থাবর সম্পদের যে হিসাব জমা দিয়েছেন তাতে অংশগ্রহণকারী সব প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদের মোট পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৩ হাজার ৪০ কোটি টাকা। এই অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে বন্ড, ঋণপত্র, শেয়ার, বিনিয়োগ, হাতে ও ব্যাংকে নগদ টাকা, যানবাহন, আসবাব ও ইলেকট্রনিকস, স্বর্ণ ও অন্যান্য অলংকার, বৈদেশিক মুদ্রা ও অন্যান্য বিষয়।

চিত্র-১২ : সব প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদের মোট পরিমাণ, ধরন ও বণ্টন

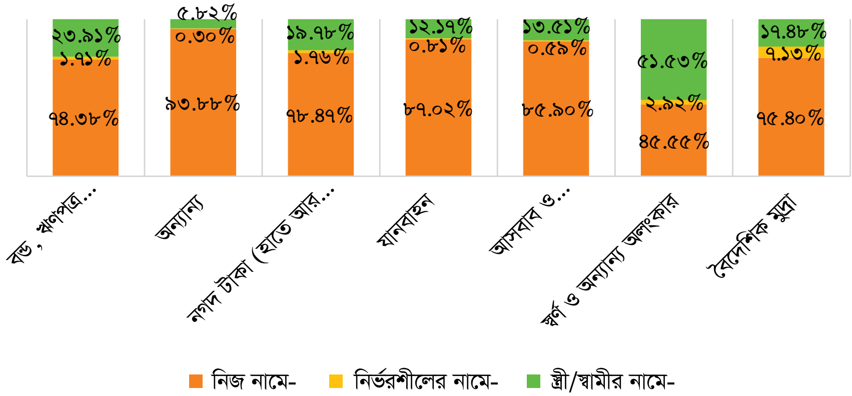

অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থী

নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়া হলফনামার তথ্য অনুযায়ী অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রায় ২১ জন বা মোট প্রার্থীর ১ দশমিক ১১ শতাংশের সম্পদমূল্য ১০০ কোটি টাকার বেশি। তবে ৭১ দশমিক ১৬ শতাংশ প্রার্থীর অস্থাবর সম্পদ ১ কোটি টাকার নিচে। ১ থেকে ১০ কোটির মালিক ২২ দশমিক ০৯ শতাংশ, ১০ কোটি ১ টাকা থেকে ৫০ কোটি টাকার মালিক ৪ দশমিক ৬৯ শতাংশ, ৫০ কোটি ১ টাকা থেকে ১০০ কোটির মালিক শূন্য দশমিক ৯৫ শতাংশ।

চিত্র-১৩ : অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে কোটিপতি প্রার্থীদের বণ্টন

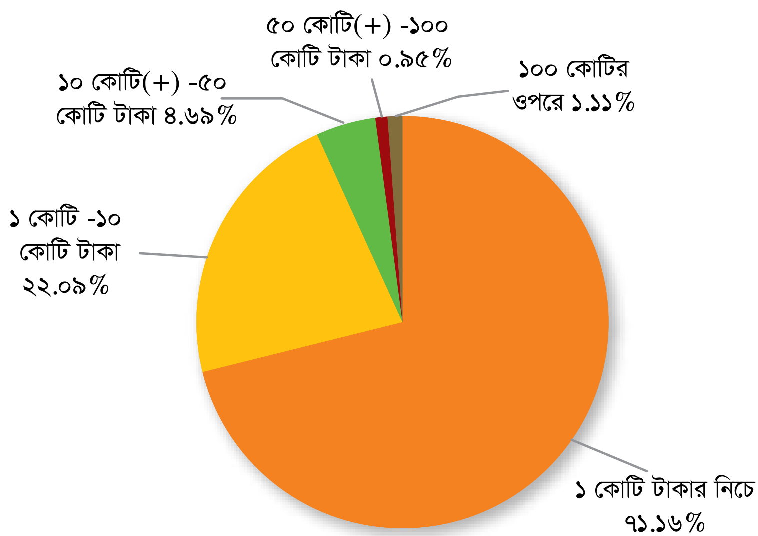

স্বাভাবিকভাবেই সর্বশেষ চার নির্বাচনের মধ্যে সর্বোচ্চসংখ্যক কোটিপতি প্রার্থী অংশ নিয়েছেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে। ৫৪৭ জন বা মোট প্রার্থীর ২৭ দশমিক ৬৪ শতাংশই কোটিপতি। নবম, দশম ও একাদশ নির্বাচনে এই হার ছিল যথাক্রমে ১৭ দশমিক ৪৬ শতাংশ (২৭৪ জন), ৩৭ দশমিক ২৭ শতাংশ (২০২ জন) এবং ২৭ দশমিক ১৭ শতাংশ (৫২০ জন)। (চিত্র-১৬)

চিত্র-১৪ : অস্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে নির্বাচনভিত্তিক কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

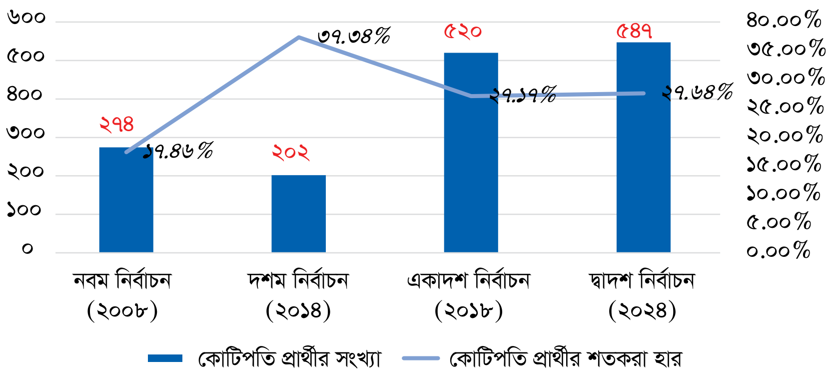

২০২৪ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া কোটিপতি প্রার্থীদের দলভিত্তিক বিশ্লেষণ বলছে, এমন প্রার্থীর সংখ্যা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগে ২৩৬। অর্থাৎ আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর ৮৮ দশমিক ৭২ শতাংশই কোটিপতি। (চিত্র-১৭) দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। অংশগ্রহণকারী স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ৪৫ দশমিক ৭৪ শতাংশ (২০৪ জন) কোটিপতি।

চিত্র-১৫ : স্বতন্ত্র ও দলভিত্তিক কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

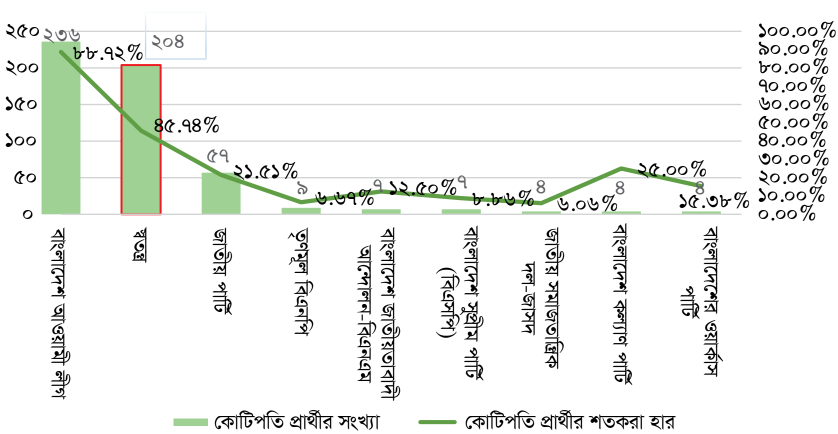

চারটি নির্বাচনের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০০৮ সালে যেখানে আওয়ামী লীগের ২৮ দশমিক ২৫ শতাংশ প্রার্থী ছিলেন কোটিপতি, ১৫ বছরের ব্যবধানে এই দলের প্রার্থীদের মধ্যে কোটিপতির প্রার্থীর শতকরা হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৮ দশমিক ৭২ শতাংশে। জাতীয় পার্টির বেলায় অবশ্য এই হার কমেছে প্রায় ১৫ শতাংশ। ২০২৪ সালের নির্বাচনে অংশ নেয়নি বড় রাজনৈতিক দল বিএনপি। ২০০৮ সালে দলটিতে কোটিপতি প্রার্থীদের হার ছিল ৪৪ দশমিক ৭১ শতাংশ, যা ২০১৮ সালের একাদশ সংসদ নির্বাচনে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১ দশমিক ৬৮ শতাংশে। (চিত্র-১৮) অর্থাৎ বড় দুটি দলেই কোটিপতি প্রার্থী মনোনয়ন সময়ের সঙ্গে বেড়েছে।

চিত্র-১৬ : দল ও নির্বাচনভিত্তিক কোটিপতি প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

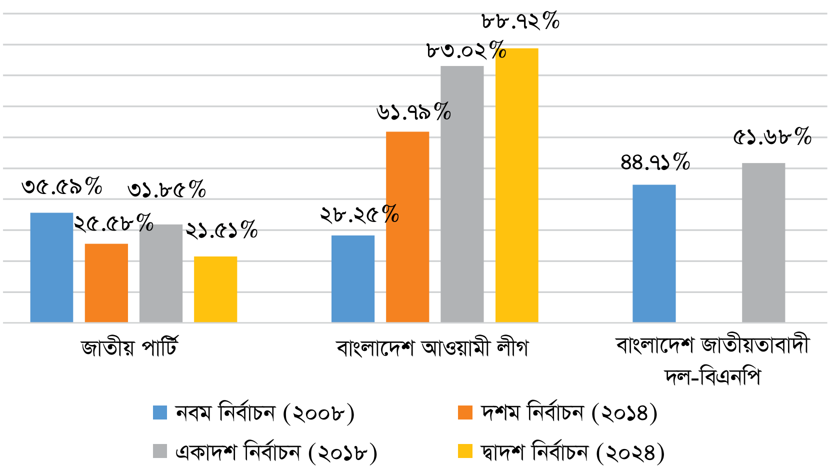

অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে শীর্ষ সম্পদশালী ২০ প্রার্থীর তালিকার ১২ জনই ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের। শীর্ষ সম্পদশালী প্রার্থী হিসেবে ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজী। হলফনামায় তার অস্থাবর সম্পদমূল্য দেখানো হয়েছে ১ হাজার ৩৪৫ কোটি ৭৭ লাখ টাকা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এ কে একরামুজ্জামান ৪২১ কোটি ১৬ লাখ টাকার সম্পদ নিয়ে আছেন তালিকার দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন গাজীপুর-৪ আসনের আলম আহমেদ, তার সম্পদমূল্য ৩২২ কোটি টাকা। পরবর্তী তিনটি স্থানে আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা। ৩১৫ কোটি ৭৬ লাখ টাকা নিয়ে ঢাকা-১ আসনের সালমান ফজলুর রহমান চতুর্থ, ৩০৬ কোটি ৬৮ লাখ টাকা নিয়ে কুমিল্লা-৮ আসনের আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন পঞ্চম ও ২৭৭ কোটি ৬২ লাখ টাকা নিয়ে কুমিল্লা-৩ আসনের ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন আছেন তালিকার ছয় নম্বরে। এরপরই রয়েছেন চুয়াডাঙ্গা-১-এর স্বতন্ত্র প্রার্থী দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। তার সম্পদের পরিমাণও ২৭৭ কোটি টাকার বেশি।

সারণি-৩ : দ্বাদশ নির্বাচনে ২১ শতকোটিপতি প্রার্থী (অস্থাবর সম্পদ মূল্যের ভিত্তিতে)

প্রার্থী	সংসদীয় আসন	মোট অস্থাবর সম্পদ	দল
গোলাম দস্তগীর গাজী	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	১৩৪৫.৭৭ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
এস এ কে একরামুজ্জামান	২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	৪২১.১৭ কোটি	স্বতন্ত্র
আলম আহমেদ	১৯৭ গাজীপুর-৪	৩২২.৭৯ কোটি	স্বতন্ত্র
সালমান ফজলুর রহমান	১৭৪ ঢাকা-১	৩১৫.৭৬ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আবু জাফর মোহাম্মদ শফি উদ্দিন	২৫৬ কুমিল্লা-৮	৩০৬.৬৮ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
ইউসুফ আব্দুল্লাহ হারুন	২৫১ কুমিল্লা-৩	২৭৭.৬২ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
দিলীপ কুমার আগরওয়ালা	০৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১	২৭৭.৩২ কোটি	স্বতন্ত্র
আব্দুল মমিন মন্ডল	০৬৬ সিরাজগঞ্জ-৫	২৫৩.২৪ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাজী গোলাম মূর্তজা	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	২৩২.৯৭ কোটি	স্বতন্ত্র
মো. সিরাজুল ইসলাম মোল্লা	২০১ নরসিংদী-৩	১৭৪.০২ কোটি	স্বতন্ত্র
আব্দুস সালাম মুর্শেদী	১০২ খুলনা-৪	১৬৯.৩০ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মোহাম্মদ সাঈদ খোকন	১৭৯ ঢাকা-৬	১৬২.৯৭ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আবুল কাদের আজাদ	২১৩ ফরিদপুর-৩	১৫৬.৪০ কোটি	স্বতন্ত্র
সেলিমা আহমাদ	২৫০ কুমিল্লা-২	১৫২.২৮ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মোরশেদ আলম	২৬৯ নোয়াখালী-২	১৩৭.০১ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আনোয়ার হোসেন খান	২৭৪ লক্ষ্মীপুর-১	১৩৫.৯৩ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মাহমুদা বেগম	২৭৭ লক্ষ্মীপুর-৪	১৩০.৪২ কোটি	স্বতন্ত্র
মো. আবদুল্লাহ	২৭৭ লক্ষ্মীপুর-৪	১৩০.৪২ কোটি	স্বতন্ত্র
আ হ ম মুস্তফা কামাল	২৫৮ কুমিল্লা-১০	১০৪.১৮ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
নূর মোহাম্মদ	১৩৮ জামালপুর-১	১০২.২৬ কোটি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
দেওয়ান জাহিদ আহমেদ	১৬৯ মানিকগঞ্জ-২	১০০.৪৪ কোটি	স্বতন্ত্র

প্রার্থীদের স্থাবর সম্পদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থীরা স্থাবর সম্পদ হিসেবে জমি (কৃষি/অকৃষি), দালান, অ্যাপার্টমেন্ট, খামার এবং বাগানের উল্লেখ করেছেন। স্থাবর এসব সম্পদের অর্জনকালীন মূল্য বর্তমান বাজারমূল্যের সাথে মিল না থাকায় এ ক্ষেত্রে জমির ক্ষেত্রে পরিমাণ ও দালান, অ্যাপার্টমেন্ট, খামার এবং বাগানের সংখ্যা তুলনার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

জমির মালিকানার পরিমাণের ভিত্তিতে করা বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০২৪ জাতীয় নির্বাচনের হলফনামা অনুযায়ী কমপক্ষে ১ একর জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা একাদশ নির্বাচনের তুলনায় কিছুটা কমেছে। এ নির্বাচনে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৭১৬। ২০১৮ সালে কমপক্ষে ১ একর জমির মালিকানা আছে এমন প্রার্থী ছিলেন ৭৪৫ জন। ২০০৮ সালের নির্বাচনে এই সংখ্যা ছিল সর্বোচ্চ ৭৫৭।

চিত্র-১৭ : কমপক্ষে ১ একর জমি আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

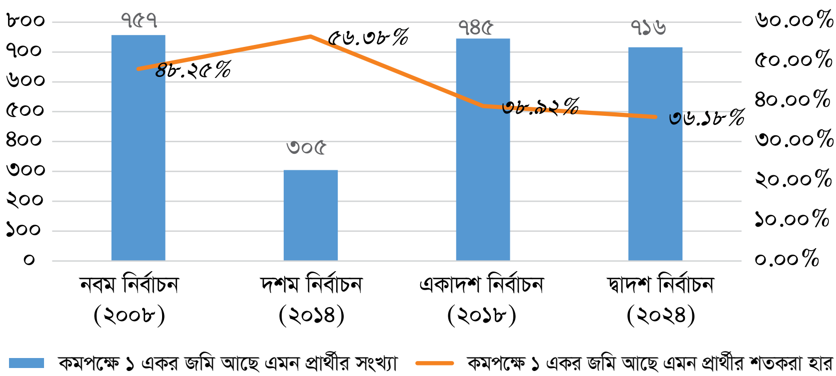

কৃষিজমির মালিকানা অনুযায়ী হিসাব করলে, সবচেয়ে বেশি কৃষিজমির মালিকানা দেখিয়েছেন কিশোরগঞ্জ-৩ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. গোলাম কবির ভূঞা, তার জমির পরিমাণ ৬৪৬ একর। ১০০ একরের ওপর কৃষিজমির মালিকানা রয়েছে বগুড়া-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোছা. বিউটি বেগম (৫৪৭ একর), নড়াইল-২ আসনের সৈয়দ ফয়জুল আমির দেখিয়েছেন ২৫০ একর, ময়মনসিংহ-৪ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ মোহিত উর রহমান দেখিয়েছেন ১৯৫.৪০ একর এবং বাগেরহাট-৪ আসনের মো. জামিল হোসাইনের রয়েছে ১১০ দশমিক ৫০ একর। নিচে সর্বোচ্চ কৃষিজমি আছে এমন ১০ জনের তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

সারণি-৪ : শীর্ষ ১০ কৃষি জমিধারী প্রার্থীর তালিকা

প্রার্থীর নাম	কৃষি জমি (একর)	অকৃষি জমি (একর)	মোট জমি (একর)	দল	সংসদীয় আসন
মো. গোলাম কবির ভূঞা	৬৪৬.৭২	০.৯০	৬৪৭.৬২	স্বতন্ত্র	১৬৪ কিশোরগঞ্জ-৩
মোছা. বিউটি বেগম	৫৪৭.৯৭		৫৪৭.৯৭	স্বতন্ত্র	০৩৭ বগুড়া-২
সৈয়দ ফয়জুল আমির	২৫০.০০	৩.৭৭	২৫৩.৭৭	স্বতন্ত্র	০৯৪ নড়াইল-২
মোহাম্মদ মোহিত উর রহমান	১৯৫.৪০	০.০৪	১৯৫.৪৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪৯ ময়মনসিংহ-৪
মো. জামিল হোসাইন	১১০.৫০		১১০.৫০	স্বতন্ত্র	০৯৮ বাগেরহাট-৪
ফিরোজুর রহমান	৭৯.১৩	৩.৯৪	৮৩.০৭	স্বতন্ত্র	২৪৫ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩
শেখ আফিল উদ্দিন	৬৭.৭৪		৬৭.৭৪	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০৮৫ যশোর-১
হোসাইন মো. আবু তৈয়ব	৬৬.৬৭	৩.০০	৬৯.৬৭	স্বতন্ত্র	২৭৯ চট্টগ্রাম-২
কামাল আহমেদ মজুমদার	৬১.৬১		৬১.৬১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৮৮ ঢাকা-১৫
মো. ছিদ্দিকুর রহমান	৬০.০০		৬০.০০	জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ	১১৫ ভোলা-১

সর্বোচ্চ অকৃষি জমির মালিক জামালপুর-৫ আসনে জাতীয় পার্টির মো. জাকির হোসেন, মোট জমি ৮১৩.০২ একর। নাটোর-৪ আসনে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির মো. আলাউদ্দিন মৃধা ৫৭০ দশমিক ৫ একর অকৃষি জমির মালিকানা নিয়ে তালিকার দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন। ৩৭০ একরের ওপর অকৃষি জমির মালিকানা আছে পিরোজপুর-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মো. মহিউদ্দীন মহারাজের। এখানে উল্লেখ্য যে, ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট-২০২৩ অনুযায়ী একজন ব্যক্তির ভূমির মালিকানা পাওয়ার সর্বোচ্চ সীমা কৃষিজমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা এবং অকৃষি জমিসহ যা ১০০ বিঘা পর্যন্ত যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কৃষি ও অকৃষি মিলিয়ে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে কমপক্ষে ১০ জন প্রার্থীর কাছে আইনি সীমার অতিরিক্ত ভূমির মালিকানা রয়েছে।

সারণি-৫ : শীর্ষ ১০ অকৃষিজমিধারী প্রার্থীর তালিকা

প্রার্থীর নাম.	কৃষি জমি (একর)	অকৃষি জমি (একর)	মোট জমি (একর)	দল	সংসদীয় আসন.
মো. জাকির হোসেন		৮১৩.০২	৮১৩.০২	জাতীয় পার্টি	১৪২ জামালপুর-৫
মো. আলাউদ্দিন মৃধা	১৪.৯৫	৫৭০.৫০	৫৮৫.৪৫	জাতীয় পার্টি	০৬১ নাটোর-৪
মো. মহিউদ্দীন মহারাজ	১০.২৫	৩৭০.৫০	৩৮০.৭৫	স্বতন্ত্র	১২৮ পিরোজপুর-২
জয়া সেনগুপ্তা	১০.০০	৮৫.০০	৯৫.০০	স্বতন্ত্র	২২৫ সুনামগঞ্জ-২
কাজী কেরামত আলী		৭১.৯০	৭১.৯০	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২০৯ রাজবাড়ী-১
মো. আবু হানিফ হৃদয়	০.৬০	৪৩.৬৫	৪৪.২৫	তৃণমূল বিএনপি	২০৫ নারায়ণগঞ্জ-২
আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ	১৭.০০	৪১.০৫	৫৮.০৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১১৯ বরিশাল-১
মো. তারিকুল ইসলাম তারিক	৮.৮৬	৩৬.৫৬	৪৫.৪২	স্বতন্ত্র	০০৯ দিনাজপুর-৪
শেখ হেলাল উদ্দীন		৩২.১৭	৩২.১৭	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০৯৫ বাগেরহাট-১
নসরুল হামিদ	১.৯৮	৩০.৫৫	৩২.৫৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৭৬ ঢাকা-৩

কমপক্ষে তিনটি দালান/ অ্যাপার্টমেন্ট/ খামার/বাগান আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ৩০৫, যা মোট প্রার্থীর ১৫ দশমিক ৪১ শতাংশ। ২০১৮ নির্বাচনের এমন প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৮৪ বা ১৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ।

চিত্র-১৮ : কমপক্ষে ৩টি দালান/অ্যাপার্টমেন্ট/খামার/বাগান আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা ও শতকরা হার

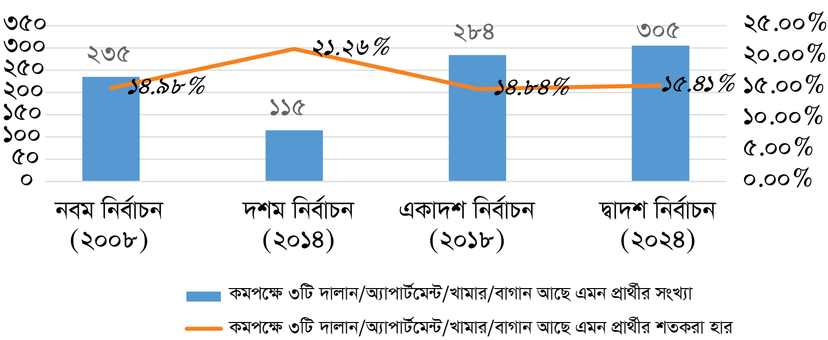

দায়-দেনা ও ঋণের ভিত্তিতে প্রার্থীদের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সর্বশেষ চার জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে ২০২৪ সালের নির্বাচনে সবচেয়ে কমসংখ্যক প্রার্থী দায় বা ঋণগ্রস্ত। ২০১৪ সালের নির্বাচনে ৪২ দশমিক ৩৩ শতাংশ প্রার্থীর দায় বা ঋণ ছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তা নেমে আসে ২৮ দশমিক ৮৪ শতাংশ ও ২০২৪ সালের নির্বাচনে ২৮ দশমিক ০৯ শতাংশ প্রার্থীর দায় বা ঋণ রয়েছে।(চিত্র-২১)

চিত্র-১৯ : দায় ও ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর শতকরা হার

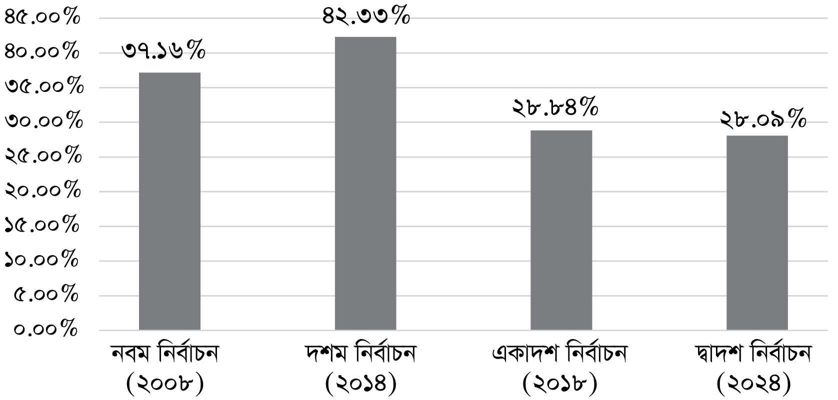

দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মোট দায়দেনা ও ঋণের পরিমাণ ১৫ হাজার ৯৭৩ কোটি ৩৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে ব্যাংক থেকে নেওয়া হয়েছে প্রায় ১১ হাজার ৬৯৫ কোটি টাকা। আর ব্যক্তিগত ও অন্যান্য খাত থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার ২৭৭ কোটি ৬৬ লাখ টাকা (চিত্র-২২)। এই ঋণের ৫০ শতাংশই প্রার্থীরা একক ঋণ হিসেবে নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা পরিচালক হওয়ার সুবাদে ২১ শতাংশ প্রার্থী ঋণগ্রস্ত হয়েছেন। যৌথ ঋণ ১৯ শতাংশ ও নির্ভরশীলদের ঋণ ১০ শতাংশ (চিত্র-২৩)।

চিত্র-২০ : দ্বাদশ নির্বাচনে প্রার্থীদের মোট দায়দেনা ও ঋণ

চিত্র- ২১ : দ্বাদশ নির্বাচনে প্রার্থীদের মোট দায়দেনা ও ঋণের মালিকানার ধরন

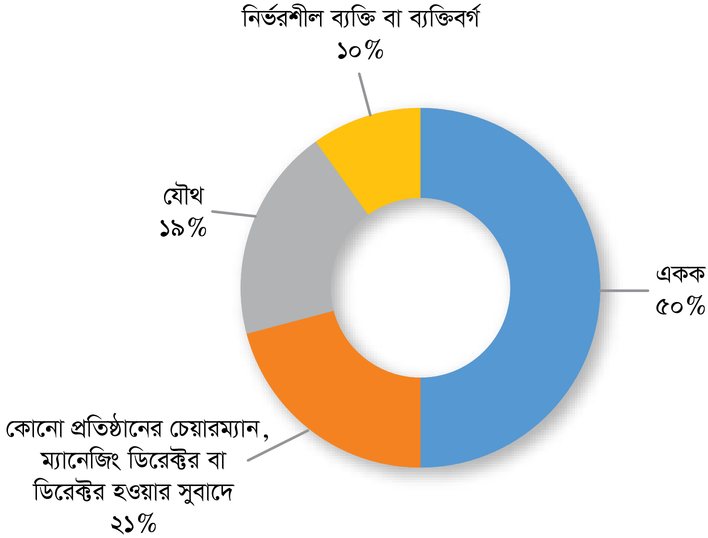

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ঋণ আছে এমন প্রার্থী হলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এ কে একরামুজ্জামান। তার ঋণ বা দায়ের পরিমাণ ২ হাজার ৫৩৬ কোটি ৮৬ লাখ টাকা। এক হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ রয়েছে চট্টগ্রাম-১০ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ মনজুর আলমের (২ হাজার ৬ কোটি ৬ লাখ টাকা), নারায়ণগঞ্জ-১ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজীর (১ হাজার ৯৫৮ কোটি ১৩ লাখ টাকা) এবং গাইবান্ধা-৫ আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাহমুদ হাসানের (১ হাজার ২০৯ কোটি ১৫ লাখ টাকা)। নিচে শীর্ষ ১০ ঋণ ও দায়সম্পন্ন প্রার্থীর তালিকা দেওয়া হলো।

সারণি-৬ : দ্বাদশ নির্বাচনে শীর্ষ ১০ ঋণ ও দায়সম্পন্ন প্রার্থী

প্রার্থীর নাম	ঋণ বা দায়ের পরিমাণ	সংসদীয় আসন	দল
এস এ কে একরামুজ্জামান	২৫৩৬.৮৬ কোটি	২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	স্বতন্ত্র
মোহাম্মদ মনজুর আলম	২০০৬.০৬ কোটি	২৮৭ চট্টগ্রাম-১০	স্বতন্ত্র
গোলাম দস্তগীর গাজী	১৯৫৮.১৩ কোটি	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
মাহমুদ হাসান	১২০৯.১৫ কোটি	০৩৩ গাইবান্ধা-৫	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

প্রার্থীর নাম	ঋণ বা দায়ের পরিমাণ	সংসদীয় আসন	দল
কাজী নাবিল আহমেদ	৯১৯.২৮ কোটি	০৮৭ যশোর-৩	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন	৭৬৪.২৪ কোটি	০৩৫ জয়পুরহাট-২	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ
গাজী গোলাম মূর্তজা	৫৯৫.৯২ কোটি	২০৪ নারায়ণগঞ্জ-১	স্বতন্ত্র
ইশতিয়াক আহমেদ সৈকত	৫৫৮.৩৬ কোটি	২৬৭ ফেনী-৩	স্বতন্ত্র
এ কে এম সেলিম ওসমান	৫২১.০০ কোটি	২০৮ নারায়ণগঞ্জ-৫	জাতীয় পার্টি
এম এ রাজ্জাক খান	৫০৬.৭২ কোটি	০৭৯ চুয়াডাঙ্গা-১	স্বতন্ত্র

দলভিত্তিক তুলনা করলে ঋণ ও দায় রয়েছে এমন প্রার্থীর হার সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগে। এ দলের প্রায় অর্ধেক প্রার্থীরই (৫০ দশমিক ৭৫ শতাংশ) দায়দেনা ও ঋণ রয়েছে। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা ওয়ার্কার্স পার্টির ৪৬ দশমিক ১৫ শতাংশ প্রার্থীর ঋণ রয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে আছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। ২০২৪ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা ৪০ দশমিক ৩৬ শতাংশ স্বতন্ত্র প্রার্থীরই দায়দেনা ও ঋণ রয়েছে। (চিত্র-২৪)

চিত্র-২২ : দলভিত্তিক দায়দেনা ও ঋণগ্রস্ত প্রার্থীর হার

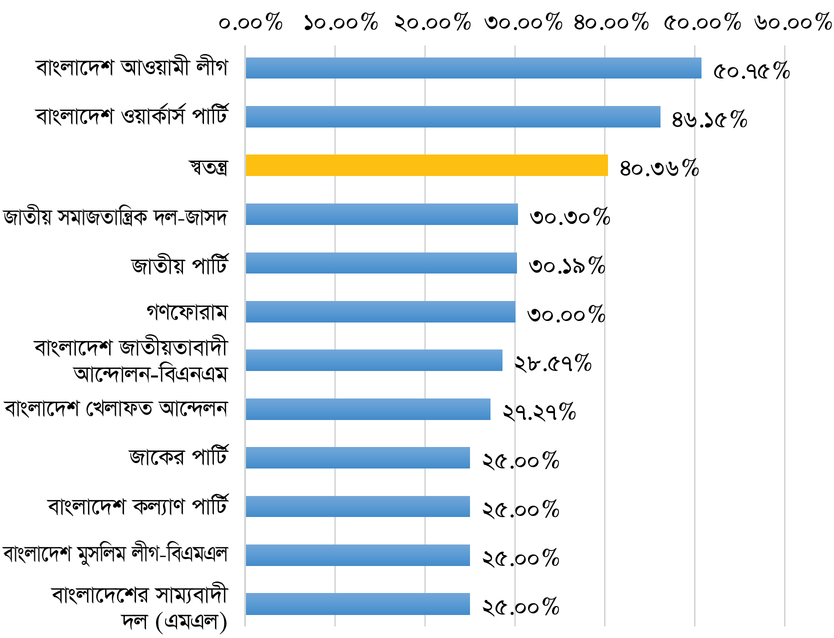

১১. একাদশ সংসদের এমপি ও মন্ত্রীদের আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির হার

সর্বশেষ চার নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, নির্বাচিত হওয়া এমপি-মন্ত্রীদের আয় ও সম্পদ বেড়েছে বিপুল পরিমাণে। একাদশ জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের গত পাঁচ বছরে আয় বেড়েছে অবিশ্বাস্যভাবে। মাত্র ৭০ জন সংসদ সদস্যের আয় কমেছে (২ থেকে ৯০ শতাংশ)। ২৫ সংসদ সদস্যের আয় অপরিবর্তিত রয়েছে। আয় বেড়েছে ১২৭ জনের। এর মধ্যে ৯৬ জন সংসদ সদস্যের আয় বেড়েছে ৫০ শতাংশের বেশি। আয় বৃদ্ধির হার বিবেচনায় নিলে দেখা যায়, গত পাঁচ বছরে আয় বৃদ্ধি পাওয়া শীর্ষ দশ এমপির প্রত্যেকের আয় বেড়েছে ১৬০০ শতাংশের বেশি। তালিকার শীর্ষে থাকা বগুড়া-৭ আসনের মো. রেজাউল করিম বাবলুর আয় বেড়েছে ৭২ হাজার ৩৮৬ শতাংশ। এরপরই রয়েছেন মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রাং (নওগাঁ-৪), আয় বেড়েছে ৪২৮২ শতাংশ। ৩৬০৯ শতাংশ আয় বেড়ে তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছেন বরিশাল-৫ আসনের সংসদ সদস্য জাহিদ ফারুক। এরপরই রয়েছেন ঢাকা-২০ আসনের বেনজীর আহমেদ (২২৩৮ দশমিক ১০ শতাংশ)। কুষ্টিয়া-১-এর আ ক ম সরওয়ার জাহানের আয় বেড়েছে ২২০০ শতাংশ। রংপুর-৪-এর সংসদ সদস্য ও বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির আয় বেড়েছে ২১৩১ শতাংশ। বগুড়া-২-এর শরিফুল ইসলাম জিন্নাহর আয় বেড়েছে ২০৭৪ শতাংশ।

সারণি-৭ : একাদশ সংসদের এমপিদের পাঁচ বছরে আয় বৃদ্ধির হার (শীর্ষ ১০)

প্রার্থী	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
মো. রেজাউল করিম (বাবলু)	০৪২ বগুড়া-৭	৭২৩৮৬.৭০%
মুহা. ইমাজ উদ্দিন প্রাং	০৪৯ নওগাঁ-৪	৪২৮২.১৮%
জাহিদ ফারুক	১২৩ বরিশাল-৫	৩৬০৯.৭৪%
বেনজীর আহমদ	১৯৩ ঢাকা-২০	২২৩৮.১০%
আ কা ম সরওয়ার জাহান	০৭৫ কুষ্টিয়া-১	২২০০.৫৮%
টিপু মুনশি	০২২ রংপুর-৪	২১৩১.১২%
শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ	০৩৭ বগুড়া-২	২০৭৪.৮৩%
মো. শহিদুল ইসলাম (বকুল)	০৫৮ নাটোর-১	১৯৭২.১৬%
মোস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী	২৯৩ চট্টগ্রাম-১৬	১৯০০.৯৩%
শেখ আফিল উদ্দিন	০৮৫ যশোর-১	১৬০৮.৬৩%

আয় বৃদ্ধির হারে সংসদ সদস্যদের স্ত্রী ও নির্ভরশীলরাও পিছিয়ে নেই। এ তালিকায় সবার আগে রয়েছেন ঢাকা-৪ আসনের সংসদ সদস্য সৈয়দ আবু হোসেনের স্ত্রী ও নির্ভরশীলরা, বেড়েছে ৩৯৯৩ শতাংশ আয়। দ্বিতীয় অবস্থানে কুমিল্লা-৪-এর রাজী মোহাম্মদ ফখরুলের স্ত্রী ও নির্ভরশীলের আয় বৃদ্ধি, বেড়েছে ৩৬১৯ শতাংশ। চট্টগ্রাম-১৫ আসনের সংসদ সদস্য আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিনের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের আয় বেড়েছে ২৪০৯ দশমিক ৬৮ শতাংশ। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের আয় বেড়েছে ২১৩১ দশমিক ১২ শতাংশ। লক্ষ্মীপুর-১-এর আনোয়ার হোসেন খানের পরিবারের আয় বেড়েছে ১৯৫২ শতাংশ। নরসিংদী-৪-এর সংসদ সদস্য নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এবং ফেনী-২-এর সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন হাজারীর নির্ভরশীলদের আয় বেড়েছে ১২৩০ শতাংশের বেশি।

সারণি-৮ : একাদশ সংসদের এমপিদের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের ৫ বছরে আয় বৃদ্ধির হার (শীর্ষ ১০)

প্রার্থী	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের আয় বৃদ্ধি
সৈয়দ আবু হোসেন	১৭৭ ঢাকা-৪	৩৯৯৩.৩৮%
রাজী মোহাম্মদ ফখরুল	২৫২ কুমিল্লা-৪	৩৬১৯.৯৩%
আবু রেজা মুহাম্মদ নেজামুদ্দিন	২৯২ চট্টগ্রাম-১৫	২৪০৯.৬৮%
টিপু মুনশি	০২২ রংপুর-৪	২১৩১.১২%
আনোয়ার হোসেন খান	২৭৪ লক্ষ্মীপুর-১	১৯৫২.৮৩%
নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন	২০২ নরসিংদী-৪	১২৪৮.৮২%
নিজাম উদ্দিন হাজারী	২৬৬ ফেনী-২	১২৩০.০৫%
মো. মহিববুর রহমান	১১৪ পটুয়াখালী-৪	৬৭৯.৯৩%
মো. আবু জাহির	২৪১ হবিগঞ্জ-৩	৬৭৩.৪৮%
ইসরুল হামিদ	১৭৬ ঢাকা-৩	৬২৭.৪৭%

আয়ের পাশাপাশি সংসদ সদস্যদের গত পাঁচ বছরে অস্থাবর সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। আগের তুলনায় ৫০ শতাংশের চেয়ে বেশি অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ১১৪ জন সংসদ সদস্যের। অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির তালিকার শীর্ষে রয়েছেন নোয়াখালী-৩-এর সংসদ সদস্য মামুনুর রশীদ কিরণ। অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ৩০৬৫ শতাংশ। ২২৯৬ শতাংশ সম্পদ বেড়ে তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরী। বগুড়া-৭-এর সংসদ সদস্য মো. রেজাউল করিম বাবলুর সম্পদ বেড়েছে ২০৫০ শতাংশ।

সারণি-৯ : একাদশ সংসদের এমপিদের পাঁচ বছরে সম্পদ বৃদ্ধির হার (শীর্ষ ১০)

প্রার্থী	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
মো. মামুনুর রশীদ কিরণ	২৭০ নোয়াখালী-৩	৩০৬৫.৫৮%
আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরী	০২০ রংপুর-২	২২৯৬.০১%
মো. রেজাউল করিম (বাবলু)	০৪২ বগুড়া-৭	২০৫০.৯১%
মো. শহিদুল ইসলাম (বকুল)	০৫৮ নাটোর-১	১৯১৩.২৮%
কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা	২৯৮ খাগড়াছড়ি	১০৫৪.৯০%
মো. মহিববুর রহমান	১১৪ পটুয়াখালী-৪	১০২৪.৭৪%
আনিসুল হক	২৪৬ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪	১০১৪.৭৯%
জাহিদ ফারুক	১২৩ বরিশাল-৫	৯২৯.৪১%
মেহের আফরোজ	১৯৮ গাজীপুর-৫	৮২৭.৯৬%
গোলাম কিবরিয়া টিপু	১২১ বরিশাল-৩	৭৫৮.৯৩%

বিগত পাঁচ বছরে একাদশ জাতীয় সংসদের সংসদ সদস্যদের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদও বেড়েছে অবিশ্বাস্য হারে। বগুড়া-২ আসনের সংসদ সদস্য শরিফুল ইসলাম জিন্নাহর নির্ভরশীলদের সম্পদ বেড়েছে সর্বোচ্চ ৯৯০৭ শতাংশ। নওগাঁ-২-এর সংসদ সদস্য মো. শহীদুজ্জামান সরকারের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ গত পাঁচ বছরে বেড়েছে প্রায় ৬০৮৭ শতাংশ। তালিকায় থাকা বাকি ৮ জন সংসদ সদস্যের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে এক হাজার শতাংশের বেশি। সব মিলিয়ে একাদশ সংসদের সদস্যদের মধ্যে ৭১ জনের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বেড়েছে ৫০ ভাগের বেশি।

সারণি-১০ : একাদশ সংসদের এমপিদের স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের পাঁচ বছরে অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হার (শীর্ষ ১০)

প্রার্থী	আসন	২০১৮ সালের তুলনায় স্ত্রী ও নির্ভরশীলদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
শরিফুল ইসলাম জিন্নাহ	০৩৭ বগুড়া-২	৯৯০৭.১৫%
মো. শহীদুজ্জামান সরকার	০৪৭ নওগাঁ-২	৬০৮৭.৫০%
মুহিবুর রহমান মানিক	২২৮ সুনামগঞ্জ-৫	২৫৭৯.৯৭%
মো. মহিববুর রহমান	১১৪ পটুয়াখালী-৪	২০৯৩.৫২%
রাজী মোহাম্মদ ফখরুল	২৫২ কুমিল্লা-৪	১৯৯৮.৪২%
সৈয়দ আবু হোসেন	১৭৭ ঢাকা-৪	১৭৬৪.৬৮%
বদরুদ্দোজা মো. ফরহাদ হোসেন	২৪৩ ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১	১৪৭১.৬১%
আবুল কালাম মো. আহসানুল হক চৌধুরী	০২০ রংপুর-২	১২১৫.৫৬%
আ কা ম সরওয়ার জাহান	০৭৫ কুষ্টিয়া-১	১১৬২.০২%
মো. ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্	১৮৯ ঢাকা-১৬	১০৮৫.৪৯%

২০০৮ সালের তুলনায় অর্থাৎ গত ১৫ বছরে আয় বৃদ্ধির তালিকায় শীর্ষ দশ সংসদ সদস্যের প্রত্যেকের অন্তত ২৯০০ শতাংশ বেড়েছে। ভোলা-৪ আসনের সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের আয় গত ১৫ বছরে বেড়েছে ২০১৯২ শতাংশ। কুষ্টিয়া-৩-এর সংসদ সদস্য মাহবুবউল আলম হানিফের আয় বেড়েছে ১৫ বছরে ৯২৬৫ শতাংশ। একই সময়ে পাবনা-৫-এর সংসদ সদস্য গোলাম ফারুক প্রিন্সের আয় বেড়েছে ৮৯৬০ শতাংশ। বাকিদের বেড়েছে ২৯৫৫ থেকে ৫৬০০ শতাংশ পর্যন্ত। সব মিলিয়ে ৮১ জন সংসদ সদস্যের আয় ১৫ বছরে বেড়েছে শতভাগ।

সারণি-১১ : ১৫ বছরের ব্যবধানে আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ এমপি

প্রার্থী	আসন	২০০৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১১৮ ভোলা-৪	২০১৯২.৪৭%
মো. মাহবুবউল আলম হানিফ	০৭৭ কুষ্টিয়া-৩	৯২৬৫.৭৯%
গোলাম ফারুক খন্দ. প্রিন্স	০৭২ পাবনা-৫	৮৯৬০.১৫%

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

প্রার্থী	আসন	২০০৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধি
নূর-ই-আলম চৌধুরী	২১৮ মাদারীপুর-১	৫৬৯৬.৬১%
জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক	০৬০ নাটোর-৩	৫২৮৫.০২%
শাজাহান খান	২১৯ মাদারীপুর-২	৪৬৯৭.০৬%
এইচ এম ইব্রাহিম	২৬৮ নোয়াখালী-১	৪২৯৬.৮১%
মতিয়া চৌধুরী	১৪৪ শেরপুর-২	৪১৩৫.৮৫%
সাধন চন্দ্র মজুমদার	০৪৬ নওগাঁ-১	৪১৩২.৫৬%
মো. শাহাব উদ্দিন	২৩৫ মৌলভীবাজার-১	২৯৫৫.৫৬%

এই ১৫ বছরে সংসদ সদস্যদের অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির তালিকায় শীর্ষে আছেন নাটোর-৩ আসনের সংসদ জুনাইদ আহমেদ পলক। ২০০৮ সালের তুলনায় তার সম্পদ বেড়েছে ১৭,০৩৯ শতাংশ। মাদারীপুর-১-এর সংসদ সদস্য নূর-ই-আলম চৌধুরীর একই সময়ে সম্পদ বেড়েছে ১০ হাজার ১২৮ শতাংশ। তালিকায় থাকা বাকিদের সম্পদ বৃদ্ধির হার কমপক্ষে ৫ হাজার ৬০০ শতাংশ। আর কমপক্ষে শতভাগ সম্পদ বেড়েছে ৯৪ জনের।

সারণি-১২ : ১৫ বছরের ব্যবধানে অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ এমপি

প্রার্থী	আসন	২০০৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধি
জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক	০৬০ নাটোর-৩	১৭০৩৯.৫৬%
নূর-ই-আলম চৌধুরী	২১৮ মাদারীপুর-১	১০১২৮.৪৪%
দীপংকর তালুকদার	২৯৯ রাঙামাটি	৮৩৯৫.৮৫%
আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকব	১১৮ ভোলা-৪	৭৯৭৪.৭৪%
খালিদ মাহমুদ চৌধুরী	০০৭ দিনাজপুর-২	৭৯৫১.৪৯%
মো. আব্দুল হাই	০৮১ ঝিনাইদহ-১	৭৮১৬.৪৮%
মেহের আফরোজ	১৯৮ গাজীপুর-৫	৭৬৯২.৩১%
সাধন চন্দ্র মজুমদার	০৪৬ নওগাঁ-১	৬৩৫০.১৮%
আবুল হাসান মাহমুদ আলী	০০৯ দিনাজপুর-৪	৬১৩৮.৬৬%
মির্জা আজম	১৪০ জামালপুর-৩	৫৬২৩.৩৯%

আয় বৃদ্ধিতে মন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে আগের মন্ত্রিসভার পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। তার আয় বেড়েছে ৩৬০৯ শতাংশ। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির গত পাঁচ বছরের তুলনায় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ২১৩১ দশমিক ১২ শতাংশ। ২০১৮ সালের পর মন্ত্রীদের আয় বৃদ্ধির তালিকার শীর্ষ দশে অবশ্য আর কেউই হাজার শতাংশ পেরোতে পারেননি। তালিকার দশ নম্বরে আছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ২০১৮ সালের তুলনায় তার আয় বেড়েছে ১১৯ দশমিক ৪৭ শতাংশ।

সারণি-১৩ : পাঁচ বছরের ব্যবধানে আয় বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী

মন্ত্রী নাম	পদবি	মন্ত্রণালয়	২০১৮ সালের তুলনায় আয় বৃদ্ধির হার
জাহিদ ফারুক	প্রতিমন্ত্রী	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৩৬০৯.৭৪%
টিপু মুনশি	মন্ত্রী	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	২১৩১.১২%
ফরহাদ হোসেন	প্রতিমন্ত্রী	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	৩৩৯.৪৪%
শরীফ আহমেদ	প্রতিমন্ত্রী	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২৯৪.২৬%
জাহিদ মালেক	মন্ত্রী	স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৭৫.৮৪%
নসরুল হামিদ	প্রতিমন্ত্রী	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়	২২৮.০৮%
ডা. দীপু মনি	মন্ত্রী	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২০৪.০১%
নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন	মন্ত্রী	শিল্প মন্ত্রণালয়	১৬৪.১৩%
গোলাম দস্তগীর গাজী	মন্ত্রী	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১২২.১৪%
শেখ হাসিনা	প্রধানমন্ত্রী	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	১১৯.৪৭%

৫ বছরের ব্যবধানে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীদের মধ্যে সম্পদ বেশি বেড়েছে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আনিসুল হক। ২০১৮ সালের তুলনায় তার সম্পদ বেড়েছে ১ হাজার ১৪ শতাংশ। তালিকার দশম অবস্থানে থাকা পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের সম্পদ বেড়েছে ১২৫ শতাংশ।

সারণি-১৪ : পাঁচ বছরের ব্যবধানে সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষ ১০ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী

মন্ত্রী নাম	পদবি	মন্ত্রণালয়	২০১৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হার
আনিসুল হক	মন্ত্রী	আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়	১০১৪.৭৯%
জাহিদ ফারুক	প্রতিমন্ত্রী	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৯২৯.৪১%
মহিবুল হাসান চৌধুরী	উপমন্ত্রী	শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪৪.৭৪%
শরীফ আহমেদ	প্রতিমন্ত্রী	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	২৪২.৫৫%
মো. তাজুল ইসলাম	মন্ত্রী	স্থানীয় সরকার বিভাগ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২৪২.৩৮%
ফরহাদ হোসেন	প্রতিমন্ত্রী	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	১৯২.৩৯%
সাধন চন্দ্র মজুমদার	মন্ত্রী	খাদ্য মন্ত্রণালয়	১৭২.৪৫%
নসরুল হামিদ	প্রতিমন্ত্রী	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	১৪০.৯৯%

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

মন্ত্রী নাম	পদবি	মন্ত্রণালয়	২০১৮ সালের তুলনায় অস্থাবর সম্পদ বৃদ্ধির হার
ইমরান আহমদ	মন্ত্রী	প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	১৪০.০৬%
এম এ মান্নান	মন্ত্রী	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	১২৫.২৮%

হলফনামা বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ২০২৪ সালের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে ৯ দশমিক ৭০ শতাংশের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে। আর অতীতে মামলা ছিল এমন প্রার্থী প্রায় ১৮ শতাংশ। মামলার ধরন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি আঘাতের জন্য, জনগণের শান্তিভঙ্গের জন্য, জীবন বিপন্নকারী অপরাধ, ভীতিপ্রদর্শন, অপমান এবং উৎপাত, প্রতারণা ইত্যাদি কারণে মামলা রয়েছে এসব প্রার্থীর বিরুদ্ধে।

চিত্র-২৩ : বর্তমানে মামলা আছে এমন প্রার্থীর সংখ্যা

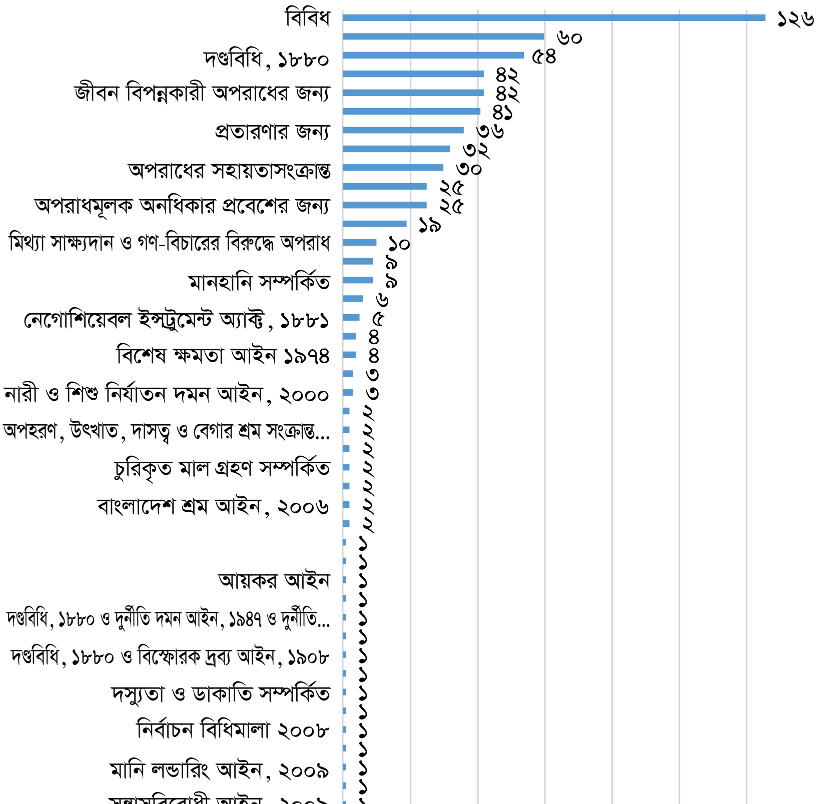

চিত্র-২৪ : অতীতে মামলা ছিল এমন প্রার্থীর সংখ্যা

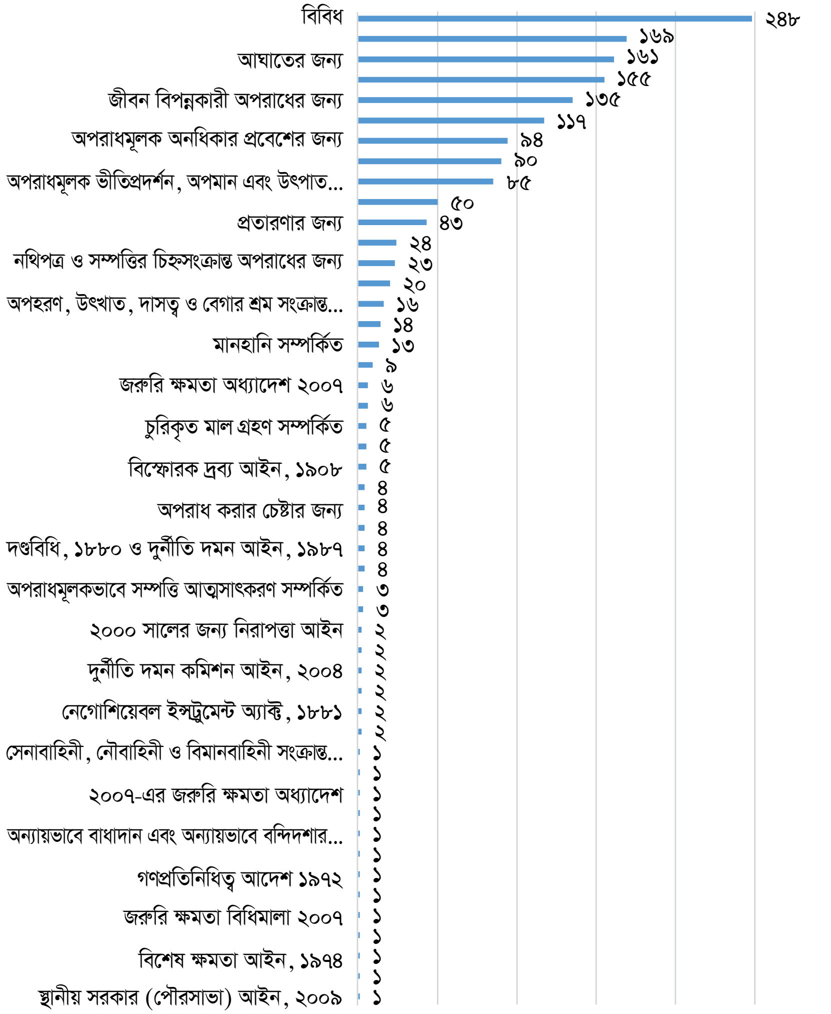

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের অন্যতম বড় একটি বৈশিষ্ট্য হলো, ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদান। ফলে সারা দেশের সব আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীারা বড় সংখ্যায় অংশগ্রহণ করেন। সংখ্যার বিচারে যা সর্বশেষ চারটি নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। স্বভাবতই এই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই ক্ষমতাসীন

রাজনৈতিক দলের মনোনয়নের বাইরে থাকা বা বিদ্রোহী প্রার্থী। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কোনো দলই পুরোপুরি ৩০০ আসনে প্রার্থী দেয়নি, তবে শতভাগ আসনেই কমপক্ষে এক বা অনেক ক্ষেত্রে একাধিক প্রার্থী ক্ষমতাসীন দলের সদস্য বা সমর্থনপুষ্ট।

শিক্ষাগত যোগ্যতার মানদণ্ডে প্রার্থীদের অর্ধেকের বেশি, ৫৮ দশমিক ৫৫ শতাংশই স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী এবং তৃতীয় সর্বোচ্চ ১২ দশমিক ৪৬ শতাংশ প্রার্থী স্বশিক্ষিত। সর্বশেষ চারটি নির্বাচনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৬ দশমিক ৫৪ শতাংশ ব্যবসায়ী প্রার্থী দ্বাদশ নির্বাচনে অংশ নেন। ১৫ বছরের ব্যবধানে ব্যবসায়ী প্রার্থীদের অংশগ্রহণের হার বেড়েছে প্রায় ৯ শতাংশ। একইভাবে বেড়েছে কোটি টাকা আয় করা প্রার্থীর সংখ্যাও। বছরে অন্তত এক কোটি টাকা আয় করেন এমন প্রার্থীর সংখ্যা ১৬৪ জন, এটিও সর্বশেষ চার নির্বাচনে সর্বোচ্চ। তবে কোটি টাকার কম আয় করে এমন প্রার্থীর হার ৬৫ দশমিক ৩০ শতাংশ।

অস্থাবর সম্পদমূল্যের ভিত্তিতে দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে প্রায় ২৭ দশমিক ৬৪ ভাগ প্রার্থী কোটিপতি। শতকোটি টাকার মালিক এমন প্রার্থী সংখ্যায় ২১, শীর্ষস্থানে থাকা প্রার্থীর প্রদর্শিত সম্পদমূল্য ১ হাজার ৩৪৫ কোটি টাকা। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেও কোটিপতি প্রার্থীদের প্রাধান্য ছিল দ্বাদশ নির্বাচনে। ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের হয়ে নবম নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের মধ্যে কোটিপতি ছিলেন ২৮ দশমিক ২৫ শতাংশ। ১৫ বছরের ব্যবধানে এই হার বেড়ে দাড়িঁয়েছে ৮৮.৭২ শতাংশে। আবার, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে প্রায় ৪৫ দশমিক ৭৪ শতাংশই কোটিপতি।

বাংলাদেশের আইন (ল্যান্ড রিফর্ম অ্যাক্ট, ২০২৩) অনুযায়ী একজন ব্যক্তির ভূমির মালিকানা অর্জনের সর্বোচ্চ সীমা কৃষিজমির ক্ষেত্রে ৬০ বিঘা এবং অকৃষি জমিসহ যা ১০০ বিঘা পর্যন্ত হলেও, অনেক প্রার্থীর নামেই বড় আকারের ভূমির মালিকানা রয়েছে। হলফনামায় প্রদর্শিত সর্বোচ্চ মালিকানা ৮১৩ একর। তবে, দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের প্রায় ২৮ শতাংশের দায়দেনা, ঋণ রয়েছে। যার সম্মিলিত পরিমাণ ১৫ হাজার ৯৭৩ কোটি টাকা।

হলফনামার তুলনামূলক হিসাব অনুযায়ী, একাদশ সংসদের সদস্যদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের আয় সর্বোচ্চ ২ হাজার শতাংশের বেশি বেড়েছে। ২০১৮ সালের তুলনায় সংসদ সদস্যদের সর্বোচ্চ আয় বৃদ্ধির হার ৭২৩৮৬ দশমিক ৭০ শতাংশ, ২০০৮ সালের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার ২০১৯২ শতাংশ। সংসদ সদস্যদের নির্ভরশীলদের আয় পাঁচ বছরে বেড়েছে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৯৯৩ শতাংশ। সংসদ সদস্যদের ক্ষেত্রে গত পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ সম্পদ বেড়েছে ৩ হাজার ৬৫ শতাংশ এবং ১৫ বছরে এই হার ১৭ হাজার ৩৯ শতাংশ। একইভাবে গত পাঁচ বছরে মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীদের আয় বেড়েছে সর্বোচ্চ ৩ হাজার ৬০৯ শতাংশ, সম্পদ বৃদ্ধির হার সর্বোচ্চ ১ হাজার ১৪ শতাংশ।

হলফনামা ও জবাবদিহি

জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদর্শিত আয়-সম্পদ এবং ঋণ-দায় বিবরণী কতটুকু সঠিক এবং আয় ও সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে অর্জিত, তা যাচাই করা হয় না। আবার সম্পদের অর্জনকালীন যে মূল্য হলফনামায় দেখানো হয়েছে, তা নিয়েও বড় রকমের প্রশ্ন রয়েছে।

হলফনামায় প্রার্থীরা নিজেদের অর্জিত সম্পদ কতটা দেখিয়েছেন? পুরোটা দেখিয়েছেন কি না? কিংবা দেশে বা বিদেশে সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠার সুযোগ তৈরি হয়েছে। কেননা, নির্ভরযোগ্য তথ্য অনুযায়ী, সরকারের মন্ত্রিসভার অন্তত একজন সদস্যের নিজ নামে বিদেশে একাধিক কোম্পানি থাকার প্রমাণ টিআইবির কাছে রয়েছে। অথচ হলফনামায় এই সম্পদ অর্জনের উল্লেখ নেই। উক্ত মন্ত্রী ও তার স্ত্রীর মালিকানাধীন ছয়টি কোম্পানি এখনো বিদেশে সক্রিয়ভাবে আবাসন ব্যবসা পরিচালনা করছে। এসব কোম্পানির মোট সম্পদমূল্য প্রায় ২ হাজার ১৪৫ কোটি টাকার বেশি।

অবশ্য, হলফনামা প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন। স্বপ্রণোদিত হয়ে ইসি কোনো পদক্ষেপ নেয় না বা অন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করে না। আয় ও সম্পদ বৃদ্ধির বিষয়ে, বিশেষ করে প্রদত্ত হিসাব পরিপূর্ণ কি না এবং অর্জিত আয় ও সম্পদ বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না, তা যাচাই করতে রাজস্ব বিভাগ বা দুর্নীতি দমন কমিশনকেও উদ্যোগ নিতে দেখা যায় না। আবার একই প্রার্থী ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচনে একই বিষয়ে আলাদা তথ্য দিলে বা তথ্যের গরমিল থাকলেও তা যাচাইয়ের বাইরে থেকে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অযোগ্যতার আইনি অনেক বিষয় সহজে চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। একই সঙ্গে পাঁচ বছর বিরতি দিয়ে হলেও তাদের জবাবদিহির একটি আইনি সুযোগকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে দুর্নীতি রোধে কার্যকর একটি ব্যবস্থা নেওয়া যেত।

সুপারিশ

চারটি নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পর্যালোচনাপূর্বক কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ করছে টিআইবি। এর মধ্যে রয়েছে–হলফনামায় প্রদর্শিত তথ্য কতটুকু সত্য, তা নিরূপণে কার্যকর ও কারিগরি যাচাইয়ের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

- হলফনামায় মিথ্যা বা অপর্যাপ্ত তথ্য প্রদান আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। ফলে স্বপ্রণোদিত হয়ে প্রার্থীদের হলফনামায় প্রদর্শিত আয়-সম্পদ এবং ঋণ-দায় বিবরণী কতটুকু সঠিক এবং আয় ও সম্পদ কতটা বৈধ উপায়ে অর্জিত, তা নির্বাচন কমিশন কর্তৃক যাচাই করতে হবে।
- একই সঙ্গে হলফনামায় প্রার্থীরা নিজেদের অর্জিত সম্পদ পুরোপুরি প্রদর্শন করেছেন কি না, কিংবা দেশে বা বিদেশে সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করেছেন কি না, তা নির্বাচন কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক যাচাই ও প্রমাণসাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। হতাশাজনক হলেও সত্য, এসব সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে নির্লিপ্ত ভূমিকা পালন করছে।
- যে আয়, ঋণ ও সম্পদ অর্জনের তথ্য হলফনামায় প্রদান করা হয়েছে, বিশেষ করে যে রূপ অবিশ্বাস্য মাত্রায় সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীদের অনেকেরই সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তা বৈধ আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না এবং তা না হলে জবাবদিহি নিশ্চিত করার কোনো উদ্যোগ না থাকাও গভীরভাবে উদ্বেগজনক। এ ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বপ্রণোদিত ভূমিকা পালনের যথেষ্ট সুযোগ ও সুপারিশ করছে টিআইবি। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলগুলো

সামনে এ আত্মজিজ্ঞাসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তা দলগুলোর কাছে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানানো হচ্ছে।

- একইভাবে নির্বাচন কমিশন যে প্রক্রিয়ায় এবং দায়সারাভাবে হলফনামার তথ্য প্রকাশ করে, তা থেকে সহজভাবে ও বিশ্লেষণযোগ্যভাবে তথ্য সংগ্রহ প্রায় অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে টিআইবি কর্তৃক হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি একটি টুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

পার্লামেন্টওয়াচ : একাদশ জাতীয় সংসদ– ১ম থেকে ২২তম অধিবেশন (জানুয়ারি ২০১৯ - এপ্রিল ২০২৩)*

রাবেয়া আক্তার কনিকা ও মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার

গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

সংসদীয় সরকারব্যবস্থায় দেশের সর্বোচ্চ আইনসভা হিসেবে জাতীয় সংসদ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের কেন্দ্রবিন্দু। জাতীয় সংসদ গণতন্ত্র, সুশাসন ও জাতীয় শুদ্ধাচারব্যবস্থার মৌলিক স্তম্ভগুলোর অন্যতম। জনপ্রত্যাশার প্রতিফলন, জনকল্যাণমুখী আইন প্রণয়ন ও জনগণের প্রতি সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে জাতীয় সংসদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।[১, ২] 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০'-এর লক্ষ্য ১৬.৬ ও ১৬.৭-এ যথাক্রমে সব স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং সংবেদনশীল (তৎপর), অন্তর্ভুক্তিমূলক, অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিনিধিত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] অন্যদিকে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২'- এ সংসদে আইন প্রণয়ন ও সরকারের কার্যক্রম তদারকির মাধ্যমে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুসংহতকরণের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] এ ছাড়া বাংলাদেশ ইন্টার-পার্লামেন্টারি ইউনিয়ন এবং কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য হিসেবে জাতীয় উন্নয়নে সংসদ সদস্যদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিক চর্চা অনুযায়ী বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ দেশের শাসনব্যবস্থায় সন্নিবেশ করার ক্ষেত্রে অঙ্গীকারবদ্ধ।

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারে সংসদকে কার্যকর করার অঙ্গীকার করা হয়েছে। ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এ নির্বাচনটি অংশগ্রহণমূলক হলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়নি।[৫] ২০১৯ সালের ৩০ জানুয়ারি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিয়ে একাদশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মোট ২৪টি অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছে।[৬] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বাংলাদেশে অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন থেকে সংসদ কার্যক্রম নিয়মিতভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছে এবং অধিপরামর্শ কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। টিআইবির ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে, একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম থেকে ২২তম অধিবেশনের কার্যক্রম ও কার্যকারিতা পর্যালোচনা করার উদ্দেশ্যে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

---

*২০২৩ সালের ০১ অক্টোবর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে একাদশ জাতীয় সংসদের (১ম থেকে ২২তম অধিবেশনের) কার্যক্রম পর্যালোচনা ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে–

- সংসদ অধিবেশনের বিভিন্ন পর্ব এবং সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব, সরকারের জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা ও আইন প্রণয়নে সংসদ সদস্যদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণ করা; এবং
- সংসদের ব্যবস্থাপনায় স্পিকার ও সদস্যদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের (জানুয়ারি ২০১৯ - এপ্রিল ২০২৩) সংসদীয় ও স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণার পদ্ধতি ও অন্তর্ভুক্ত বিষয়

এই গবেষণায় গুণবাচক ও পরিমাণবাচক উভয় ধরনের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সরাসরি সম্প্রচারিত সংসদ কার্যক্রমের রেকর্ড এবং মুখ্য তথ্যদাতার (সংসদ সদস্য, সরকারি কর্মকর্তা এবং গবেষক) সাক্ষাৎকার গ্রহণ ইত্যাদি। এ ছাড়া অন্যান্য তথ্যের মধ্যে রয়েছে সংসদ কর্তৃক প্রকাশিত অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী ও কমিটি প্রতিবেদন, সরকারি গেজেট, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই ও প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্র। জানুয়ারি ২০১৯-এপ্রিল ২০২৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১ম থেকে ২২তম সংসদ অধিবেশনের প্রায় ৭৪৪ ঘণ্টার রেকর্ডিং হতে অনুলিপি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং অনুলিপি ও নথিপত্র থেকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশক ও বিষয়বস্তুভিত্তিক ডেটাবেইজ প্রস্তুত করা হয়েছে।**

সারণি-১ : গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয়

মূল বিষয়	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
সংসদ ও সংসদ সদস্যদের পরিচিতি	সংসদের আসনবিন্যাস; সদস্যদের পেশা, বয়স, লিঙ্গ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, অন্যান্য তথ্য এবং কার্যক্রম
রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং ধন্যবাদ প্রস্তাব	রাষ্ট্রপতির বক্তব্য এবং সদস্যদের বক্তব্যে প্রাধান্যপ্রাপ্ত বিষয়
আইন প্রণয়ন কার্যক্রম ও বাজেট	বিল পাসের হার ও ব্যয়িত সময়; আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে সদস্যদের অংশগ্রহণ এবং বাজেটবিষয়ক আলোচনা

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

**একাদশ জাতীয় সংসদের ৬ষ্ঠ হতে ২২তম অধিবেশনের কার্যক্রম বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নির্দেশক সংযোজন করা হয়েছে। যার কারণে নির্দিষ্ট কয়েকটি কার্যক্রমের (১৪৭ বিধিতে সাধারণ আলোচনা, বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব আলোচনা) বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণে ব্যয়িত সময়ের হার নির্ণয়ে ১ম হতে ৫ম অধিবেশন অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ ছাড়া অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে ১ম হতে ২২তম অধিবেশনের সকল কার্যক্রম বিবেচনা করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

মূল বিষয়	অন্তর্ভুক্ত বিষয়
জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি সম্পর্কিত কার্যক্রম	প্রশ্নোত্তর পর্ব; কার্যপ্রণালির বিভিন্ন বিধি (৬২, ৭১, ১৪৭, ১৬৪, ২৭৪ ও ৩০০); পয়েন্ট অব অর্ডার; বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবে সদস্যদের অংশগ্রহণ; আলোচ্য বিষয়বস্তু ও ব্যয়িত সময় এবং সংসদের স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম
সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা	কার্যপ্রণালি বিধি অনুযায়ী বক্তব্য ও মতামত উপস্থাপনে সদস্যদের দক্ষতা ও প্রস্তুতি; সদস্যদের আচরণ; উপস্থিতি; সংসদ বর্জন; ওয়াকআউট; কোরামসংকটের ব্যয়িত সময় ও এর প্রাক্কলিত অর্থমূল্য এবং সংসদ কার্যক্রম ব্যবস্থাপনায় স্পিকারের ভূমিকা
সংসদীয় কার্যক্রমের উন্মুক্ততা	সংসদীয় কার্যক্রমের গণপ্রচারণা এবং তথ্যের উন্মুক্ততা
অন্যান্য বিষয়	**অন্তর্ভুক্ত বিষয়**
নারীর অংশগ্রহণ ও উন্নয়ন	সংসদীয় কার্যক্রমে নারী সদস্যদের উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ এবং নারী উন্নয়ন ও অধিকার-সম্পর্কিত আলোচনা
টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট	সংসদে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন-সম্পর্কিত আলোচনা

গবেষণার ফলাফল

আসনবিন্যাস ও সদস্যদের মৌলিক তথ্য

আসনবিন্যাস (৩৫০টি)

সরকারি দল (আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন মহাজোট) ৩১২টি (৮৯ দশমিক ২ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দল (জাতীয় পার্টি) ২৬টি (৭ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দল (বিএনপি, গণফোরাম ও স্বতন্ত্র) ১২টি (৩ দশমিক ৫ শতাংশ) আসন লাভ করে।

লিঙ্গভিত্তিক হার

নির্বাচিত ৩০০টি আসনে পুরুষ ৯২ দশমিক ৩ শতাংশ এবং নারী ৭ দশমিক ৭ শতাংশ আসন লাভ করেন। সংরক্ষিত আসনসহ, অর্থাৎ ৩৫০টি আসনের মধ্যে পুরুষ ৭৯ দশমিক ১ শতাংশ এবং নারী ২০ দশমিক ৯ শতাংশ আসন লাভ করেন।

বয়স

একাদশ জাতীয় সংসদে সদস্যদের গড় বয়স ৬৩ বছর। বাংলাদেশে ২৬-৬০ বছর বয়সী সদস্যের (৩৮ দশমিক ২ শতাংশ) তুলনায় ৬০-উর্ধ্ব বয়সী (৬১ দশমিক ৮ শতাংশ) সদস্যদের হার বেশি। অন্যদিকে ১৭তম ভারতীয় লোকসভায় ২৬-৬০ বছর বয়সী সদস্যের (৫৫ দশমিক ৫ শতাংশ) তুলনায় ৬০-উর্ধ্ব বয়সী (৪৪ দশমিক ৫ শতাংশ) সদস্যদের হার কম। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের হাউস অব কমন্সেও ২৬-৬০ বছর বয়সী সদস্যের (৭২ দশমিক ৮ শতাংশ) তুলনায় ৬০-উর্ধ্ব বয়সী (২৭ দশমিক ২ শতাংশ) সদস্যসের হার কম।

পেশা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা

একাদশ জাতীয় সংসদের সর্বোচ্চসংখ্যক সদস্য (৬২ দশমিক ৩ শতাংশ) পেশায় ব্যবসায়ী।[***] শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চসংখ্যক সদস্যদের (৪১ দশমিক ১ শতাংশ) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর। ১২ জন সদস্য স্বশিক্ষিত এবং একজন সদস্য স্বাক্ষরজ্ঞান-সম্পন্ন।

অন্যান্য তথ্য

এই সংসদে সর্বোচ্চসংখ্যক সদস্য প্রথম মেয়াদে নির্বাচিত (৩৫ দশমিক ৪ শতাংশ) এবং ১০ শতাংশ সদস্য পঞ্চম বা ততোধিক মেয়াদে নির্বাচিত। নির্বাচিত সদস্যদের ২১ জনের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা ছিল।

কার্যদিবস ও কার্যসময়ের ব্যবহার

মোট ২৩২ কার্যদিবসে ৮২৩ ঘণ্টা ৬ মিনিট সময় ব্যয় হয়েছে। কার্যদিবস প্রতি গড় ব্যয়িত সময় ৩ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। দুই অধিবেশনের মধ্যবর্তী বিরতিকাল ছিল গড়ে ৫৫ দিন। এ ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন বিরতিকাল ছিল ৪১ দিন এবং সর্বোচ্চ বিরতিকাল ছিল ৫৯ দিন। বিভিন্ন কার্যক্রমে ৭৪৪ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সময় ব্যয় হয়েছে, যার মধ্যে জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম মোট সময়ের ২৬ দশমিক ৬ শতাংশ (১৯০ ঘণ্টা, ২৬ মিনিট), রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনায় মোট সময়ের ২৫ দশমিক ৭ শতাংশ (১৯১ ঘণ্টা ২৩ মিনিট) ব্যয় হয়েছে। বাজেট আলোচনায় ১৪২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট (১৯ দশমিক ২ শতাংশ), আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে ১২৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিট (১৬ দশমিক ৭ শতাংশ) এবং কিছু বিশেষ কার্যক্রমে ৯ ঘণ্টা ১৭ মিনিট (১ দশমিক ২ শতাংশ) সময় ব্যয় হয়েছে। এ ছাড়া স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন, কমিটি গঠন, শোক প্রস্তাবসহ অন্যান্য সংসদীয় কার্যক্রমে ৮৬ ঘণ্টা ১৮ মিনিট (১১ দশমিক ৬ শতাংশ) সময় ব্যয় হয়েছে।

চিত্র-১ : একাদশ জাতীয় সংসদের কার্যক্রমভিত্তিক ব্যয়িত সময়ের হার (%)

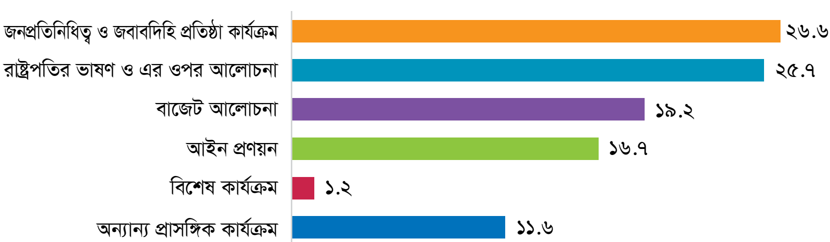

রাষ্ট্রপতির ভাষণ ও ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব

রাষ্ট্রপতির ভাষণ

বছরের প্রারম্ভিক ৫টি অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ পাঠে ব্যয় হয় ৪ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ। রাষ্ট্রপতির ভাষণ বিশ্লেষণ করে দেখা

[***]একাধিক পেশা বিবেচনা করে।

যায়, রাষ্ট্রপতির ভাষণে সরকারের অর্জনবিষয়ক আলোচনাই মূলত প্রাধান্য পেয়েছে। প্রায় চার-পঞ্চমাংশ সময়ই ব্যয়িত হয়েছে এ বিষয়ক আলোচনায়। অন্যদিকে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনাবিষয়ক আলোচনা আলাদাভাবে কোনো গুরুত্ব পায়নি।

চিত্র-২ : রাষ্ট্রপতির ভাষণে বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (%)

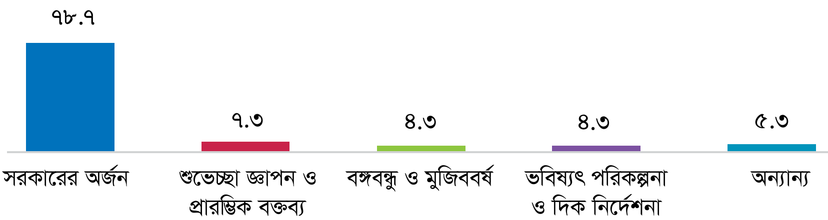

ভাষণের ওপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব

রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব আলোচনায় ব্যয় হয় ১৮৬ ঘণ্টা ২৬ মিনিট, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২৫ দশমিক শূন্য শতাংশ। এর মধ্যে সরকারি দলের সদস্যদের ব্যয়িত সময় মোট ১৫৬ ঘণ্টা ২৮ মিনিট (৮৬ দশমিক ২ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দলের ব্যয়িত সময় ২০ ঘণ্টা ১৮ মিনিট (১১ দশমিক ২ শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ব্যয়িত সময় ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট (২ দশমিক ৬ শতাংশ)। সরকারদলীয় সদস্যদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় ব্যয় হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা এবং সরকারের বিভিন্ন অর্জনের প্রশংসায়। এ বিষয়ক আলোচনায় ব্যয়িত সময় যথাক্রমে ১৯ দশমিক ৮ ও ১৯ দশমিক ৪ শতাংশ।

চিত্র-৩ : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে সরকারি দলের বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (%)

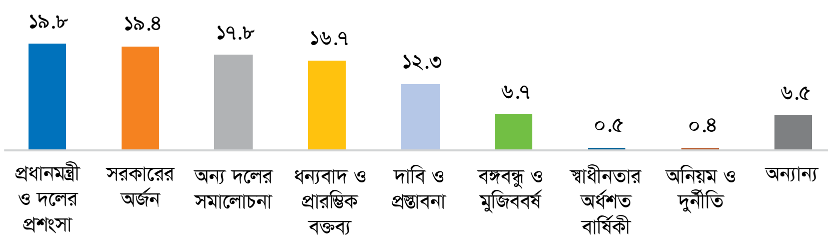

প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ (৪৪ দশমিক ৭ শতাংশ) সময় ব্যয় হয়েছে দেশের চলমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং সরকারের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাবনা প্রদানে। এ ছাড়া বর্তমান সরকারের বিভিন্ন অর্জন এবং প্রধানমন্ত্রীর গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসায় ব্যয় হয় ১১ দশমিক ৯ শতাংশ সময় এবং সরকার ও অন্য দলের সমালোচনায় ব্যয় হয় ১১ দশমিক ৬ শতাংশ সময়।

চিত্র-৪ : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে প্রধান বিরোধী দলের বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (%)

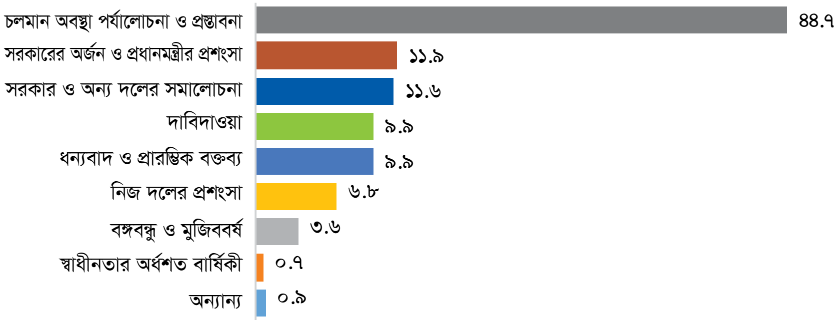

অন্যদিকে অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা মোট ব্যয়িত সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ সময় ব্যয় করেছেন সরকারের সমালোচনায় (৫৮ দশমিক ৬ শতাংশ)। এ ছাড়া বিভিন্ন দাবিদাওয়া ও প্রস্তাবনায় ব্যয় হয়েছে ২৫ দশমিক ৩ শতাংশ সময়।

চিত্র-৫ : রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবে অন্যান্য বিরোধী দলের বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় ব্যয়িত সময় (%)

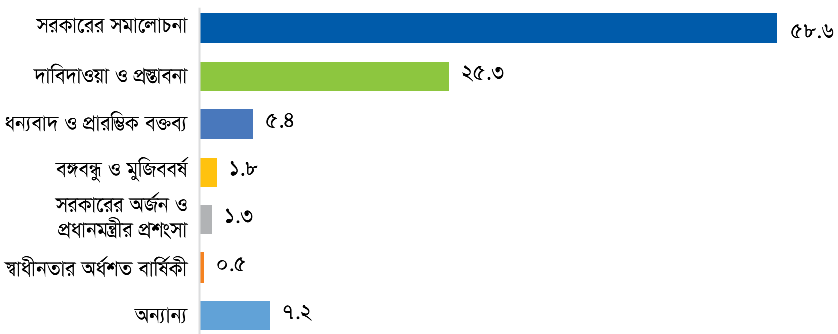

আইন প্রণয়ন কার্যক্রম (বাজেট এবং বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন)

আইন প্রণয়ন (বাজেট ব্যতীত অন্যান্য আইন)

আইন প্রণয়ন কার্যক্রমে মোট ১২৪ ঘণ্টা ১৮ মিনিট সময় ব্যয় হয়, যা সংসদ কার্যক্রমের ব্যয়িত সময়ের ১৬ দশমিক ৭ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১৯-২০ অর্থবছরে যুক্তরাজ্যে এই হার ছিল প্রায় ৪৯ দশমিক ৩ শতাংশ এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ভারতের ১৭তম লোকসভায় এই হার ছিল ৪৫ দশমিক শূন্য শতাংশ। বাজেট-সম্পর্কিত ১২টি বিল ব্যতীত মোট উত্থাপিত বিলের সংখ্যা ১০৮টি (সরকারি বিল ১০৭টি এবং বেসরকারি ১টি) এবং পাসকৃত বিলের সংখ্যা ৯৬টি (নতুন বিল ৬৮টি,

সংশোধনী বিল ২৬টি এবং রহিতকরণ বিল ২টি)। সংসদে একটি বিল পাস করতে গড়ে সময় লেগেছে প্রায় ৭০ মিনিট; যেখানে সর্বনিম্ন সময় ছিল প্রায় ২৮ মিনিট এবং সর্বোচ্চ সময় ছিল প্রায় ৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। সর্বনিম্ন সময়ে পাসকৃত বিলটি হলো 'ভোটার তালিকা (সংশোধন) বিল, ২০২০' এবং সর্বোচ্চ সময়ে পাসকৃত বিলটি হলো 'প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ বিল, ২০২২'।

আইন প্রণয়নের আলোচনায় সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ঘাটতি লক্ষণীয় ছিল। বিলের ওপর নোটিশ দিয়ে মাত্র ২৪ জন (৬ দশমিক ৯ শতাংশ) সদস্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। মোট নোটিশের ৯৫ শতাংশ উপস্থাপিত হয় প্রধান ও অন্যান্য বিরোধী দলের ১১ জন সদস্যের পক্ষ থেকে। সরকারি দলের মোট ৬ জন সদস্য ২টি বিলের ওপর সংশোধনী প্রস্তাব এনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বিল প্রতি গড়ে প্রায় ৮ জন সদস্য জনমত যাচাই-বাছাই এবং ৬ জন সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। বিলের ওপর আনীত এসব আপত্তি ও জনমত যাচাই-বাছাই প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়।

পাসকৃত বিলের মধ্যে ৫২ শতাংশ বিলের ক্ষেত্রে কোনো সংশোধনী গৃহীত হয়নি এবং ৪৭ শতাংশ বিলের ক্ষেত্রে আংশিকভাবে সংশোধনী গৃহীত হয়েছে এবং ১টি বিলের ক্ষেত্রে সব নোটিশদাতা প্রস্তাবিত সংশোধনী প্রত্যাহার করে বিল পাস না করার আহ্বান জানান। প্রস্তাবিত সংশোধনীতে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাব থাকলেও সংশোধনী গ্রহণের ক্ষেত্রে শব্দ সন্নিবেশ ও প্রতিস্থাপনই প্রাধান্য পেয়েছে। গৃহীত সংশোধনী বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এর মধ্যে প্রায় ৬৭ শতাংশ ছিল শব্দ সংযোজন, বর্জন বা সন্নিবেশ এবং ৩৩ শতাংশ ছিল বিভিন্ন দফা/উপ-দফা/প্যারা সন্নিবেশ বা প্রতিস্থাপন।

চিত্র-৬ : গৃহীত সংশোধনীর ধরন

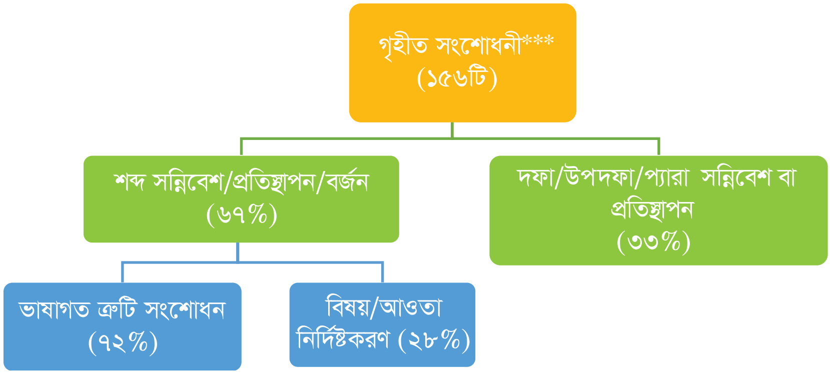

***একটি বিলের ওপর প্রদত্ত একই ধরনের সংশোধনী ১টি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা উত্থাপিত আপত্তি বা প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর না দিয়ে বিরোধী দলের অতীত ইতিহাস, বিলের প্রয়োজনীয়তা, যথেষ্ট যাচাই-বাছাইপূর্বক বিলের প্রস্তাব উত্থাপিত ইত্যাদি কারণ

দেখিয়ে বিলের ওপর প্রদত্ত নোটিশগুলো খারিজ করে দেন। নোটিশ খারিজ করার ক্ষেত্রে যুক্তিসংগত ও পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন না করায় নোটিশ প্রদানকারীদের একাংশ অসন্তোষ প্রকাশও করেন। এ ছাড়া সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে বিলের ওপর উত্থাপিত অধিকাংশ নোটিশ খারিজ হয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো সংশোধনী ছাড়াই বিল পাস হতে দেখা যায়।

বাজেট

বাজেট কার্যক্রমে ব্যয়িত সময় ১৪২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ১৯ দশমিক ২ শতাংশ এবং নির্ধারিত বাজেট অধিবেশনের ব্যয়িত সময়ের ৬০ দশমিক শূন্য শতাংশ। বাজেট কার্যক্রমে ব্যয়িত সময়ের ৮০ দশমিক ১ শতাংশ সময় ব্যয় হয় বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায়, ১৫ দশমিক ৮ শতাংশ সময় ব্যয় হয় মঞ্জুরি দাবির ওপর আলোচনায় এবং ৪ দশমিক ১ শতাংশ সময় ব্যয় হয় বাজেট উপস্থাপনে। বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময়ের ৩৫ দশমিক ৭ শতাংশ সময় ব্যয় হয় বাজেটসংক্রান্ত আলোচনায় এবং বাকি সময় ব্যয় হয় অন্যান্য আলোচনা, দলের প্রশংসা এবং অন্য দলের সমালোচনায়।

চিত্র-৭ : বাজেট আলোচনায় ব্যয়িত সময় (%)

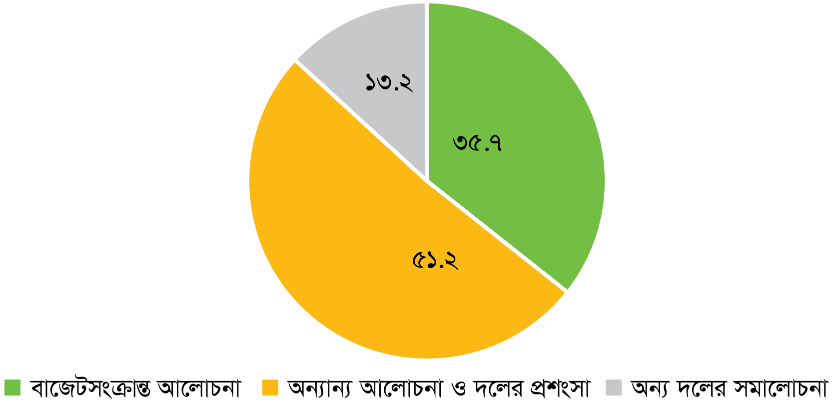

'অর্থবিল ২০১৯' পাস হতে সময় লাগে ৪ ঘণ্টা ৬ মিনিট এবং বাকি ৩টি অর্থবিল পাস হতে গড়ে ১ ঘণ্টা ২১ মিনিট সময় ব্যয় হয়। নির্দিষ্টকরণ বিলগুলো পাস হতে গড়ে ৫ মিনিট সময় ব্যয় হয়।

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম থেকে ২২তম অধিবেশনে বাজেট আলোচনায় মোট ২৮৮ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। যাদের মধ্যে সরকারি দলের সদস্য ছিলেন ২৫৩ জন (৮৭ দশমিক ৯ শতাংশ), প্রধান বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন ২৪ জন (৮ দশমিক ৩ শতাংশ) এবং অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্য ছিলেন ১১ জন (৩ দশমিক ৮ শতাংশ)। সরকারি ও বিরোধী উভয় দলের সদস্যদের বক্তব্যে বাজেট-সম্পর্কিত আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে ছিল পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনা, ব্যাংকিং খাতের দুরবস্থা ও ঋণখেলাপি, সর্বজনীন পেনশন, মুদ্রাস্ফীতি, মুদ্রানীতি পরিবর্তন, ঘাটতি বাজেটের অর্থসংস্থান, আমদানিনির্ভরতা কমানো, প্রগতিশীল কর নীতি বাস্তবায়ন, করমুক্ত

আয়সীমা বৃদ্ধি ও কর প্রদানব্যবস্থা সহজীকরণ ইত্যাদি। বাজেট অধিবেশনে যে বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, সেগুলোর মধ্যে পাচারকৃত অর্থ দেশে ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব ও বাজেটের আকার ছিল অন্যতম।

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা কার্যক্রম

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ১৩ ঘণ্টা ২ মিনিট ব্যয় হয়েছে, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ১ দশমিক ৮ শতাংশ। ১০ম থেকে ১৬তম টানা ৭টি অধিবেশনসহ মোট ১১টি অধিবেশনে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্বে মোট ৩৩টি মূল ও ৮৩টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। মূল প্রশ্ন (গড়ে ১ মিনিটের কম) থেকে সম্পূরক প্রশ্ন (গড়ে প্রায় ২ মিনিট) উত্থাপনে গড়ে দ্বিগুণেরও বেশি সময় ব্যয় হয়। ৪৮ দশমিক ৭ শতাংশ প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য আলোচনা (প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, দলের প্রশংসা, অন্য দলের সমালোচনা ইত্যাদি) করেন, যা প্রশ্ন উত্থাপনে মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৮০ শতাংশ। অন্যদিকে উত্তর প্রদানের প্রায় ৩৯ দশমিক ১ শতাংশ সময় ব্যয় হয় উত্তরবহির্ভূত আলোচনায়।

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব

মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ৪৪ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট ব্যয় হয়, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৬ শতাংশ। ৭ম থেকে ১৭তম টানা ১১টি অধিবেশনসহ ১৩টি অধিবেশন সরাসরি এ পর্বে অনুষ্ঠিত হয়নি। সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে মোট ১৩৯ জন সংসদ সদস্য ৩১টি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীদের কাছে মোট ২০০টি মূল প্রশ্ন এবং ৫৬৪টি সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন করেন। মূল প্রশ্ন (গড়ে ১৪-১৫ সেকেন্ড) হতে সম্পূরক প্রশ্ন (গড়ে ১ মিনিটের বেশি) উত্থাপনে গড়ে চার গুণের বেশি সময় ব্যয় হয়। ৫৬ দশমিক ৭ শতাংশ প্রশ্নকর্তা প্রশ্নের বাইরে অন্যান্য (প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা, দলের প্রশংসা, অন্য দলের সমালোচনা ইত্যাদি) আলোচনা করেন, যা প্রশ্ন উত্থাপনে মোট ব্যয়িত সময়ের প্রায় ৬৫ শতাংশ। অন্যদিকে উত্তর প্রদানের প্রায় ৩৯ দশমিক ৮ শতাংশ ব্যয় হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়বহির্ভূত আলোচনায়।

অনির্ধারিত আলোচনা

একাদশ জাতীয় সংসদের ১ম থেকে ২২তম অধিবেশনের মধ্যে শুধু ৭ম অধিবেশন ব্যতীত বাকি ২১টি অধিবেশনেই অনির্ধারিত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অনির্ধারিত আলোচনায় মোট ব্যয় হয় ২২ ঘণ্টা ১১ মিনিট, যা সংসদের মোট কার্যক্রম পরিচালনার ৩ দশমিক শূন্য শতাংশ সময়। মোট ৫২ জন (১৪ দশমিক ৮ শতাংশ) সংসদ সদস্য অনির্ধারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে ৪৩ দশমিক ৫ শতাংশ ছিল সাম্প্রতিক ঘটনা, জবাবদিহি ও জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ সম্পর্কিত, ১২ দশমিক ৪ শতাংশ ছিল অনিয়ম ও দুর্নীতিবিষয়ক, ১২ দশমিক শূন্য শতাংশ ছিল মানবাধিকার ও আইনশৃঙ্খলার অবনতিবিষয়ক এবং বাকি আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল সংসদীয় কার্যক্রম ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়।

চিত্র-৮ : অনির্ধারিত আলোচনার বিষয়বস্তুর ধরন (%)

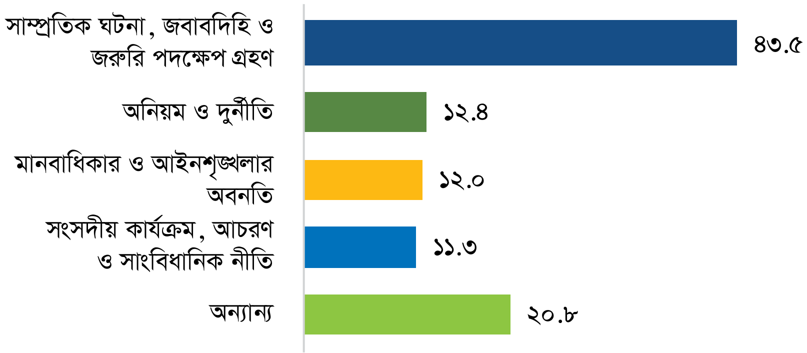

এই পর্বে বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য ও আলোচনার সময় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। সরাসরি অন্য দল এবং দলের কোনো সদস্যের নাম উল্লেখ করে সমালোচনা করা হয়। অনির্ধারিত আলোচনা পর্বে বিতর্ক ও সমালোচনামূলক বক্তব্যের জের ধরে অন্যান্য বিরোধী দলের একটি দল (বিএনপি) কর্তৃক দুইবার ওয়াকআউট করা হয়।

সাধারণ আলোচনা (বিধি ১৪৬ ও ১৪৭ অনুযায়ী)

একাদশ জাতীয় সংসদের ২২টি অধিবেশনের মধ্যে ৯টি অধিবেশনের মোট ১৯টি কার্যদিবসে প্রায় ৬৯ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, যা সংসদের মোট কার্যক্রমের ৯ দশমিক ৩ শতাংশ সময়। সাধারণ আলোচনা প্রস্তাবগুলো মোট ৮ জন সংসদ সদস্য কর্তৃক ১১টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যেগুলোর একটি ছাড়া বাকি সবই সরকারি দলের পক্ষ থেকে উত্থাপিত ছিল। আলোচ্য বিষয়গুলোর মধ্যে এককভাবে বঙ্গবন্ধুসংশ্লিষ্ট আলোচনাতেই সাধারণ আলোচনা পর্বের প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি সময় ব্যয় হয়েছে, যা শতাংশের হিসাবে ৪৫ দশমিক ১ শতাংশ। স্বাধীনতা ও সংসদের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে আলোচনায় ব্যয় হয়েছে মোট ৩১ দশমিক ৭ শতাংশ সময় এবং বাকি সময় ব্যয় হয়েছে সন্ত্রাসী হামলা, কোভিড-১৯, বৈশ্বিক অস্থিরতাসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ে। তবে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করতে গিয়ে সদস্যরা আত্মপ্রশংসা ও অন্য দলের সমালোচনায় ব্যয় করেন প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময়।

চিত্র-৯ : সাধারণ আলোচনায় বিষয়ভিত্তিক ব্যয়িত সময়ের হার (%)

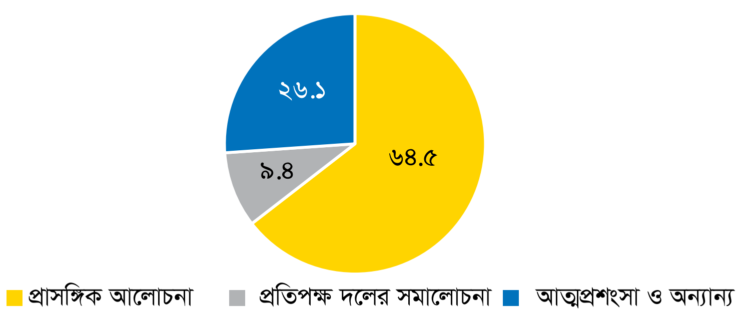

জনগুরুত্ব-সম্পন্ন বিষয়ে গৃহীত ও অগৃহীত নোটিশের ওপর আলোচনা (বিধি-৭১)

এই পর্বে মোট ব্যয়িত সময় ২১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ২ দশমিক ৯ শতাংশ। নির্ধারিত কার্যসূচির ৭৯ দশমিক ৯ শতাংশ কার্যদিবসে এই কার্যক্রম স্থগিত হয়েছে। ৭ম ও ৯ম থেকে ২১তম অধিবেশনে, অর্থাৎ মোট ১৪টি অধিবেশনে এ পর্ব সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্বে প্রাপ্ত নোটিশ সংখ্যা ১,৮৮০টি, যার মধ্যে গৃহীত নোটিশ সংখ্যা ৫০টি। গৃহীত নোটিশের মধ্যে ৪২টি (৮৪ শতাংশ) উত্থাপিত এবং ৮টি (১৬ শতাংশ) স্থগিত হয়। সর্বোচ্চসংখ্যক নোটিশ আলোচিত ও গৃহীত হয়েছে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে (৭০টি আলোচিত, ৬টি গৃহীত এবং ২টি স্থগিত)। অন্যদিকে, অগৃহীত নোটিশ সংখ্যা ১,৮৩০টি, যার মধ্যে ৪২৫টি (২৩ শতাংশ) নোটিশের ওপর ২ মিনিট করে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

সিদ্ধান্ত প্রস্তাব

এ পর্বে মোট ব্যয়িত সময় ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ১ দশমিক ৫ শতাংশ। ৭ম থেকে ২২তম মোট ১৫টি অধিবেশনে এ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। এ পর্বে মোট ৫৫টি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় যার মধ্যে গৃহীত হয় দুটি প্রস্তাব। ওই দুটি প্রস্তাবই ছিল সরকারি দল কর্তৃক উত্থাপিত (নৌযানের ব্যবস্থা এবং কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন)। এ পর্বে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক প্রস্তাব প্রদান করা হয় অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ে (৪৭ দশমিক ১ শতাংশ)।

চিত্র-১০ : উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলোর বিষয়বস্তু (%)

মুলতবি প্রস্তাব

মোট ১৭টি অধিবেশনে এ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়নি। বাকি অধিবেশনগুলোতে ৫ জন সদস্য মুলতবি প্রস্তাবের জন্য ২২টি নোটিশ প্রদান করে। মুলতবি প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ১৪টিই অন্যান্য বিরোধী দলের একজন নারী সদস্য কর্তৃক প্রদত্ত হয়। এ পর্বে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতিরোধ প্রসঙ্গে সর্বোচ্চ (৪০ দশমিক ৯ শতাংশ) সংখ্যক প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে। অন্য পর্বে আলোচনার সুযোগ থাকা, ইতিমধ্যে অন্য পর্বে আলোচিত হওয়া বা ওই ধারায় উত্থাপনের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি কারণ দর্শিয়ে মুলতবি প্রস্তাবের জন্য সব নোটিশ স্পিকার কর্তৃক বাতিল করা হয়।

চিত্র-১১ : মুলতবি প্রস্তাবের বিষয়বস্তু (%)

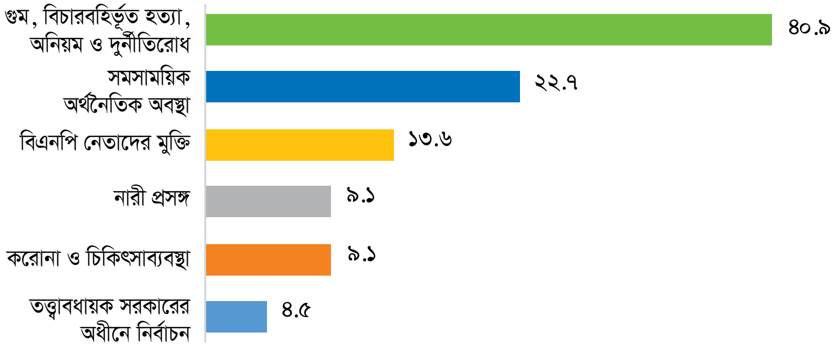

ব্যক্তিগত কৈফিয়ত প্রদান (২৭৪ বিধি) ও জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীদের বিবৃতি (৩০০ বিধি)

২৭৪ বিধিতে মোট দুটি বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। কার্যপ্রণালি বিধিতে বিতর্কিত আলোচনা উপস্থাপন না করার শর্ত থাকা সত্ত্বেও একজন মন্ত্রীর বক্তব্যে বিরোধী দলের সমালোচনা উত্থাপিত হয়েছে। ৩০০ বিধিতে মোট ১৪টি বিবৃতি উপস্থাপিত যার মধ্যে সংসদ সদস্যদের দাবির বিপরীতে দুটি বিবৃতি অন্তর্ভুক্ত ছিল। সদস্যদের আরও ৯টি দাবির বিপরীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। যেসব দাবির বিপরীতে ৩০০ বিধিতে বিবৃতি দেওয়া হয়নি, তার মধ্যে সৌদি আরবের সাথে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সমঝোতা চুক্তি, রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্রের আবাসন প্রকল্পের বালিশ কেনার বাজেট, বিমানবন্দরে করোনাভাইরাস পরীক্ষায় গাফিলতি, বিচারক নিয়োগ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

স্থায়ী কমিটির কার্যক্রম

৫০টি কমিটির মধ্যে বিরোধী দল থেকে সভাপতি রয়েছেন ৪টি কমিটিতে। ১৭টি কমিটিতে বিরোধীদলীয় কোনো সদস্য নেই। দশম সংসদের কয়েকজন মন্ত্রীকে একাদশ সংসদে একই মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিতে সদস্য ও সভাপতি হিসেবে রাখা হয়েছে। বিধি অনুযায়ী প্রতিটি (৫০টি) কমিটির প্রতি মাসে ন্যূনতম একটি করে সভা করার নিয়ম থাকলেও কোনো কমিটিই প্রতি মাসে ন্যূনতম একটি করে সভা করার নিয়ম পালন করেনি। ২২টি অধিবেশনে ন্যূনতম নির্ধারিত সভার ৬৬ দশমিক ১ শতাংশ অনুষ্ঠিত হয়নি। করোনাকালে* উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায়ও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর নিয়মিত সভার ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। সংশ্লিষ্টতা থাকা সত্ত্বেও করোনাকালে কোনো সভা করেনি অর্থ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি। করোনাকালে প্রথম ১৮ মাসের ১৩ মাসে কোনো সভা করেনি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি।

* করোনাকাল বলতে করোনা বিস্তারের ৩টি ধাপের ১৮ মাসকে বোঝানো হয়েছে (মার্চ ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২১)।

সারণি-২ : করোনাকালে সংশ্লিষ্ট কিছু স্থায়ী কমিটির মাসিক সভার বিন্যাস

মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি	২০২০										২০২১								ন্যূনতম একটি সভা হওয়া মাস	
	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.	জানু.	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সংখ্যা	শতকরা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	✓									✓	✓					✓		✓	৫	২৭.৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	১০	৫৫.৬
সমাজ কল্যাণ	✓										✓	✓				✓			৪	২২.২
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান		✓					✓	✓			✓		✓						৫	২৭.৮
অর্থ																			০	০.০
খাদ্য	✓						✓			✓									৩	১৬.৭
বাণিজ্য								✓											১	৫.৬
স্বরাষ্ট্র							✓		✓	✓	✓		✓					✓	৬	৩৩.৩

সভাপ্রতি গড়ে উপস্থিত ছিলেন ৬০ শতাংশ সদস্য। ৫০টি কমিটির মধ্যে ৩১টি কমিটির ৪৮টি প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনের প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ১৯টি কমিটির ২৬টি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত সুপারিশ বাস্তবায়নের হার ৫১ শতাংশ; অজ্ঞাত বা বাস্তবায়ন না হওয়ার হার ৪ শতাংশ এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নাধীন ও চলমান। পিটিশন কমিটির মাধ্যমে জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জনগণের সরাসরি অভিযোগ করার সুযোগ থাকলেও প্রচারণার ঘাটতির কারণে তা কার্যকর হচ্ছে না। সুপারিশ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করা এবং সার্বিকভাবে সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে নির্বাহী বিভাগকে জবাবদিহি করা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর ছিল না।

জনপ্রতিনিধিত্ব ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা

সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিপরীতে প্রধান বিরোধী দলের অবস্থান ছিল প্রান্তিক এবং সরকারকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা ছিল সার্বিকভাবে গৌণ। প্রধান বিরোধী দলের কয়েকজন সদস্য কর্তৃক সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের পর্যালোচনা লক্ষণীয় হলেও বাকি সদস্যরা এ ক্ষেত্রে অনেকাংশে নীরব ভূমিকা পালন করেছে। ক্ষেত্রবিশেষে বিরোধী দল হিসেবে প্রধান বিরোধী দল থেকে অন্যান্য বিরোধী দলের ভূমিকা বেশি লক্ষণীয় ছিল। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক মেলবন্ধন না থাকায় সরকারকে জবাবদিহি করার ক্ষেত্র আরও সীমিত হয়ে গেছে। ক্ষেত্রবিশেষে প্রধান বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যে অন্যান্য বিরোধী দলের পর্যালোচনা ও সমালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে, যা প্রধান বিরোধী দলের দ্বৈত ভূমিকা ও পরিচয়কে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলে।

নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব, উপস্থিতি ও কার্যক্রমে অংশগ্রহণ

নির্বাচিত আসনে ২৩ জন (৭ দশমিক ৭ শতাংশ) এবং সংরক্ষিত আসন নিয়ে মোট ৭৩ জন (২০ দশমিক ৩ শতাংশ) নারী সদস্য সংসদে প্রতিনিধিত্ব করছেন। মন্ত্রীদের ৪ দশমিক ৩ শতাংশ, প্রতিমন্ত্রীদের ১১ দশমিক ১ শতাংশ ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে ১ জন নারী সদস্য ছিলেন। স্থায়ী কমিটিতে নারী সদস্য রয়েছেন প্রায় ২২ দশমিক শূন্য শতাংশ এবং কমিটির সভাপতি পদে নারী সদস্য রয়েছেন ৫ জন (১১ দশমিক ১ শতাংশ কমিটির)। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ-২০২৩-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, নারী সরকারপ্রধানের ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ ১ম হলেও, সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদে নারীর প্রতিনিধিত্বে ৯১তম এবং ১২৩তম।

কার্যদিবস প্রতি নারীদের গড় উপস্থিতি ছিল ৪৬ জন (৬৩ শতাংশ), যা পুরুষদের (৫৩ শতাংশ) তুলনায় বেশি এবং মোট কার্যদিবসের ৭৫ শতাংশের বেশি উপস্থিতির ক্ষেত্রেও নারীদের হার পুরুষদের তুলনায় বেশি ছিল। সংসদ কার্যক্রমে সার্বিকভাবে নারী সদস্যদের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় যে নারীদের অংশগ্রহণ বেশি ছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব, বাজেট ও ৭১ বিধিতে আলোচনায়। এ ক্ষেত্রে এই পর্বগুলোতে নারীদের অংশগ্রহণের হার পুরুষ সদস্যদের তুলনায়ও বেশি ছিল। এ ছাড়া অন্য সব কার্যক্রমে পুরুষদের অংশগ্রহণ নারীদের তুলনায় বেশি ছিল।

চিত্র-১২ : সংসদের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় লিঙ্গভেদে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (%)

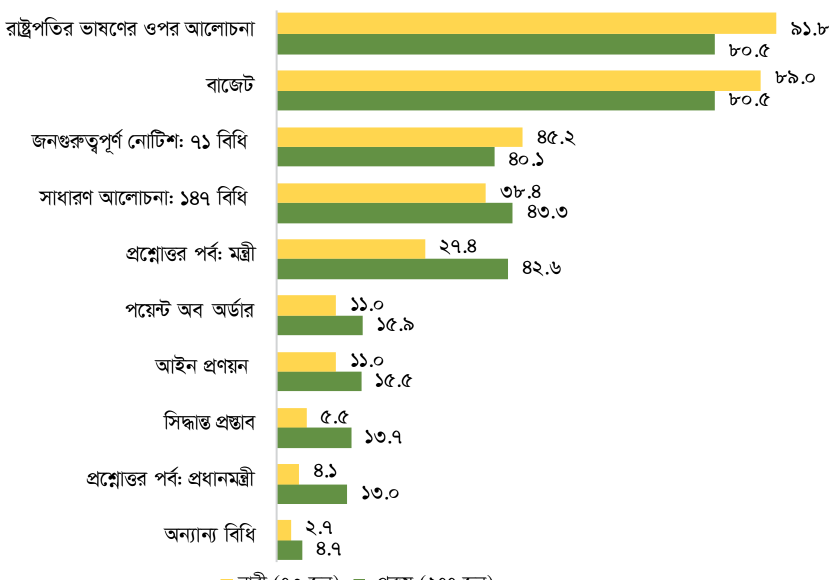

বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বাজেট, বাল্যবিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ, নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধিকরণ ইত্যাদিবিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট

সার্বিকভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ঘাটতি ছিল। মানসম্মত শিক্ষা, বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন, জলবায়ু কার্যক্রম, শান্তি, ন্যায়বিচার এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে সুনির্দিষ্ট কিছু আলোচনা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের অন্যান্য লক্ষ্য সম্পর্কে পরোক্ষভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমে বিক্ষিপ্ত আলোচনা লক্ষ করা গেছে। এ ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা, শোভন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, শিল্প, উদ্ভাবন, অবকাঠামো এবং জলবায়ু কার্যক্রমের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা

সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের উপস্থিতি

কার্যদিবস প্রতি গড় উপস্থিতি ছিল ১৯২ জন (৫৪ দশমিক ৯ শতাংশ)। সরকারি দলের ৫৫ দশমিক ৮ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের ৫০ দশমিক শূন্য শতাংশ এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ৪৩ দশমিক শূন্য শতাংশ প্রতি কার্যদিবসে গড়ে উপস্থিত ছিল। সবচেয়ে বেশি উপস্থিতির হার ছিল চতুর্থ অধিবেশনে (২০১৯ সালের সেপ্টেম্বর)। অন্যদিকে গড়ে সবচেয়ে কমসংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিলেন অষ্টম অধিবেশনে (২০২০ সালের জুন-জুলাই)।

বিভিন্ন কার্যক্রমে* সার্বিকভাবে দলভিত্তিক গড় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সরকারি দলের ৮৪ দশমিক ৩ শতাংশ, প্রধান বিরোধী দলের ১০ দশমিক ৩ শতাংশ ও অন্যন্য বিরোধী দলের ৫ দশমিক ৫ শতাংশ সদস্য অংশগ্রহণ করেন। সর্বোচ্চ ১০টি বা ততোধিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছে ৩ জন সদস্য এবং কেবল ১টি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন ২৭ জন সদস্য। সদস্যদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ (৮২ দশমিক ৯ শতাংশ) ছিল রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ আলোচনায়। দলের প্রতিনিধিত্ব বিবেচনায় প্রায় সব কার্যক্রমেই বিরোধী দলগুলোর অংশগ্রহণের হার সরকারি দল থেকে বেশি ছিল। অন্যান্য কার্যক্রমে সরকারি দলের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ থাকলেও আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেছেন মাত্র ১ দশমিক ৯ শতাংশ সদস্য।

---

* এখানে কার্যক্রম বলতে ১৩টি কার্যক্রমকে বোঝানো হয়েছে। কার্যক্রম সমূহ হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তর পর্ব, মন্ত্রীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব, আইন প্রণয়ন, বাজেট, রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাব, পয়েন্ট অব অর্ডার, মুলতবি প্রস্তাব, ৭১ বিধি, ১৪৭ বিধি, ১৬৪ বিধি, ২৭৪ বিধি, ৩০০ বিধি এবং ৬২ বিধির ওপর আলোচনা।

চিত্র-১৩ : দলভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ (%)

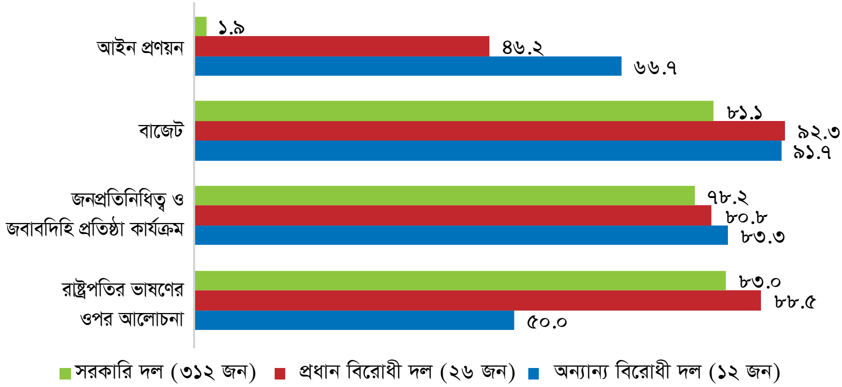

সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতা

সংসদীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের প্রস্তুতির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়, যেখানে প্রস্তুতি না থাকার কারণে প্রস্তাব উত্থাপন না করা, প্রশ্নোত্তর পর্বে যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই না করে তথ্য প্রদান করা ইত্যাদি লক্ষ করা গেছে। নোটিশ দিয়ে একাধিক কার্যদিবসে অনুপস্থিত থাকার কারণে নোটিশ বারবার স্থগিত হওয়া, সংশোধনী অনুত্থাপিত থাকা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অন্য মন্ত্রীর দায়সারা উত্তর প্রদান, একজনের নোটিশ অন্যজন উপস্থাপন করতে গিয়ে জটিলতার সৃষ্টি ও সময়ক্ষেপণ করতেও দেখা গেছে। দুটি পর্বে কণ্ঠভোটের সময় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সদস্য নিজ দলের বিপক্ষে ভোট প্রদানের পর স্পিকার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় দ্বিতীয় দফায় ভোটে নিজ দলের পক্ষে ভোট প্রদান করেন, যা কার্যক্রমে অমনোযোগী থাকাকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যদের মধ্যে দক্ষতার ঘাটতিও লক্ষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে এক কার্যক্রমে অন্য কার্যক্রমের বিষয় উত্থাপন, প্রস্তাব উত্থাপনের ক্রম ভুল করা, বক্তব্য পেশ করতে না পারা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য উদ্যোগের ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সংসদ কর্তৃক আয়োজিত মোট ২৮টি প্রশিক্ষণের মধ্যে দুটি প্রশিক্ষণ ছিল সংসদ সদস্যদের জন্য।

সংসদ চলাকালে সদস্যদের আচরণ

সংসদ সদস্যদের একে অপরের প্রতি এবং সার্বিকভাবে সুশীল সমাজের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে বিধিবহির্ভূত আচরণ লক্ষ করা যায়। বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কোনো কোনো নারী সদস্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক এবং

> **বিরোধী দলের প্রতি আক্রমণাত্মক শব্দের ব্যবহার**
>
> *“খুনি, ঘাতক, পাকিস্তানি প্রেতাত্মা, পাকিস্তানি এজেন্ট, পাকিস্তানি দোসর, কুখ্যাত মেজর, ছদ্মবেশী, রাষ্ট্রদ্রোহী, খলনায়ক, কুলাঙ্গার, মূর্খ, অগ্নিসন্ত্রাসী, অগ্নিসন্ত্রাসের রাণী, দুর্নীতির বরপুত্র, দুর্নীতির বরপুত্রের জননী, মিথ্যাচারিনী, চোর, জঙ্গিনেতা, বিশ্ব বেয়াদব, জগৎ কুখ্যাত লুটেরা, দুর্নীতিবাজ, লস্কর, দুর্নীতিতে অনার্স ও মানি লন্ডারিংয়ে মাস্টার্স ইত্যাদি*

আপত্তিকর শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা গেছে। বিরোধী দলের তুলনায় সরকারি দলের সদস্যদের ক্ষেত্রে এই ব্যত্যয় অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালে বিশৃঙ্খল আচরণ করে বাধা প্রদান করা, সংসদ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন অডিও/ভিডিও ক্লিপ চালানো, অধিবেশন চলাকালে সংসদ কক্ষের ভেতর বিচ্ছিন্নভাবে চলাফেরা করা, কোনো সদস্যের বক্তব্য চলাকালে অন্য সদস্যদের নিজেদের মধ্যে কথোপকথন, সংসদ অধিবেশনে অমনোযোগী থাকা এবং সংসদ সদস্যকে উদ্দেশ্য করে টিকা-টিপ্পনী কাটা ইত্যাদিও লক্ষণীয় ছিল।

সংসদ বর্জন, ওয়াকআউট ও পদত্যাগ

একাদশ সংসদের ২২তম অধিবেশন পর্যন্ত বিরোধী দলগুলো কোনো সংসদ বর্জন করেনি। অন্যান্য বিরোধীদলীয় সদস্যরা মোট পাঁচবার ওয়াকআউট করেন। ওয়াকআউট করে সদস্যরা সর্বনিম্ন ৩ মিনিট হতে ২১ মিনিট সংসদ কার্যক্রমে অনুপস্থিত ছিলেন। ২০তম অধিবেশনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সব সদস্য (৭ জন) পদত্যাগ করেন। শূন্য আসনের নির্বাচনে সরকারি দলের ৫ জন, প্রধান বিরোধী দলের ১ জন এবং অন্যান্য বিরোধী দলের ১ জন সদস্য ওই আসনগুলো লাভ করেন।

কোরাম-সংকট

কোরাম-সংকটে মোট ৫৪ ঘণ্টা ৩৮ মিনিট ব্যয় হয়, যা সংসদ কার্যক্রমের মোট ব্যয়িত সময়ের ৬ দশমিক ৫ শতাংশ। কার্যদিবস প্রতি গড় ১৪ মিনিট ৮ সেকেন্ড ব্যয় হয়। ৮৪ শতাংশ কার্যদিবসে নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয় এবং ১০০ শতাংশ কার্যদিবসে বিরতির পর নির্ধারিত সময় হতে বিলম্বে অধিবেশন শুরু হয়। সংসদ পরিচালনার প্রতি মিনিটের গড় অর্থমূল্য প্রায় ২ লাখ ৭২ হাজার ৩৬৪ টাকা। এই হিসাবে কোরাম-সংকটে ব্যয়িত সময়ের প্রাক্কলিত অর্থমূল্য প্রায় ৮৯ কোটি ২৮ লাখ ৮ হাজার ৭৭৯ টাকা।

স্পিকারের* ভূমিকা

সদস্যদের অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার বন্ধে সদস্যদের সতর্ক করা বা শব্দ এক্সপাঞ্জ করার ক্ষেত্রে স্পিকারকে নীরব ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। বিরোধী দলের কোনো কোনো সদস্যদের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় পরিচিতির জায়গা থেকে প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে দলীয় পরিচিতির ঊর্ধ্বে ভূমিকা পালনে ব্যর্থতা এবং বিলের ওপর সদস্যদের আপত্তি উত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বপ্রণোদিত ব্যাখ্যা প্রদানের বিষয়ও লক্ষ করা গেছে। অধিবেশন চলাকালে গ্যালারিতে শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠক নিশ্চিতকরণে ভূমিকা পালনের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। নিয়মিত স্পিকারের অনুপস্থিতিতে সংসদ কার্যক্রম পরিচালনায় দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দক্ষতার ঘাটতি (শৃঙ্খলা রক্ষা, ফ্লোর আদান-প্রদান ইত্যাদি) লক্ষণীয় ছিল।

তথ্যের উন্মুক্ততা

সংসদীয় কার্যক্রম সরাসরি সম্প্রচার অব্যাহত থাকলেও সংসদের নিজস্ব সামাজিক মাধ্যমে রেকর্ডকৃত অধিবেশনের কিছু কিছু অংশ অনুপস্থিত রয়েছে। সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যবিবরণীসহ কমিটির প্রতিবেদনগুলো সবার জন্য সহজলভ্য নয়। সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবেদনের হালনাগাদ তথ্য

* স্পিকার বলতে স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার এবং সভাপতিমণ্ডলীর প্যানেলের সদস্যদের বোঝানো হয়েছে।

ও সংসদ সদস্যদের হলফনামা সংসদের ওয়েবসাইটে অনুপস্থিত। অন্যদিকে সংসদে ও কমিটিতে সদস্যদের উপস্থিতি, সংসদীয় কার্যক্রমের বিবরণী, সংসদ সদস্যদের সম্পদের হালনাগাদ তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে উন্মুক্ত করার উদ্যোগের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

আগের সংসদগুলোর সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ (অষ্টম থেকে একাদশ জাতীয় সংসদ)

সদস্যদের ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্টতা ক্রমবর্ধমান রয়েছে। সংসদ সদস্যদের গড় উপস্থিতি অষ্টম সংসদ থেকে ক্রমাগত বাড়তে থাকলেও একাদশ সংসদে এসে তা আবার হ্রাস পেয়েছে। সংসদ নেতার গড় উপস্থিতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে ৯৪ শতাংশ হয়েছে। অন্যদিকে বিরোধী দলের নেতার উপস্থিতি দশম সংসদে অনেকটা বৃদ্ধি পেলেও একাদশ সংসদে এসে তা আবার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সংসদ বর্জন শূন্যের কোঠায় এসেছে এবং ওয়াকআউটের মাত্রা গত তিন সংসদের তুলনায় ছিল সর্বনিম্ন। সার্বিকভাবে প্রশ্নোত্তর পর্বে ব্যয়িত সময়ের হার হ্রাস পেয়েছে যদিও আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা পর্বে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা পর্বে সদস্যদের অংশগ্রহণের হার প্রায় একই রকম থাকলেও প্রশ্নোত্তর পর্ব ও আইন প্রণয়নে এ হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সংসদে বিল পাসের ক্ষেত্রে গড় ব্যয়িত সময় বৃদ্ধি পেয়েছে। কোরাম-সংকট পূর্ববর্তী সংসদগুলোর তুলনায় হ্রাস পেলেও এই চর্চা অব্যাহত রয়েছে। সংসদীয় স্থায়ী কমিটিগুলো পূর্ববর্তী দুটি সংসদের মতো প্রথম অধিবেশনেই গঠিত হয়েছে। এ ছাড়া কমিটির সভায় সদস্যদের উপস্থিতির হারে তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন একাদশ সংসদ নির্বাচনে সরকারি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে সংসদীয় কার্যক্রমে (আইন প্রণয়ন, বাজেট, স্থায়ী কমিটি) একচ্ছত্র ক্ষমতার চর্চার ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়।
- সংসদে ক্ষমতাসীন জোটভুক্ত দল হিসেবে সংসদীয় কার্যক্রমে প্রধান বিরোধী দলের দ্বৈত ভূমিকা পালন বা সংসদকে কার্যকর করে তুলতে প্রধান বিরোধী দলের শক্তিশালী ভূমিকা পালনে ঘাটতি লক্ষ করা যায়।
- জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কার্যক্রমে তুলনামূলক কম গুরুত্ব প্রদান (কার্যক্রম স্থগিত রাখা, চলমান জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অনালোচিত থাকা ইত্যাদি) এবং সার্বিকভাবে বিগত সংসদগুলোর চেয়ে (নবম ও দশম সংসদ) ব্যয়িত সময় ও অংশগ্রহণের হার হ্রাস পেয়েছে।
- আগের সংসদগুলোর চেয়ে আইন প্রণয়নে (বিল পাস) গড় সময় বৃদ্ধি পেলেও সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ও গঠনমূলক বিতর্কের ঘাটতি এবং আইন প্রণয়নে সরকারি দলের অধিকাংশ সদস্যের অংশগ্রহণ শুধু বিলের পক্ষে ভোট দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে লক্ষ করা যায়।
- বরাবরের মতো প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর বিশ্লেষণ ও জবাবদিহি অনুপস্থিত ছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যেই নামমাত্র পরিবর্তন-পরিমার্জন করেই বাজেট ও অর্থবিল পাস হয়।

- সংসদীয় কার্যক্রমে বিষয়ভিত্তিক, প্রাসঙ্গিক, গঠনমূলক আলোচনার পরিবর্তে সরকার ও দলীয় অর্জন, প্রশংসা এবং প্রতিপক্ষ দলের প্রতি আক্রমণাত্মক সমালোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।
- সংসদীয় কার্যক্রমে সদস্যদের অনুপস্থিতি, যথাযথ গুরুত্বসহকারে অংশগ্রহণ না করা, প্রতিপক্ষের মতামত প্রকাশে বিঘ্ন ঘটানো ও মতামত গ্রহণ না করার প্রবণতার কারণে কার্যক্রমের কার্যকারিতা হ্রাস পেয়েছে।
- স্থায়ী কমিটিগুলোর নিয়মিত বৈঠকের ঘাটতি, এমনকি দেশের জরুরি পরিস্থিতিতেও সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর বৈঠক করার প্রতি গুরুত্বহীনতা লক্ষ করা গেছে।
- স্থায়ী কমিটিগুলোর প্রতিবেদন সহজলভ্য না হওয়া এবং প্রতিবেদন তৈরির নির্ধারিত একক কাঠামো না থাকায় কমিটির সুপারিশ ও তা বাস্তবায়নের চিত্র সুনির্দিষ্টভাবে দৃশ্যমান নয়।
- সংসদে নারী সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব এযাবৎকালের সর্বোচ্চ হলেও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও), ১৯৭২ মোতাবেক ২০২০ সালের মধ্যে তা ৩৩ শতাংশ নিশ্চিত করা হয়নি।
- সংসদীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পেলেও কার্যকর অংশগ্রহণে ঘাটতি ছিল।
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে গৃহীত পদক্ষেপ, অর্জিত লক্ষ্য, চ্যালেঞ্জ নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোচনার ঘাটতি ছিল।

সুপারিশমালা

১. জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাস্তবিক অর্থে অংশগ্রহণমূলক, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হতে হবে, যাতে সংসদের মৌলিক ভূমিকা– জনপ্রতিনিধিত্ব, আইন প্রণয়ন এবং সংসদের জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমে প্রত্যাশিত মান অর্জন করা সম্ভব হয়।

২. সদস্যদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের জন্য সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে, যেখানে অনাস্থা ভোট এবং বাজেট ব্যতীত অন্য সব ক্ষেত্রে স্বীয় দলের বিরুদ্ধে সদস্যদের নিজ বিবেচনা অনুযায়ী মতপ্রকাশ, বিতর্কে অংশগ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকবে।

৩. সরকারি দলের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তে বিরোধী দলের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৪. 'সংসদ সদস্য আচরণ আইন' প্রণয়ন করতে হবে, যেখানে সংসদ সদস্যদের আচরণ ও কার্যক্রম সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চা অনুসারে নির্দেশনা থাকবে।

৫. সংসদে অধিকতর শৃঙ্খলা রক্ষাসহ অসংসদীয় ভাষার ব্যবহার ও আচরণ বন্ধে স্পিকারকে জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

৬. অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা, অহেতুক প্রশংসা ও সমালোচনা না করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে কার্যকর অংশগ্রহণ এবং ফলপ্রসূ আলোচনা নিশ্চিত করতে দলীয়প্রধান ও হুইপের জোরালো ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭. সংসদীয় কার্যক্রমবিষয়ক পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে সংসদীয় চর্চা ও আচরণ, আইন প্রণয়ন এবং জবাবদিহিমূলক বিতর্কে সক্রিয় ও কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮. রাষ্ট্রপতির ভাষণে দেশের সার্বিক অবস্থার পর্যালোচনা ও সুনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা থাকতে হবে।

৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের অগ্রগতি আলোচনার জন্য সংসদে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

১০. আন্তর্জাতিক সব চুক্তি আলোচনার জন্য সংসদে উপস্থাপন করতে হবে।

১১. আইনের খসড়ায় জনমত গ্রহণের জন্য অধিবেশনে উত্থাপিত সব বিল সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং অংশীজনের মতামত বিশ্লেষণ ও গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় এবং প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে হবে।

১২. সংসদীয় স্থায়ী কমিটির নিয়মিত বৈঠক, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ নিশ্চিত করতে হবে।

১৩. সংসদীয় কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য পিটিশন কমিটিকে কার্যকর করতে হবে।

১৪. নিম্নলিখিত তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে জাতীয় সংসদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে।

- সংসদ অধিবেশন ও কমিটির বৈঠকে সদস্যদের উপস্থিতিবিষয়ক তথ্য পৃথকভাবে ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।
- সংসদ সংদস্যদের পূর্ণাঙ্গ হলফনামা এবং সম্পদের হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
- সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ তথ্য প্রকাশ করতে হবে।
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিবেদন ও জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে প্রকাশযোগ্য নয় এমন বিষয় ব্যতীত অন্যান্য আন্তর্জাতিক চুক্তির বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] Beetham, D, *Parliament and Democracy in the Twenty First Century: A Guide to Good Practice* (Geneva: Inter-Parliamentary Union (IPU), 2006).

[২] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, *জাতীয় সংসদ ও সংসদ সদস্যের ভূমিকা: জনগণের প্রত্যাশা*, অক্টোবর ২০০৮।

[৩] United Nations, Sustainable Development, Goal 16, Target 16.6 & 16.7, available on: https://sdgs.un.org/goals/goal16#targets_and_indicators।

[৪] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২, বিস্তারিত দেখুন, https://plandiv.gov.bd।

[৫] “Election Result 2018”, *The Daily Star*, 2018; বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/bangladesh-national-election-2018/results।

[৬] বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, বিস্তারিত দেখুন: http://www.parliament.gov.bd/।

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধ্যায় বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি*

ফাতেমা আফরোজ

ভূমিকা

বাংলাদেশ ২০০৭ সালে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের (UN Convention Against Corruption-UNCAC) সদস্যরাষ্ট্র হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) কর্তৃক প্রণীত এই প্রতিবেদন সনদের দ্বিতীয় পর্যায়ের পর্যালোচনার জন্য নির্ধারিত দ্বিতীয় অধ্যায় (প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা) এবং পঞ্চম অধ্যায়ের (সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদগুলোর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি বর্তমানে আন্তর্জাতিকভাবে চলমান জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে সহায়তার লক্ষ্যে পরিচালিত।

গবেষণার উদ্দেশ্য

প্রতিবেদন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো উল্লিখিত কর্মপরিধি (অধ্যায়) বিবেচনায় নিয়ে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের উদ্যোগ, সফলতা ও চ্যালেঞ্জ তথা সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে–

- বর্তমান সময়ের সাথে প্রাসঙ্গিক এবং অধ্যায় দুটির উল্লেখযোগ্য কিছু অনুচ্ছেদ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকারের উদ্যোগ, সফলতা এবং সীমাবদ্ধতা তথা সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা করা; এবং
- সনদের অধিকতর কার্যকর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়নযোগ্য নীতিনির্ধারণী ও দিকনির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার পরিধি

প্রতিবেদনে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের দ্বিতীয় অধ্যায় (প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা) ও পঞ্চম অধ্যায়ে (সম্পত্তি পুনরুদ্ধার) অন্তর্ভুক্ত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। সনদের যেসব বিষয় ও অনুচ্ছেদ এই পর্যালোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে– দুর্নীতি দমন নীতিমালা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন (অনুচ্ছেদ ৫), দুর্নীতি প্রতিরোধক সংস্থা (অনুচ্ছেদ ৬), সরকারি খাত, সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণবিধি, স্বার্থের সংঘাত ও সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য

---

* ২০২৩ সালের ৫ অক্টোবর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত।

প্রকাশ (অনুচ্ছেদ ৭.১, ৭.২, ৮.১, ৮.২, ৮.৩ ও ১২), রাজনৈতিক অর্থায়ন (অনুচ্ছেদ ৭.৩); প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা (অনুচ্ছেদ ৮.৪ ও ১৩.২); সরকারি ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা (অনুচ্ছেদ ৯.১ ও ৯.২); তথ্যে অভিগম্যতা ও সমাজের অংশগ্রহণ (অনুচ্ছেদ ১০ ও ১৩.১), বিচার বিভাগ ও প্রসিকিউশন সেবা (অনুচ্ছেদ ১১), অর্থ পাচার প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা (অনুচ্ছেদ ১৪, ৫২ ও ৫৮), পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা (অনুচ্ছেদ ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৯) এবং অপরাধের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও নিষ্পত্তিকরণ (অনুচ্ছেদ ৫৭)।

গবেষণার পদ্ধতি

ভিয়েনাভিত্তিক আনকাক কোয়ালিশন ও বার্লিনভিত্তিক ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের গাইডলাইন ও প্রতিবেদন ফরম্যাট ব্যবহার করে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) প্রতিবেদনটি প্রণয়ন করেছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের অংশীজনের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া পরোক্ষ তথ্যের জন্য সংশ্লিষ্ট নথি বা প্রতিবেদন, আইন, বিধি, ওয়েবসাইট ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট গবেষণা প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছে।

গবেষণায় তথ্যে অভিগম্যতা-সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ

এই গবেষণার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তথ্য সংগ্রহ। সরকারি দপ্তরে সীমিত প্রবেশাধিকার তথ্য সংগ্রহে অনেক ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে। এ ছাড়া কোভিড পরিস্থিতি এই অবস্থাকে আরও জটিল করে তোলে। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার শিকার হতে হয়। কোনো কোনো তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার দিলেও তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে নাম প্রকাশ না করার শর্তে সীমিত তথ্য প্রদান করতে রাজি হন। তথ্য অধিকার আইনের অধীনে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করলেও আংশিক তথ্য পাওয়া যায়। এ কারণে অনেকাংশে পরোক্ষ তথ্যের ওপর নির্ভর করতে হয়। সার্বিকভাবে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ ও অনলাইনসহ বিভিন্ন পরোক্ষ তথ্যের ভিত্তিতে এই প্রতিবেদন প্রণীত হয়।

সরকারি পর্যালোচনা-প্রক্রিয়া

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের বাস্তবায়ন পর্যালোচনায় বাংলাদেশ সরকারের পর্যালোচনা (Self-assesment) দল প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করছে। সরকারের পর্যালোচনার একপর্যায়ে ১৩ জুন ২০২৩ সুশীল সমাজের কতিপয় প্রতিনিধিকে সরকার প্রণীত প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রদানে আহ্বান জানানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় কেবল ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিবেদনের ওপর মন্তব্য প্রদান করে।

আইন ও আইনের প্রয়োগ

২০০৪ সালে সরকার কর্তৃক দুর্নীতিবিরোধী আইন প্রণীত হয়। ২০০৭ সালে জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরের পর একই বছর দুর্নীতি দমন নীতিমালা[১] প্রণীত হয়। পরে ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন গঠন, এরপর ২০১১ সালে জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ

সুরক্ষা আইন[২] প্রণীত হয়। এ ছাড়া ২০০৮ সালে ক্রয় বিধিমালা ও ২০১২ সালে অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন প্রণীত হয়।

২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল[৩] প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক লক্ষ্য, কৌশল ও বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে বিস্তারিত নির্দেশিকা প্রবর্তিত হয়। পরে ২০১৫ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে একটি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর থেকে সনদ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে প্রবর্তিত তথ্য সংগ্রহ ছক ও মূল্যায়নকাঠামো জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এ ছাড়া বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় দুর্নীতি প্রতিরোধকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০৪১) এ লক্ষ্য অর্জনে প্রশাসনিক সংস্কার, ই-গভর্ন্যান্স প্রবর্তন এবং দুনীতি দমন কমিশনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি বৃদ্ধিসহ কমিশনকে শক্তিশালী করার প্রতিশ্রুতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[৪]

সার্বিকভাবে দুর্নীতিবিরোধী আইন প্রণয়নে গৃহীত পদক্ষেপ একটি বিস্তারিত আইনি কাঠামো তৈরিতে এবং দুর্নীতিকে জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে অন্যতম উদ্বেগের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করতে ভূমিকা রেখেছে। তবে আইনগুলো বাস্তবায়নের দিক থেকে আরও অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইন,[৫] ২০০৪ অনুযায়ী দুর্নীতি দমনে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে দুর্নীতি দমন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহায়ক হিসেবে বিবেচিত। এ ক্ষেত্রে ইতিবাচক অর্জনের মধ্যে রয়েছে– কর্মী নিয়োগে কোটাব্যবস্থা রহিতকরণ এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগব্যবস্থা প্রচলন, দুদক (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা[৬] ২০০৮ প্রবর্তন এবং দুদকের আর্থিক সক্ষমতা অর্জন। তবে কমিশনকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে এর আইনগত বাধা, যেমন সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতির আইনগত বাধ্যবাধকতা দূর করতে হবে। অন্যদিকে, দুদকের ওপর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব নিরসনে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

একটি দক্ষ সিভিল সার্ভিস গঠনে ইতিপূর্বে যেসব আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সিভিল সার্ভিস নীতিমালা[৭] ১৯৮১ ও সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা[৮] ১৯৭৯ অন্যতম। এ ছাড়া সাম্প্রতিককালে প্রণীত সরকারি চাকরি আইন[৯] ২০১৮ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক ভূমিকা পালনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তবে তদন্তের স্বার্থে সরকারি কর্মকর্তার গ্রেপ্তারের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমতির বিষয়টি দুর্নীতি দমনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

নির্বাচন ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (RPO)[১০] এবং নির্বাচন আচরণবিধি এবং পরে নির্বাচন ব্যয় বিষয়ক অধ্যায় সংযোজন করা হয় ও এর সংশোধন আনা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা বৃদ্ধিতে ২০০৬ সালে সরকারি ক্রয় আইন[১১] প্রণয়ন, ২০০৮ সালে সরকারি ক্রয় বিধিমালা[১২] এবং ই-জিপি প্রবর্তন[১৩] (E-GP) করা হয়। এতদসত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের একাংশের সঙ্গে ক্রয় প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সরবরাহকারীদের জোগসাজশ থাকায় সরকারি ক্রয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ই-জিপি প্রবর্তনের ফলে প্রকৃত উন্মুক্ত

প্রতিযোগিতা ও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সাফল্যের লক্ষণীয় দৃষ্টান্ত বিরল; বরং ক্রয় প্রক্রিয়ায় একধরনের জবরদখলের প্রবণতা সৃষ্টি করেছে।

সংবিধানের ২২ নম্বর অনুচ্ছেদে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও ২০০৭ সালে প্রথম এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ গৃহীত হয়। তবে আনুষ্ঠানিক পৃথকীকরণ হলেও এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ও নির্বাহী প্রভাবে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ব্যাহত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া নিম্ন আদালতে সেবাগ্রহীতাদের ব্যাপক দুর্নীতির শিকার হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।[১৪]

অর্থ পাচার প্রতিরোধে ২০০২ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন[১৫] প্রবর্তিত এবং ২০১২[১৬] ও ২০১৫ সালে এর সংশোধন এবং ২০১৯ সালে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালার প্রণয়নের মাধ্যমে একটি সম্ভাব্য আইনগত কাঠামো তৈরি হয়। এ ছাড়া বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit-BFIU) প্রতিষ্ঠা এবং এগমন্ট গ্রুপে (Egmont Group) বাংলাদেশের সদস্যপদ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত করে। তবে আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রতিষ্ঠায় উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং পাচারকৃত অবৈধ অর্থের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ব্যাপক উদ্বেগের সৃষ্টি করছে।

একনজরে এই সনদের আইনগত ও প্রায়োগিক বাস্তবায়ন বা চর্চার সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলো।

সারণি-১ : আইনগত ও প্রায়োগিক বাস্তবায়নের সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের অনুচ্ছেদ	আইনত বাস্তবায়ন	প্রায়োগিক বাস্তবায়ন
অনুচ্ছেদ ৫: দুর্নীতি দমন নীতিমালা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৬ : দুর্নীতি প্রতিরোধক সংস্থা	মোটামুটি	মধ্যম পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৭.১, ৭.২, ৮.১, ৮.২, ৮.৩ ও ১২: সরকারি খাত, সরকারি কর্মকর্তাদের আচরণবিধি, স্বার্থের সংঘাত ও সম্পত্তি সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৭.৩: রাজনৈতিক অর্থায়ন	আংশিক	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৮.৪ ও ১৩.২: প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ও তথ্য প্রকাশকারীর সুরক্ষা	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৯.১ ও ৯.২: সরকারি ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা	মোটামুটি	মধ্যম পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ১০ ও ১৩.১: তথ্যে অভিগম্যতা ও সমাজের অংশগ্রহণ	মোটামুটি	মধ্যম পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ১১: বিচার বিভাগ ও প্রসিকিউশন সেবা	মোটামুটি	মধ্যম পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ১৪, ৫২ ও ৫৮: অর্থ পাচার প্রতিরোধে গৃহীত ব্যবস্থা	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৫১, ৫৪, ৫৫, ৫৬ ও ৫৯: পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের
অনুচ্ছেদ ৫৭: অপরাধের দ্বারা অর্জিত সম্পদ পুনরুদ্ধার ও নিষ্পত্তিকরণ	মোটামুটি	নিম্ন পর্যায়ের

সারণি-২ : নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকারিতা

প্রতিষ্ঠানের নাম	কার্যকারিতা	মন্তব্য
দুর্নীতি দমন কমিশন	মধ্যম পর্যায়ের	প্রভাবশালী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগসূত্র রয়েছে এমন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে নিম্ন পর্যায়ের উদ্যোগ লক্ষণীয়
সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)	উত্তম পর্যায়ের	সিপিটিইউ কর্তৃক সক্রিয়ভাবে ই-জিপি পরিচালনার ফলে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় অগ্রগতি হয়েছে; তবে রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের কারণে সরকারি ক্রয়ে এখনো সমস্যা রয়েছে; ক্রয়ে একচেটিয়াকরণের প্রবণতা তৈরি হয়েছে
তথ্য কমিশন	মধ্যম পর্যায়ের	তথ্য কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও কার্যকারিতা প্রত্যাশিত পর্যায়ের নয়
ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট	মধ্যম পর্যায়ের	বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আইনি ও কাঠামোগতভাবে সুসংগঠিত হলেও অর্থ পাচারে কার্যকর প্রতিরোধে ও পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে এই প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ বিরল। অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ঘাটতি বিদ্যমান

সুপারিশমালা

জাতিসংঘ দুর্নীতিবিরোধী সনদের বাস্তবায়নে বাংলাদেশের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত অগ্রগতি দৃশ্যমান। তবে আইনের কার্যকর প্রয়োগ ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভাবনার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে এবং অগ্রগতির সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে নিচের পদক্ষেপগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করা যেতে পারে–

১. দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) স্বাধীনতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং একে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব মুক্ত রাখা।

২. দুদকের এখতিয়ার এবং কার্যপরিধি খর্ব করে আইনের এমন ধারাগুলো ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ বাতিল করা।

৩. মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের সংশোধন করে ২০১২ সালের সংস্করণে যেসব বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, সেগুলোকে পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা।

৪. সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের নিয়োগ ও অপসারণের এখতিয়ার স্বাধীন সত্তার (যেমন সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল) ওপর ন্যস্ত করা। বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা

নিশ্চিতকরণে একে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা। অধস্তন আদালতে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের সংস্কৃতি পরিহার করা। বিচারিক সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার আয় ও সম্পদের হালনাগাদ তথ্যপ্রকাশসহ আচরণবিধি মেনে চলা বাধ্যতামূলক করা।

৫. পাবলিক প্রসিকিউটর ক্যাডার সার্ভিস চালু করা।

৬. দুর্নীতি সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশ ও অন্যান্য কার্য পরিচলনায় আইনগত বাধা দূর করে দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রমে নাগরিক সমাজ ও গণমাধ্যমের অংশগ্রহণ সহজতর করা।

৭. সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পদ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ নিশ্চিতকরণে সম্পদের বার্ষিক বিবরণ জমা দেওয়ার বাধ্যবাধকতা তৈরি ও প্রয়োগ করা; এ ক্ষেত্রে একটি কার্যকর তদারকি ব্যবস্থা চালু করা ও ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে জবাবদিহি নিশ্চিত করা।

৮. সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রেখে গণতান্ত্রিক ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৯. ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করা; সরকারি ক্রয়ে রাজনৈতিক প্রভাব ও একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের প্রবণতা দূর করা; সব ধরনের ও পরিমাণের সরকারি ক্রয়ে ই-জিপি প্রবর্তন করা।

১০. জাতীয় পর্যায়ে ও খাতভিত্তিক ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা করা।

১১. বার্ষিক ও মধ্যবর্তী আর্থিক বাজেট প্রতিবেদন যথাসময়ে তৈরি ও প্রকাশ করা; প্রতিবেদন বিস্তারিত করা ও জনগণের জ্ঞাতার্থে উন্মুক্ত করা।

১২. তথ্যে অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও চাহিদামাফিক তথ্য প্রকাশে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। তথ্য কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ও সরকারি প্রভাবের ঝুঁকি নিরসন করা।

১৩. সরকারি খাতে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করা।

১৪. জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা আইন বাস্তবায়নে জনসচেতনতামূলক প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা।

১৫. আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং কালোটাকা সাদা করার অসাংবিধানিক, বৈষম্যমূলক ও দুর্নীতি সহায়ক ব্যবস্থা চিরতরে বাতিল করা।

১৬. অর্থ পাচার রোধে সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলোর পেশাগত দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা; পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ

করে প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার মধ্যকার পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয় বৃদ্ধি করা এবং এ ক্ষেত্রে পারস্পরিক আইন সহায়তাসহ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এর যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

তথ্যসূত্র

১ দুর্নীতি দমন নীতিমালা ২০০৭, বিস্তারিত দেখুন: http://acc.org.bd/sites/default/files/files/acc.portal.gov.bd/law/9e493b4c_96ac_4f6d_901f_16a04c935460/Amended%202019%20FIR%20in%20ACC.pdf।

২ জনস্বার্থ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা আইন, ২০১১, বিস্তারিত দেখুন: https://www.google.com/url?sa=t&rct=-j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjp4brG4Ir-AhUSWGwGHVf-DDIQFnoECA4QA-Q&url=http%3A%2F%2Fbdlaws.minlaw.gov.bd%2Fupload%2Fact%2F2021-11-17-11-39-54-40.The-Dsclosure-of-Public-Interest-information-(Protection)-Act--2011.pdf&usg=AOvVaw2G8-zHA5S3i_bzslBbQxt-।

৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২, বিস্তারিত দেখুন: http://cabinet.portal.gov.bd/sites/default/files/files/cabinet.por-tal.gov.bd/page/2923c670_4862_4936_b6b1_9f666353b00d/National%20Integrity%20Strategy.pdf।

৪ দ্য ডেইলি স্টার, ২০২২, বিস্তারিত দেখুন: https://www.thedailystar.net/recovering-covid-reinventing-our- future/blueprint-brighter-tomorrow/news/tackling-corruption-inclusive-development-2960656#lg=1&slide=0।

৫ দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) আইন, বিস্তারিত দেখুন: The Anti-Corruption Commission Act, 2004, Section 17. http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-914.html।

৬ দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকরি বিধিমালা ২০০৮, বিস্তারিত দেখুন: https://acc.portal.gov.bd/sites/default/files/files/acc.portal.gov.bd/page/5379113c_9979_4dca_a752_bea551ae9836/%28%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE-%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%80%29%20%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%BF%20%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%B-F%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A7%A8%E0%A7%A6%E0%A7%A6%E0%A7%AE_en_266%20%281%29.pdf।

৭ সিভিল সার্ভিস নীতিমালা ১৯৮১, বিস্তারিত দেখুন: 001-Law-1981.pdf (dpp.gov.bd)।

৮ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, বিস্তারিত দেখুন: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwin7_L_5pL-AhWSTmwGHQFICBsQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Feedmoe.portal.gov.bd%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Ff।

৯ সরকারি চাকরি আইন ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন: http://old.mopa.gov.bd/uploads/2018/archive/acts/cp1-2018-152.pdf।

১০ জনপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-424.html।

১১ সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬, বিস্তারিত দেখুন: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjF9qqG1aH8AhVU4jgGHTw।

১২ সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮, বিস্তারিত দেখুন: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj2jM-01KH8AhWp8DgGHdaCDJEQFnoECBAQAQ&url=http%3A%2F%2F103.48.16.164%2Fupload_images%2Fcontent_im।

১৩ ই-জিপি, বিস্তারিত দেখুন: https://www.eprocure.gov.bd/।

[১৪] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ২০১৭, বিস্তারিত দেখুন: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjbtJygt62DAxVdTmwGHXuqChIQF-noECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ti-bangladesh.org%2Fimages%2F2017%2Flower_judiciary%2FExecutive_Summery_English_Judiciary_30112017.pdf&usg=AOvVaw0XjFE_XD4Jc58IEev4_6jT&opi=89978449।

[১৫] মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০২, বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-886.html?hl=1।

[১৬] বিস্তারিত দেখুন: http://bdlaws.minlaw.gov.bd/upload/act/2021-11-17-11-43-47-42.-Money-Laundering-Prevention-Act-2012.pdf।

e-Government Procurement in Bangladesh
A Trend Analysis of Competitiveness (2012-2023)*

Mohammad Tauhidul Islam, Rifat Rahman &
K. M. Rafiqul Alam

Introduction

Public procurement plays a pivotal role in the operational dynamics of governmental bodies worldwide. The term "public procurement" pertains to the acquisition, undertaken by governmental bodies and entities under state ownership, of goods, services, and construction endeavours utilising public funds.[1] Countries around the world spend an average of 13% to 20% of GDP on public procurement[2] and the cumulative expenditure committed to public procurement activities worldwide amounts to approximately 11 trillion USD.[3] The Open Contracting Partnership and Spend Network estimated that in 2018, the total value of public procurement on a global scale might have been higher, hitting a whopping 13 trillion US dollars.[4] Moreover, the size of government purchases is always underestimated or incorrect, as smaller or routine purchases are not included in the valuations, and defense purchases are left out of the purview due to security reasons.[5]

Despite the calculation challenge, it is well-established that governments

---

* The Study relesed on 25 September 2023 at a press conference at TIB Dhaka office

1 https://www.oecd.org/gov/public-procurement/, Bangladesh e-Government Procurement Guideline https://www.eprocure.gov.bd/help/guidelines/eGP_Guidelines.pdf

2 Global Public Procurement Open Competition Index, available at; https://www.govtransparency.eu/wp-content/uploads/2021/07/Adam_H_Sanchez_Fazekas_Global-Public-Procurement-Open-Competition-Index-1.pdf; https://www.worldbank.org/en/news/feature/2020/03/23/global-public-procurement-database-share-compareimprove#:~:text=Overall%2C%20public%20procurement%20represents%20on,be%20lost%20due%20to%20corruption.

3 Bosio et. al 2020, PUBLIC PROCUREMENT IN LAW AND PRACTICE (NBER WORKING PAPER SERIES) available at; https://www.nber.org/system/files/working_papers/w27188/w27188.pdf

4 OCP, How governments spend: Opening up the value of global public procurement, available at; https://www.open-contracting.org/wp-content/uploads/2020/08/OCP2020-Global-Public-Procurement-Spend.pdf

5 Hafsa et. al; Estimating the True Size of Public Procurement to Assess Sustainability Impact available at; Sustainability 2021, 13(3), 1448; https://doi.org/10.3390/su13031448

are the largest & influential buyers in their own economy as well as in the global arena. So, governments are expected to carry out public procurement efficiently and with high integrity to ensure quality of service delivery and to safeguard public interest.[6] In addition, sustainable procurement practices are a priority target (target 12.7) of the SDGs to be achieved by 2030.

Owing to its considerable scale and intricate nature, public procurement remains susceptible to corruption. According to Transparency International, 10%–15% of public procurement spending was lost due to corruption.[7] Bosio's assessment extends this concern, estimating that 8% to 25% of the public procurement value goes to bribes.[8] When one considers the aggregate impact of inefficiencies, encompassing elements like corruption and incompetency, the figures are quite revealing. Waste of infrastructure funds in advanced economies is 15%, 34% in emerging market economies and a staggering 53% in low-income developing countries.[9] Employing the most cautious estimation drawn from the current body of empirical research, a noteworthy 8% of the total value attributed to procurement contracts, which translates to an approximate sum of $880 billion, falls into the clutches of corruption.[10]

Public procurement in Bangladesh is not immune from corruption. According to the World Bank (WB) Enterprise Survey 2022, 41.8% of competing firms are expected to give gifts to secure government contracts and the gift value is equivalent to 2% of the contract value.[11] If this rate is considered against the annual value of public procurement in Bangladesh, we find that a huge amount of money is used for bribes to secure government contracts. Bangladesh's spending of about $25 billion on public procurement annually,[12] the total loss only on account of gift value is a staggering amount of $500 million. Procurement corruption does not just mean paying bribes; it also involves issues of competitive cost ensuring best quality, implementation efficiency and timeliness, quality, durability and appropriateness etc. of the goods, materials, and services that governments buy and projects they implement.

6 https://www.oecd.org/gov/public-procurement/

7 Transparency International Handbook for Curbing Corruption in Public Procurement 2006.

8 https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/reducing-corruption-public-procurement

9 G. Schwartz, M. Fouad, T. Hansen, G. Verdier, 'Well Spent, How Strong Infrastructure Governance Can End Waste in Public Investment' available at; https://doi.org/10.5089/9781513511818.071

10 Ibid; Bosio.

11 https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2022/bangladesh#2

12 Draft Sustainable Public Procurement (SPP) Policy of Bangladesh, February 2023.

Several relevant studies conducted by Transparency International Bangladesh (TIB) during 2007-20 found the estimated loss due to corruption to range from 8.5% to as much as 27% of the relevant procurement budget.[13]

To mitigate the risk of corruption and ensure fair competition and transparency in public procurement, Bangladesh introduced an electronic government procurement (e-GP) system in June 2011 with support from the World Bank.[14] Prior to that procurement-related corruption and various other forms of irregularities including violent means of preventing competitors from participating in the procurement process made frequent news. Empirical research shows that the e-GP system has helped speed up the process of tender bidding and save costs for both the procuring entities and the contractors.[15] However, according to a study by TIB on e-procurement (2020), which also assessed E-GP as a significant positive step in transforming procurement from the manual to digital system, the new system in Bangladesh is yet to cover the full range of public procurement, nor has it been able to make significant impact in terms of reduction of corruption and political influence, collusive bidding by syndication.[16] The study identified persistent irregularities and corrupt practices despite the digitalisation efforts. These issues included the influence of local political leaders in controlling and allocating public works to specific contractors, corruption within procurement offices, and collusion among contractors.[17] It is in this context, TIB undertook the present initiative to explore the extent of competition and Integrity risks in e-GP with a particular focus on competitiveness and single bidding.

e-GP in Bangladesh

E-GP encompasses the entirety of the Government Procurement Process Cycle (GPPC), which ranges from needs assessment, competition and award, to payment and contract management, as well as any subsequent monitoring or auditing, encompassing the procurement of goods, execution of works,

13 https://www.ti-bangladesh.org/images/2020/report/EGP/E-GP_Full_Report.pdf

14 Assessment of Bangladesh Public Procurement System (2020); available at https://openknowledge.worldbank.org/server/api/core/bitstreams/141e8d31-5961-5e4d-aca6-ab43d79dba96/content

15 Ibid

16 TIB, Governance in Public Procurement: Effectiveness of E-GP in Bangladesh (2020) available at; https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6137

17 Ibid

and engagement of consultancy services.[18] The primary objective of e-GP implementation is to enhance the efficiency and effectiveness of procurement management within the governmental framework.

E-GP operates under the legal framework provided by the Public Procurement Act 2006 (and subsequent amendments) and the Public Procurement Rules 2008 (and subsequent amendments). This framework includes a central policy unit, standard procurement documents, and a functional complaint system with an independent appeal mechanism. The Central Procurement Technical Unit (CPTU) serves as the main policy unit, offering an accessible website (e-GP portal) with comprehensive procurement-related information.[19] This portal can be accessed through www.eprocure.gov.bd.[20]

The e-GP system was rolled out in phases.[21] In the initial phase, the e-tendering component[22] was launched on a trial basis within the Central Procurement Technical Unit (CPTU) and was extended to 16 other Procuring Entities (PEs) affiliated with four sectoral agencies: Bangladesh Water Development Board (BWDB), Local Government Engineering Department (LGED), Roads and Highways Department (RHD), and Rural Electrification Board (REB). Subsequently, this system has progressively expanded to encompass all government PEs at the district and sub-district levels. As of August 2023, 11,480 PE offices of 47 ministries, 27 division, and 1,438 organisations and 107,650 tenderers / Consultants, Individual Consultants have registered in the e-GP system.[23]

In the second phase, the e-Contract Management System (e-CMS) was conceptualised, developed, and subsequently rolled out. The eCMS serves as a comprehensive electronic platform for various contract management activities, including work plan preparation and submission, milestone definition, progress tracking and monitoring, report generation, quality assessments, running bill creation, vendor evaluations, and the issuance of completion certificates.

18 ibid, Background and Scope of Bangladesh e- Government Procurement Guideline

19 https://cptu.gov.bd/about-cptu/public-procurement-reform.html

20 https://www.cptu.gov.bd/e-gp.html

21 https://www.eprocure.gov.bd/Index.jsp

22 Covering complete eTendering processes such as centralized user registration, preparation of Annual Procurement Plan (APP), preparation of Bid\Tender document, preparation of Bids/ Tenders, invitation of Tenders, sale of Tender Documents (eTD), conducting online pre-bid meeting, collection of bid\Tender security, on-line Bid\Tender submission, Bid opening & evaluation, negotiations (where applicable), and contract awards.

23 https://www.eprocure.gov.bd/RegistrationDetails.jsp

Before that, the e-GP system only facilitated procurement activities until the contract-signing phase. It is expected that an electronic audit (e-Audit) through which the entire process from procurement planning to completion can be audited in a paperless manner, will also be incorporated into the e-GP system.

If we look at the number of e-tender advertisements and publications through the e-GP portal, it is huge. More than eight hundred thousand (exactly 870134 as of 04/09/2023) e-tenders have been published since 2012.[24] Besides, offline tenders are also published in the e-GP portal. The Ministry of Planning claimed that 100 per cent of public procurement tender advertisements were published through e-GP.[25] Though, it digitises the complete contracting process, from advertising to contract award, covering buyer-bidder communication, bidder registration, bid submission, and evaluation, eliminating the need for a paper-based record trail.

However, the system does not yet process all segments of the tender, like Direct procurement (DPM) and International Competitive Bidding (ICB). So, many tenders are still being processed outside of the e-GP system.

e-Procurement & Competition

When handling public funds, public entities (PEs) must consistently uphold three core principles: Economy and Efficiency, Cost-effectiveness, and Accountability. These principles are essential for ensuring Value for Money (VFM), which can be accomplished only by promoting healthy competition in procurement procedures.[26] Open, fair and unrestricted competition is pivotal in prioritising the greater good of the public, guaranteeing the prudent and effective utilisation of public funds. Section 13 of the Public Procurement ACT 2006, includes competition as one of the guiding principles of public procurement in Bangladesh.[27] It states that –

> *The procuring entity shall, to ensure competition in procurement on the basis of impartial and objective terms, provide all necessary information*

[24] https://www.eprocure.gov.bd/resources/common/StdTenderSearch.jsp?h=t
[25] https://www.cptu.gov.bd/media-communication/speeches.html
[26] GTI, I Adam, A H Sanchez , M Fazekas, Global Public Procurement Open Competition Index https://www.govtransparency.eu/wp-content/uploads/2021/07/Adam_H_Sanchez_Fazekas_Global-Public-Procurement-Open-Competition-Index-1.pdf
[27] The Public Procurement Act 2006 (English version)

to all prospective applicants, tenderers or consultants required for the preparation of the application, tender, quotation or proposal.

13(2) The criteria for qualifications assessment and evaluation shall be clearly stated in the tender or proposal document and it shall be ensured that the applicant, tenderer or consultant is allowed at least minimum time, in consistent with the procurement method to respond properly.

This underscores the critical importance of effective dissemination of procurement information to foster competition. Numerous research on public procurement have consistently revealed the pivotal role played by open competition in enhancing value for money. A highly cited study by Srabana Gupta (2002) underscored the significance of having 6 to 8 bidders for optimal competitiveness in highway infrastructure construction, resulting in substantial cost savings of 12% to 14%.[28] Similarly, Limi (2006) identified that even a 1% increase in the number of bidders translates to a commendable 0.2% reduction in prices.[29] This implies that strengthening competition in procurement bidding lowers contract prices and potentially mitigates the heavy indebtedness of developing countries.

Open competition also serves as a deterrent against collusion and corruption in public procurement by enhancing transparency. A study conducted by Bauhr et al. (2020), which analysed an extensive dataset of 3.5 million procurement records across Europe from 2006 to 2015, revealed compelling results.[30] It found that a mere 2.5 to 6% reduction in single bidding could lead to annual savings of 2.5 to 10.9 billion euros. This highlights the profound impact of promoting transparency through open competition in significantly mitigating corruption risks.

The introduction of electronic procurement helps to improve competition in two distinct ways.[31] As the process is more open, it boosts transparency and curtails the scope for corrupt practices among public officials, thus

[28] Gupta, S. Competition and collusion in a government procurement auction market. Atlantic Economic Journal 30, 13–25 (2002). https://doi.org/10.1007/BF02299143

[29] Iimi, A. Auction Reforms for Effective Official Development Assistance. Rev Ind Organ 28, 109–128 (2006). https://doi.org/10.1007/s11151-006-0012-x

[30] M Bauhr, A Czibik, M Fazekas, J Licht,(2020) Lights on the Shadows of Public Procurement Transparency as an antidote to corruption available at; https://www.govtransparency.eu/wp-content/uploads/2020/01/Bauhr-et-al_lights-on-the-shadows_accepted_2019.pdf

[31] Ibid, Adam et al(2021)

facilitating a fair competitive environment. Secondly, it simplifies the process for companies to access information and engage in public tendering, ultimately promoting a more competitive marketplace. Empirical research on e-procurement also supports those arguments. Although research by Faupel et al. (2016) on projects in India and Indonesia does not indicate a reduction in prices through e-procurement, it does uncover a positive impact on quality and time in project implementation.[32] In the case of India, where quality can be directly observed, e-procurement helped to enhance the quality of the road. Similarly, in Indonesia, it significantly reduced project delays. Additionally, when non-local contractors get more chances to winning contracts, it improves the competition.

A recent impact evaluation of the implementation of a comprehensive e-procurement system in Bangladesh has unveiled positive outcomes in terms of open competition.[33] It found that the introduction of the e-procurement system has notably enhanced the accessibility and fairness of public tenders in Bangladesh. Specifically, it led to an average increase of 1-2 additional bidders per tender. Furthermore, the probability of a single bidder decreased by 7.8% to 13.5%. It also enhanced the chances of winning by a non- local contractor. e-procurement enhances administrative efficiency, as the total time for processing a tender—from the public call for tenders to contract signature—drops substantially. The study also reveals that such improved competition drives downprices by 7-8%. If e-procurement were to cover 100 percent of public procurement spending, the government could save up to USD 1.76 billion per year. Similar results were found in Argentina. Blum et al. (2020) were however cautious about its positive impact on rent-seeking and corruption.[34] In this context, a study conducted by Transparency International Bangladesh (TIB) on the effectiveness of e-GP (2020) provides interesting findings.[35] The study observes that political influence, collusion,

32 Lewis-Faupel, Sean, Yusuf Neggers, Benjamin A. Olken, and Rohini Pande. 2016. “Can Electronic Procurement Improve Infrastructure Provision? Evidence from Public Works in India and Indonesia.” American Economic Journal: Economic Policy, 8 (3): 258-83. DOI: 10.1257/pol.20140258

33 Jürgen René Blum , Arkopal Datta, Mihály Fazekas , Sushmita Samaddar, Ishtiak Siddique, Introducing E-Procurement in Bangladesh: The Promise of Efficiency and Openness, Policy Research Working Paper 10390

34 Ibid, Blum et al. (2020)

35 Ibid, TIB(2020)

and syndication play a central role in obtaining work orders, although the procurement process has been simplified. The effect of e-GP on the reduction of corruption and improved quality of work is not discernible on account of the sale of the work, issuance of illegal subcontracts, and the distribution of work through negotiation. In other words, some stakeholders have found new ways of evading the system and engaging in new avenues of corruption.

The procurement system in Bangladesh has two significant weaknesses pertaining to the exploration of prices. Under the Open Tendering Method (OTM) for works, there exists a price ceiling and floor of +/- 10%. This implies that bids exceeding a 10% deviation from the estimated cost, whether below or above, are rejected by the Procuring Entity (PE). This rule was introduced by the government in December 2016. A similar price cap (+/-5%) is used in the Limited Tendering Method (LTM) for procurement of national works, where the estimated price is disclosed. A lottery is carried out to determine the winner in the case of tied bids. So optimum price discovery is limited, which according to the World Bank is a market distortion.[36] Moreover, bidders seek unfair practices to collect cost estimations, which breeds another form of corruption.

Research Objectives and Method

In view of the above context, this study analyzes the open source data on e-GP-based public procurement in Bangladesh for the period 2012-2023 in order to:

- examine the state of competition dynamics and single bidding in practice under e-procurement in Bangladesh
- assess the extent of market concentration; and
- recommend measures to upscale competition in public procurement through e-GP.

Methodology: Big Data analytical approach

E-procurement platforms have revolutionised the data landscape by making administrative records widely accessible through structured databases. As a result, public procurement has evolved into a data-rich domain within public

[36] WB (2020), Assessment of Bangladesh Public Procurement System.

expenditure.[37] This transformation has fundamentally reshaped our capacity to comprehend and oversee public procurement systems, fundamentally altering how we gauge performance, including assessing fraud and corruption risks.[38] We have adopted the big data analytical approach for this study, which is developed by Mihaly Fazekas.[39] By using this approach, we have analysed the data based on well-established competition and corruption risk indicators like the average number of bidders, supplier market share, prevalence of non-local suppliers and single bidding.[40] We have developed an interactive dashboard which gives an overview of the e-procurement system and assesses market dynamics and trends. Simultaneously, it enables us to pinpoint inefficiencies and integrity deficiencies within the system.

Harnessing e-procurement Data

The process of harnessing the data involved a systematic series of steps designed to transform raw information into valuable insights. Initially, data was sourced from the website https://www.eprocure.gov.bd/resources/common/SearchNOA.jsp, where e-Contract Award Notification Documents are accessible. The Python software was then employed for web scraping to extract the URLs of these documents. Subsequently, Power Query came into play to process and structure these data, to facilitate further analysis. Integration into a database was achieved through Power Query, facilitating efficient management and organisation. In the data analysis stage, the Power Query and DAX (Data Analysis Expressions) helped insights into the invisible patterns and implications. These were then translated into actionable visualisations using PowerBI, enabling the creation of interactive dashboards that helped explore and understand the data in a meaningful and user-friendly manner to serve the purpose of trend analysis.

---

37 WB(2022),Using Data Analytics in Public Procurement Operational Options and a Guiding Framework available at; https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/81fc58a7-fccb-5b03-9980-bd4eb8027101

38 Ibid, WB(2022)

39 Fazekas, M. (Academic). (2019). Using big data to measure formidable concepts: the case of government contracts data & corruption measurement [Video]. Sage Research Methods. https://doi.org/10.4135/9781526498076

40 ProACT(Procurement Anticorruption and Transparency platform) available at; https://www.procurementintegrity.org/about

Chart-1 : Stages of Data Processing

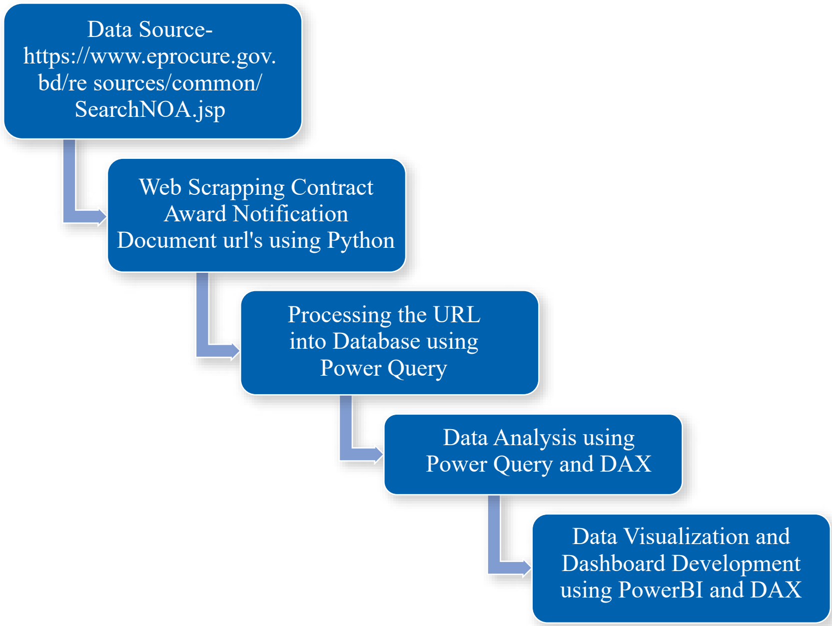

Findings of the Study

Distribution by Ministries/Divisions

In this process, we have collected a massive volume of data, precisely 455,633 e-contract records, dating from January 2012 to February 2023. Each contract has at least 30 variables (list of variables annexed). These showed that BDT 400,410 crore were spent by 5,830 different government departments from 64 Ministries or Divisions. They used this money to buy goods and services through the e-GP system. A total of 41,918 contractors actively took part in making these procurement processes happen. The highest value for a single contract within this dataset is BDT 655.50 crore. This implies that according to the open sources data accessed in the above process public procurements of higher individual value than this amount (BDT 655.5 crore) that took place during the period were not in the scope of e-GP, and hence not covered by this study. In terms of the number of works and contract value, the Local Government Division has emerged as the leading procuring entity during this period. As Table 1 shows the Local Government Division's share of the total contract value for the period was 41 percent that involved 198,604 works

implemented by 27,260 contracts. The table also shows the top ten ministries/ divisions that spent nearly 97% of the total e-contract value and approximately 92% of the total number of works.

Table-1 : Top 10 Procuring Ministries/ Divisions (2012-2023)

Ministry/Division	Total Contract Value (in Crore Taka)	Number of Works	Number of Contractors Worked
Local Government Division	163,188 (41%)	198,604	27,260
Road Transport and Highways Division	65,288 (17%)	29,833	3,054
Ministry of Water Resources	34,195 (9%)	16,792	3,549
Ministry of Housing and Public Works	34,051 (9%)	75,842	7,122
Ministry of Education	30,762 (8%)	34,939	8,128
Power Division	16,108 (4%)	28,550	3,231
Secondary and Higher Education Division	8,823 (3%)	12,095	4,213
Ministry-of-Shipping	8,532 (3%)	6,326	1,246
Welcome to Ministry of Health and Family Welfare	5,573 (2%)	9,218	2,876
Ministry of Agriculture	4,014 (1%)	10,694	2,394

Figures in parentheses indicate the percentage share of total contract value under e-GP.

Year-wise e-procurement Trend

The year-wise e-Contract data provides a comprehensive view of the trends and fluctuations in government procurement activities over the period. Beginning in 2012 with relatively modest numbers, the years 2013 to 2019 stood out as periods of substantial procurement through e-GP, marked by a significant increase in both the number of works undertaken and the total contract value. In 2019, the highest amount of BDT 86 thousand crore was spent against 79,868 contracts. From 2020 government purchase through e-GP slowed down in terms of value. The next three years witnessed significant decline in procurement value which can be attributed to the COVID-19 pandemic and the related government austerity measures. (See Chart-1)

Chart-2 : Year wise e-Procurement

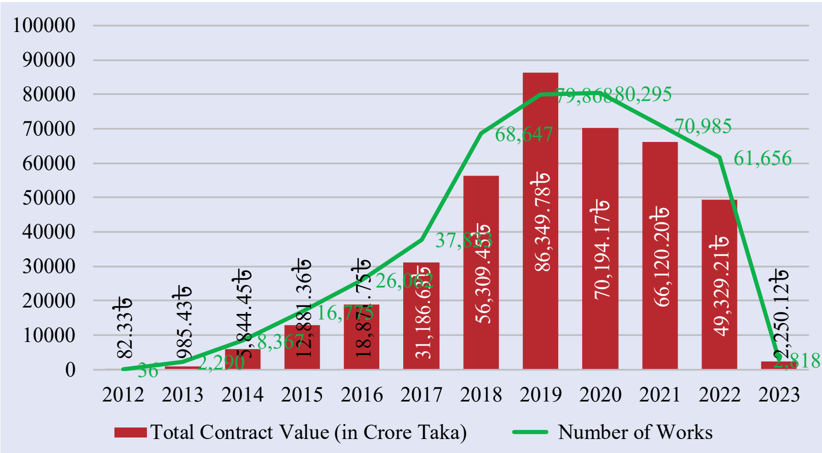

When we compare the e-procurement spending of 2022 with the annual procurement value of 25 billion dollars,[41] it becomes evident that a significant portion of public procurement continues to occur outside the e-tendering system through offline tenders.[42] Furthermore, the data reveals that the vast majority of works, a striking 99.62%, are clustered within the 0-25 Crore Taka contract value range. This highlights the prevalence of relatively lower-value contracts within e-procurement. Notably, in terms of contract value, this category constitutes a substantial 78.64%. (see Table 2) This suggests that a considerable portion of government procurement, especially higher-value contracts, continues to operate outside of the e-tendering.

Table-2 : Classification of contract packages by value for the Period

Classification by contract Value	Number of Works	Percentage of works	Contract Value (In Crore BDT)	Percentage of Contract value
0-25 Core	453,905	99.62%	314,878.50	78.64%
26-50 core	1,231	0.27%	40,480.95	10.11%
51-75 core	258	0.06%	15,856.04	3.96%
76-100 core	157	0.03%	13,453.61	3.36%
100 core +	82	0.02%	15,695.88	3.92%

41 Ibid, Draft SUSTAINABLE PUBLIC PROCUREMENT (SPP) POLICY OF BANGLADESH
42 https://www.cptu.gov.bd/media-communication/speeches.html

Distribution of works by procurement methods

Within Bangladesh's e-procurement system, more than 96% of contracts were allocated through two primary methods: Open Tender Method (OTM) and Limited Tender Method (LTM). Specifically, OTM holds a 53.26% of contracts, while LTM's share was 43.14%. The use of other forms of procurement like One Stage Two Envelope Tendering Method OSTETM (2.58%) and Request for Quotation - RFQ (1.01%), is rather low (See Chart-2).

Chart-3 : Distribution of works by procurement method

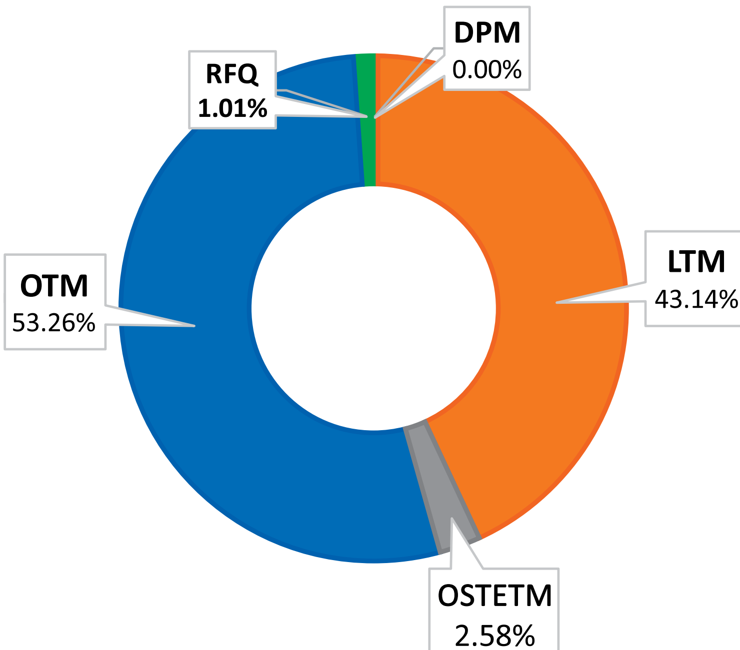

Market concentration

To assess the market concentration in the e-procurement system, we chose to study the business share of the top 5% and bottom 10% of the contractors/ suppliers over the years. The data shows that the market share of the top 5% of contractors/ suppliers increased from 18.24% in 2013 to 32.70% in 2021. This indicates that these top 5 percent of contractors wield considerable influence in the e-procurement landscape. The bottom 10 % market share is only 3 percent. (see Chart-3).

Chart-4 : Business share of top 5% and bottom 10% Contractors/Suppliers

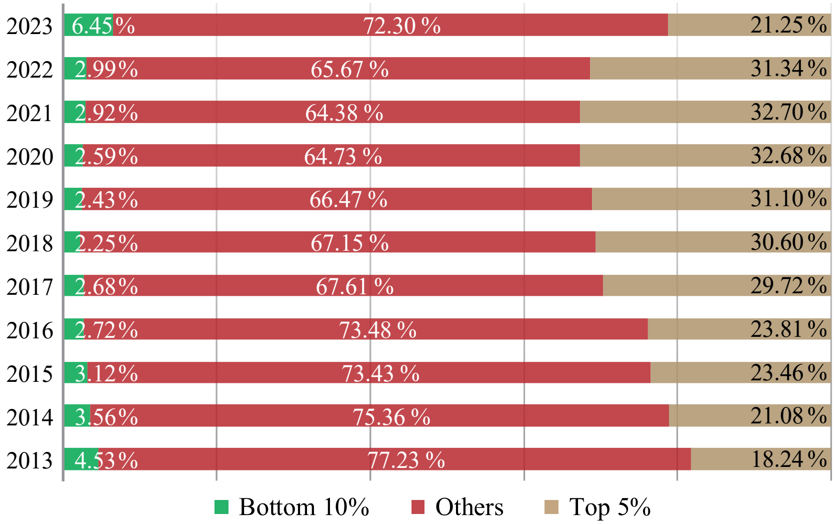

Average number of bids

The data shows a significant rise in the average number of tenders or proposals received, from only two in 2011 to 15.48. Notably also, while the average number of tenders rose from two to 8.57 in 2016, by 2019 it reached exponentially to 35.61, which could be considered as a trend towards higher level of transparency and competition (Chart 4). However, this rise is attributed to the growing popularity of the Limited Tender Method (LTM) compared to Open Tender Method (OTM). The standout year of 2017 witnessed a remarkable surge in interest and participation, a trend that continued until 2021 when it reached 35, following which it came down to 15.48 in 2023 (associated with Covid restrictions).The LTM garnered an average of 47.75 bids per tender(Chart 5), whereas the Open Tender Method (OTM) saw an average of only 3.54 bids and in declining trend(chart 6). This underscores LTM's popularity and preference over OTM, caused by market distortions associated with the 10% (+/-) rule in OTM and the 5% (+/-) rule combined with a lottery system in bid selection.[43]

[43] Ibid, WB (2020), Assessment of Bangladesh Public Procurement System.

Chart-5 : Average of No. of Tenders/Bids Received per year

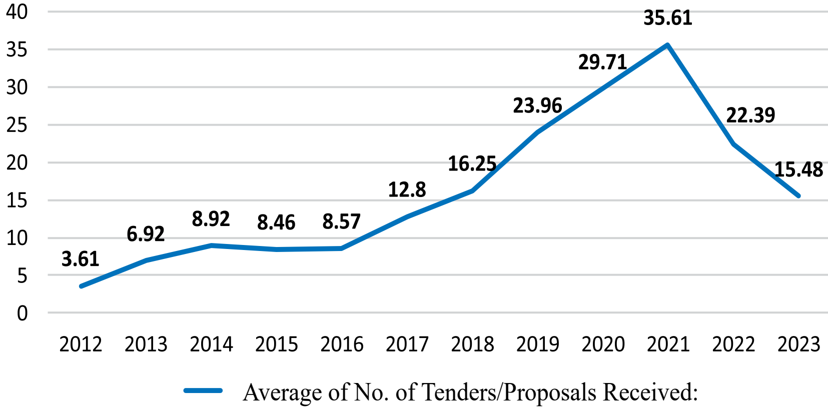

Chart 6 : Average of No. of Tenders/Bids Received per year in OTM

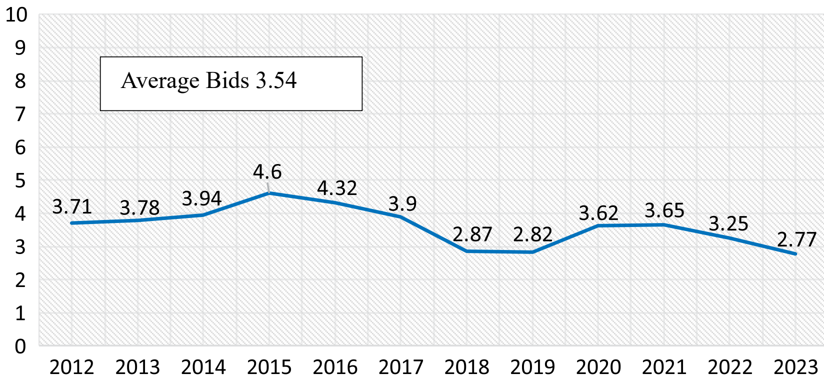

Chart 7 : Average of No. of Tenders/Bids Received per year in LTM

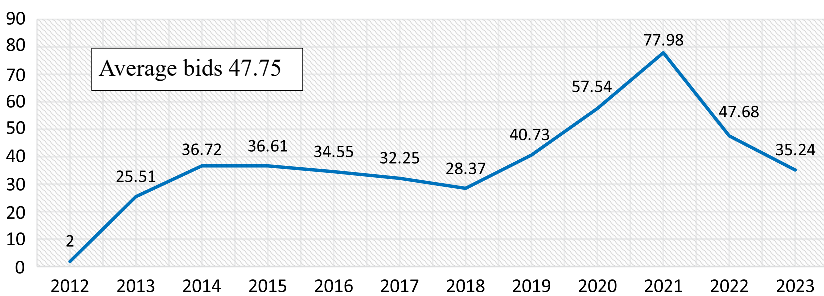

It may be noted that Section 32(a) of the Public Procurement Act 2006 states that the Limited Tendering Method may be used in the following cases, namely,-

i) *goods, related services, works or physical services by reason of their specialized nature are available only from a limited number of suppliers or contractors;*

ii) *in order to reduce stock requirement of spare parts and maintenance costs, if there is an established government policy regarding standardization of a brand;*

ii) *the time and cost required to receive and evaluate a large number of tenders would be disproportionate when compared to the value of the contract;*

Provided that for clauses (i) and (ii), no price limit shall apply and all supplies or contractors shall be invited to the tender, and that clause (iii) shall apply subject to use of enlisted suppliers or contractors and a price limit as prescribed.

Section 32 (a) prescribes three conditions for LTM, as explained below.

Specialized Nature: Limited Tendering Method may be used when the goods, related services, works, or physical services required are of such specialised nature that they are only available from a restricted number of suppliers or contractors. In these cases, it may not be feasible to have a wide-open competition due to the unique nature of the items or services.

Standardization Policy: Limited Tendering can also be applied if there is an established government policy concerning the standardisation of a particular brand. This is typically done to reduce the need for stocking various spare parts and lowering maintenance costs by ensuring uniformity.

Proportionate Evaluation: When the time and cost required to evaluate a large number of tenders would be disproportionate in comparison to the value of the contract, the Limited Tendering Method can be utilised. This provision recognises that for smaller contracts, an exhaustive evaluation process may not be cost-effective.

In essence, the law provides a framework for using the Limited Tendering Method in situations where fully open competition may not be practical or cost-effective, although in any case transparency and fairness must be ensured

in the procurement process. To test the extent of compliance we have examined the nature of works contracted under LTM. Data shows that 48% of works are categorized as repair & maintenance, 39% as construction-related. So it is apparent that most of the work did not need specialized skill and treatment.

Existing practice is contrary to what the law says about the use of a limited tendering method, thereby distorting the original purpose of the LTM method.[44] At the same time it compromises the scope of competitiveness.

Chart-8 : The predominance of lower number of bids

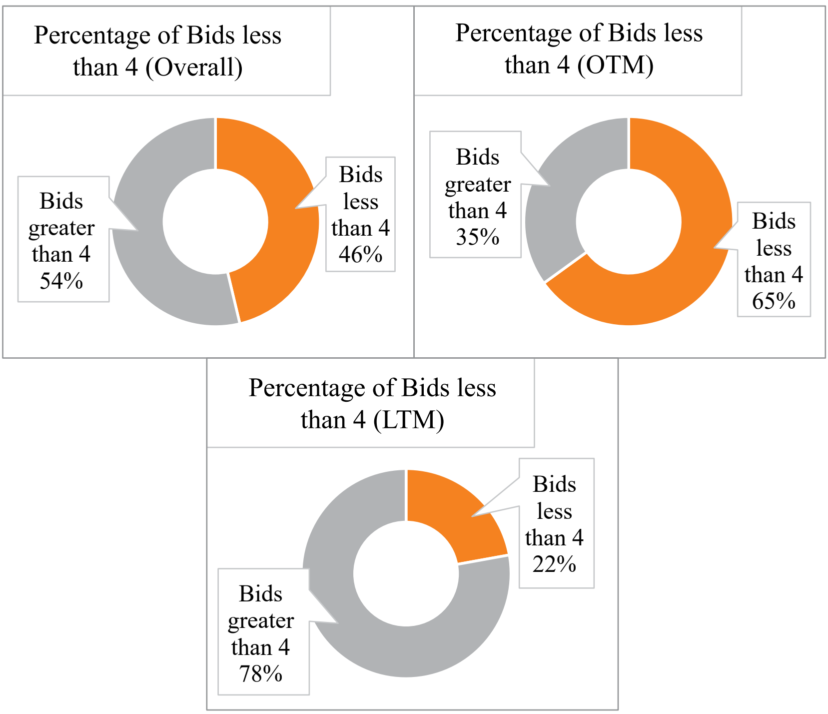

If we consider the World Bank threshold that every procurement contract should have at least 4 bids to be considered as a transparent procurement process,[45] we find that in Bangladesh, an overall proportion of 46% of the

[44] WB(2020), Assessment of Bangladesh Public Procurement System.

[45] Red Flags of Corruption' in World Bank Projects: An Analysis of Infrastructure Contracts by Charles Kenny and Maria Musatova

contracts had less than 4 bids, whereas 65% of OTM contracts had less than 4 bidders. Clearly, for these contracts, the competition among bidders was relatively low. When we examine the data in terms of the distribution of tenders by the number of biddings, we find that single bidding accounts for 87,831 deals, or approximately 20.73% of the total contracts. These contracts attracted only one bid during the procurement process, meaning that there was no competition. It means that approximately 1 out of every 5 contracts was awarded through a single bid. In the case of OTM contracts, the percentage of single bids is 26%, which means that 1 out of every 4 contracts awarded fell s under the single bid category (see Chart-6). However, in the case of LTM, this figure is only 11%.

Chart-9 : Percentage of number of bids per tender

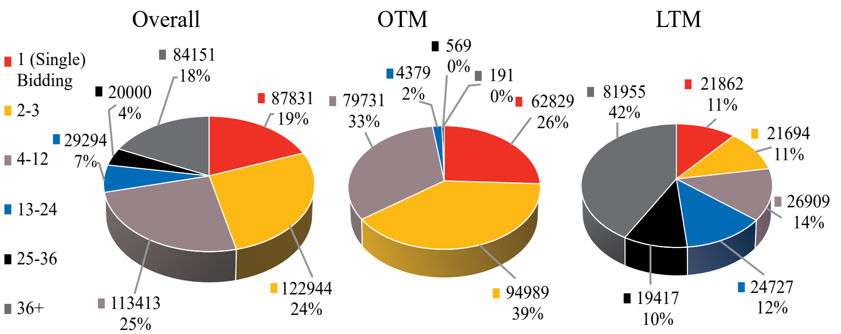

Local vs non-local bidder

Local contractors secured the lion's share of government contracts, representing about 70% of the total awards, while the remaining 30 percent went to non-local contractors(see Chart-7) . Research indicates that e-GP in Bangladesh has a modest impact on increasing the likelihood of local contractors winning contracts, with a range of 3.7% to 6.3%. In contrast, India experiences a more substantial increase of 11%, while Indonesia sees a remarkable 23% boost in winning chances due to e-procurement.[46] The question then arises: Why is the impact of e-procurement on local contractors in Bangladesh less significant compared to India and Indonesia? TIB's 2020 study on e-GP sheds light on this matter. Despite the introduction of e-GP, in specific instances, the allocation of

[46] Ibid, Blum et al. (2020) see (Page36) Table 8: SUMMARY OF IDENTIFIED E-PROCUREMENT IMPACTS ACROSS INDIA, INDONESIA, ANF BANGLADESH

contracts in certain areas of Bangladesh continues to be influenced by political factors or negotiations, which often prioritize local contractors.[47]

Chart- 10 : Local vs Non-Local Bidder Market Share

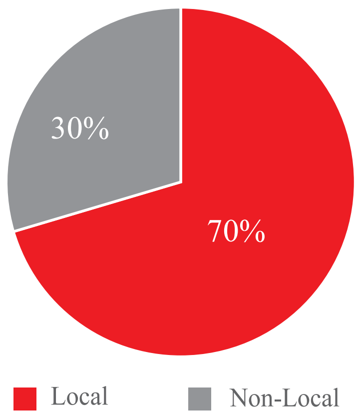

Monopolized winning bids by a single bidder

When a single company consistently secures a multitude of contracts, it raises a significant concern of compromised competitiveness, unless there is a compelling and transparent market advantage at play. Such a scenario can signify potential issues, such as a lack of healthy competition or a client's preference for one company based on prior interactions. In these cases, it becomes imperative to conduct a thorough and meticulous review.[48] We checked the data for companies that won most of the contracts. We have considered only those procuring entities which offered at least 20 contracts to a single bidder. We found some procuring entities, such as the "Office of the Principal, Hosenabad Technical School and College" and "Office of the Principal, Chuadanga Technical School and College," which have awarded 100% and 95.65% of their respective works to the same suppliers. Similarly, suppliers, like "M/S Dhaka Metal & Machinarise Store" secured (88% to 96%) and "M/s. Hai & Co. secured (72% to 75%), the contracts awarded by Chuadanga Technical School and College, Meherpur Technical School & College and Sales & Distribution Division-1 &5 BPDB

47 Ibid,

48 https://documents1.worldbank.org/curated/en/223241573576857116/pdf/Warning-Signs-of-Fraud-and-Corruption-in-Procurement.pdf

Sylhet respectively. This concentration of contracts suggests a potential lack of diversity, fairness and competition in the procurement process, leading to monopolistic capture of contracts.

Table-3 :Top 10 bidders who won the most contracts of a PE (at least 20 Contracts)

Ministry/ Division	Procuring Entity Name	Number of Works	Name of Supplier/ Contractor/ Consultant	Percent of work/ tender	Sum of Contract Value (in Crore Taka)
Ministry of Education	Office of the Principal, Hosenabad Technical School and College	25(25)	M/S Khaleque Enterprise	100.00%	1.16
Ministry of Education	Office of the Principal, Chuadanga Technical School and College	22(21)	M/S Dhaka Metal & Machinarise Store	95.65%	0.71
Local Government Division	Sreemangal Paurashava	21(20)	Abu Bakar Ahmed & Sons	95.45%	3.67
Ministry of Fisheries & Livestock	LRI Comilla	24(22)	Bangladesh Science House	92.31%	32.9
Power Division	Executive Engineer (Operation), Chandpur 150MW CCPP	27(24)	M/S Sharif & Brothers	90.00%	2.93
Ministry of Education	Office of the Principal, Meherpur Technical School & College	29(25)	M/S Dhaka Metal & Machinarise Store	87.88%	0.94
Local Government Division	Upazila Parishad, Godagari, Rajshahi	33(25)	m/s. soniaenterprise	76.74%	2.43

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

Ministry/ Division	Procuring Entity Name	Number of Works	Name of Supplier/ Contractor/ Consultant	Percent of work/ tender	Sum of Contract Value (in Crore Taka)
Power Division	Sales & Distrbution Division-1, BPDB, Sylhet.	53(40)	M/s. Hai & Co.	75.71%	4.44
Power Division	Sales and Distribution Division-5, BPDB, Sylhet.	76(55)	M/s. Hai & Co.	72.38%	4.42
Ministry of Environment, Forest and Climate Change	Tangail Forest Division	22(17)	M/S. M.R. Enterprise	70.97%	2.55

Figures in parentheses indicate the winning number of contracts out of PE's total number of contract awarded through e-GP

Table-4 : Top 10 bidders who won most of the contracts of a PE Order by Contract Value (Minimum 60% Work/Tender)

Ministry/ Division	Procuring Entity Name	Number of Works	Name of Supplier/ Contractor/ Consultant	Percent of work/ tender	Sum of Contract Value (in Crore Taka)
Ministry of Fisheries & Livestock	LRI Comilla	24(22)	Bangladesh Science House	92.31%	32.9
Power Division	Sales & Distribution Division-4. Sylhet	54(35)	M/s. Hai & Co.	64.29%	4.99
Power Division	Sales & Distrbution Division-1, BPDB, Sylhet.	53(40)	M/s. Hai & Co.	75.71%	4.44
Power Division	Sales and Distribution Division-5, BPDB, Sylhet.	76(55)	M/s. Hai & Co.	72.38%	4.42

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

...পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পরের অংশ

Ministry/ Division	Procuring Entity Name	Number of Works	Name of Supplier/ Contractor/ Consultant	Percent of work/ tender	Sum of Contract Value (in Crore Taka)
Power Division	Sales & Distribution Division-3, Sylhet.	67(44)	M/s. Hai & Co.	65.05%	4.37
Local Government Division	Office of the Jhalokathi Pourashava, Jhalokathi	23(16)	M/S Hiramon Service Network	63.89%	4.29
Local Government Division	Sreemangal Paurashava	21(20)	Abu Bakar Ahmed & Sons	95.45%	3.67
Power Division	Executive Engineer (Operation), Chandpur 150MW CCPP	27(25)	M/S Sharif & Brothers	90.00%	2.93
Road Transport and Highways Division	Administration and Establishment Division	50(35)	M/S. Mir Brothers	69.44%	2.93
Ministry of Education	Office of the Principal, Thakurgaon Polytechnic Institute	31(20)	M/s. samir datta	64.58%	2.81

Figures in parentheses indicate the winning number of contracts out of PE's total number contract awarded through e-GP

The above list further demonstrates a single supplier dominance, such as "LRI Comilla" and BPDB's "Sales & Distribution Divisions" in Sylhet, a single supplier, namely "Bangladesh Science House"(92.31%) and "M/s. Hai & Co.(64 % to 75%)," that consistently secured a major number of the contracts. This trend in which a single supplier secures a significant percentage of the contracts impedes fair competition and promotes monopolistic practices.

Single bidding pattern in e-procurement

A single bidding scenario occurs when a contract is awarded through a tender process with the participation of only one bidder in a competitive market. This situation serves as a clear indicator of restricted competition within public tenders.[49] It often raises concerns about potential corruption in public procurement, as corrupt practices are more likely to emerge and sustain when there is only one company participating in the bidding process. Such limited competition can hinder transparency and fairness in procurement, underscoring the importance of fostering a competitive environment to mitigate corruption risks.[50]

Chart-11 : Percentage of Single Bid by Year

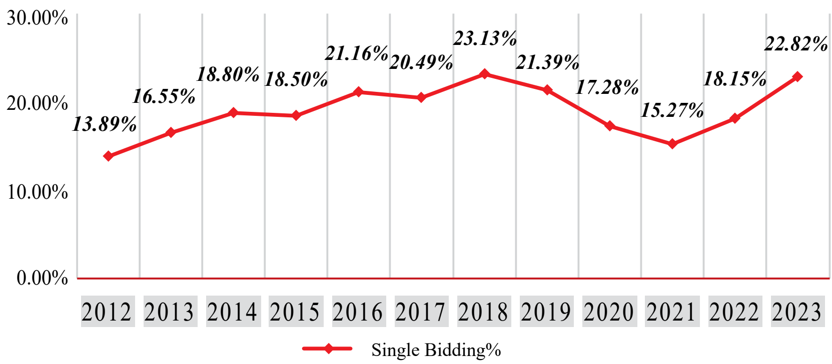

Our analysis of the data set shows a generally increasing trend in the percentage of single bids during the period (Chart 10). While there have been some variations from year to year, 2018 marked a peak of 23.13 percent of single bids. In 2021, the share of single bids dropped to 15.27%, the lowest for period, but before it could be treated to be of significance, it increased again in 2023 to 22.82%. Our analysis reveals 92 procuring entities where a substantial 75% of tenders resulted in single bids. Additionally, 416 contractors exhibited a single-bid percentage of at least 75%. Notably, contracts worth a total of BDT 60,069 crore were awarded through single bidding. Notably,

[49] Nicholas Charron, Carl Dahlström, Viktor Lapuente, Mihály Fazekas (2017). Careers, Connections, and Corruption Risks: Investigating the Impact of Bureaucratic Meritocracy on Public Procurement Processes. The Journal of Politics, Vol. 79, No. 1, January 2017. URL: http://www.jstor.org/stable/10.5699/slaveasteurorev2.95.issue-1

[50] A. Abdou, O. Basdevant, E. Dávid-Barrett, and M. Fazekas (May 2022) Assessing Vulnerabilities to Corruption in Public Procurement and Their Price Impact.

single bidding is more prevalent in the goods purchase (24.55%), as opposed to works (18.42%).

Chart-12 : Single Bid Trend for Works

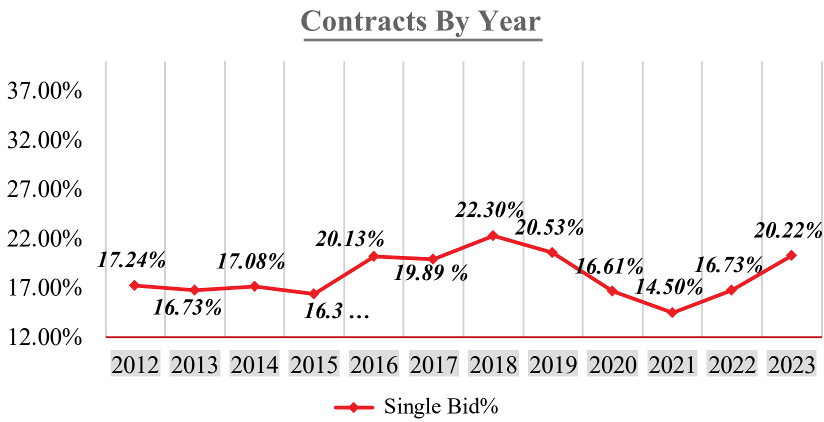

Chart-13 : Single Bid Trend for Goods

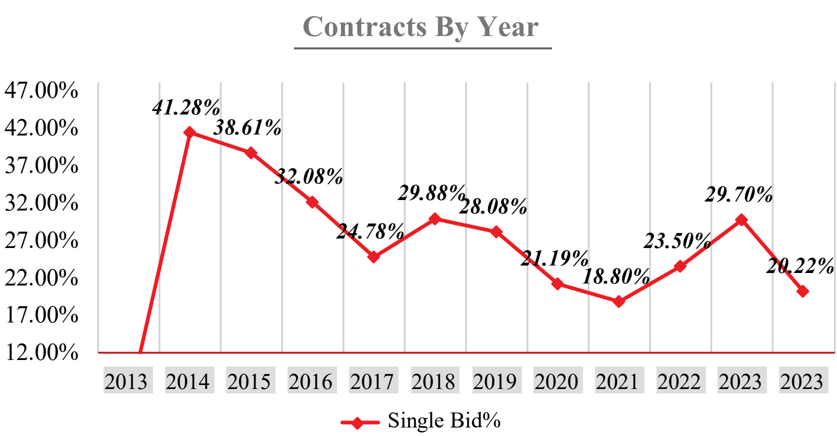

We found that there are procuring entities where 100% of contracts are awarded through single bidding. Several entities, such as the Office of the Upazila Engineer in Noakhali Sadar, Sales and Distribution Division of BPDB in Habiganj, and Office of the Sonaimuri Pourashava in Noakhali, have a single-bid percentage of 100%. This means that all the tenders conducted by these entities during the period studied received only one bid. This lack of

competition can potentially raise questions about transparency in the bidding process (see table-5). Many other entities also exhibit extremely high single-bid percentages, often surpassing 99%. For instance, the Workshop Division in Feni, Sales and Distribution Division-5 of BPDB in Sylhet, and Sales & Distribution Division-3 in Sylhet, all have single-bid percentages close to 100%. This shows a normalization of limited competition in procurement process.

Table-5 : Top 10 Procuring Entities with the most Single Bids

Procuring Entity Name	Number of Works	Total Contract Value (in Crore Tk)	Single_ Bid%	Sum of Contract Value (in crore Taka) of Single Bid
Office of the Upazila Engineer,Noakhali Sadar,Noakhali.	**154**	12.09	**100.00%**	12.09
Sales and Distribution Division, BPDB, Habiganj.	**39**	1.44	**100.00%**	1.44
Office Of The Sonaimuri Pourashava, Noakhali	**29**	2.2	**100.00%**	2.20
Sales and Distribution Division, Patharghata, BPDB, Chittagong	**22**	0.53	**100.00%**	0.53
Madhabdi Pourashava	**13**	7.73	**100.00%**	7.73
PIU Office of Gournadi Pourashava, Barishal	**11**	15.14	**100.00%**	15.14
Office of the Mayor, Gournodi Paurashava, Barishal	**10**	2.45	**100.00%**	2.45
Workshop Division, Feni	**202**	10.77	**99.50%**	10.74
Sales and Distribution Division-5, BPDB, Sylhet.	**105**	5.66	**99.05%**	5.62
Sales & Distribution Division-3, Sylhet.	**103**	6.17	**99.03%**	6.10

A closer look at the data on over 60% share of single bidders helped us identify the extent of monopolistic control of contracting entities. The Comilla

PWD Division in Comilla Office of the Project Director (DSCC-IURIDS) had a single-bid percentage of 66%, suggesting that around two-thirds of their tenders attracted only one bidder. The Narayangonj PWD Division in Narayangonj and Office of the Executive Engineer - MCC-DSCC had single-bid percentage of 89.49%, implying a more pronounced lack of competition in their procurement process. The Office of the Project Director (DSCC-NDDMP) also had high single-bid percentage of 84.38. This suggests that while limited competition is prevalent, it has not necessarily resulted in lowering the contract values (see Table 6).

Table-6 : Top 10 Procuring Entities with the most Single Bids Order by Contract Value (Minimum 60% Single Bid)

Procuring Entity Name	Number of Works	Single_ Bid%	Total Contract Value (in Crore Tk)	Sum of Contract Value (in crore Taka) of Single Bid
Comilla PWD Division, Comilla	1075	65.67%	841.31	379.61
Office of the Project Director (DSCC-IURIDS)	66	66.67%	694.36	496.06
Narayangonj PWD Division, Narayangonj	666	89.49%	595.54	324.78
Office of the Executive Engineer, Noakhali Zone	751	80.56%	480.17	383.06
PWD Wood Workshop Division	1085	73.36%	416.99	238.97
Office of the Project Director(DSCC-NDDMP)	32	84.38%	411.38	345.38
Office of the Project Director(RDRIDF-DSCC)	46	78.26%	370.71	302.94
PWD EM Workshop Division	1090	74.40%	329.36	184.82
Office of the Executive Engineer - MCC-DSCC	19	89.47%	294.86	261.18
Office of the Executive Engineer (Zone-4)	129	64.34%	276.78	183.85

Top 10 Contractors winning the most single bids

The table 7 shows the top ten contractors who won the most single bids ranging from 97 to 100 percent. It also shows the amount of money involved.

Table-7 : Top 10 Contractors winning the most single bids

Name of Supplier/ Contractor/ Consultant	Number of Works	Single_ Bid%	Total Contract Value (in Crore Tk)	Sum of Contract Value (in crore Taka) of Single Bid
M/A EKBAL ENTERPRISE	21	100.00%	1.98	1.98
M/S Kapashia Construction	25	100.00%	0.75	0.75
M/S. Akbar & Sons	33	100.00%	1.37	1.37
M/S. NOMAN ENTERPRISE	31	100.00%	1.48	1.48
M/S NUPUR ENTERPRISE	468	99.15%	24.98	24.80
M/s.Babul Enterprise	73	98.63%	3.78	3.73
M/S N M ENTERPRISE	56	98.21%	4.6	4.56
M/S. SHAHABUDDIN ENTERPRISE	51	98.04%	1.32	0.96
M/S. Taha Construction	38	97.37%	0.85	0.82
HAZARA & SONS	34	97.06%	1.3	1.27

When we analysed the contractor data with contract value and 60% of single bidding, a new list of big contractors' name emerged , who won contracts through single bidding. Navana Limited (89.47%), M/S S.R. Enterprise (85%), and M/S. Fawn International (77.78%), had the highest single-bid percentages, as shown in table 8. They are followed by Max Infrastructure Ltd. (69%) and Creative Engineers Ltd. (67.35%). The table shows that for a significant portion of works of the contracting entities, only one bid was submitted during the tendering process. It also shows that high value contracts attract single bidding from big contractors.

Table-8 : Top 10 Contractors with most single bids (60% of single bids)

Name of Supplier/ Contractor/ Consultant	Number of Works	Single_ Bid%	Total Contract Value (in Crore Tk)	Sum of Contract Value (in crore Taka) of Single Bid
MAX INFRASTRUCTURE Ltd.	39	69.23%	586.73	219.45
Navana Limited	152	89.47%	219.42	189.12
M/S AHSAN ENTERPRISE	147	61.90%	175.62	145.73
Creative Engineers Ltd	164	67.07%	214.05	126.20
Rangs Limited	110	64.55%	618.29	117.78
M/S S.R. Enterprise	127	85.04%	117.85	103.48
M/S. Fawn International	18	77.78%	151.4	103.04
M/S Bokshi Enterprise	98	67.35%	107.93	78.84
M/S Bhuiyan Builders	106	60.38%	103.36	74.83
M/S Telikhali Construction	34	70.59%	98.58	74.32

Geographical distribution of Single Bidding

The data set reveals that in Feni and Noakhali districts, half of all contracts are awarded through single-bid procurement processes. Comilla and Narayanganj follow closely, with one-third of the contracts being awarded through single-bid procurement.Dhaka ranks fifth among the districts with the highest percentage of contracts awarded through single-bid procurement (see Maps 1 & 2). Shariatpur had the lowest percentage of contracts awarded through single-bid procurement, accounting for only 4.68% of contracts in this category. Thakurgaon, Sherpur, Bogura, and Lalmonirhat districts follow closely, with 5.68% to 6.54% of contracts secured through single bids. Laksmipur, Chapai Nawabganj, Brahmanbaria, Naogaon, and Natore districts exhibit similar patterns, with single-bid percentages ranging from 6.67% to 7.30%. Overall, these districts seem to have a relatively lower prevalence of single-bid procurement compared to other regions, indicating a healthier competitive environment in their public procurement processes compared to the regions having higher concentration of single-bidding.

MAP-1 : District wise Single bidding

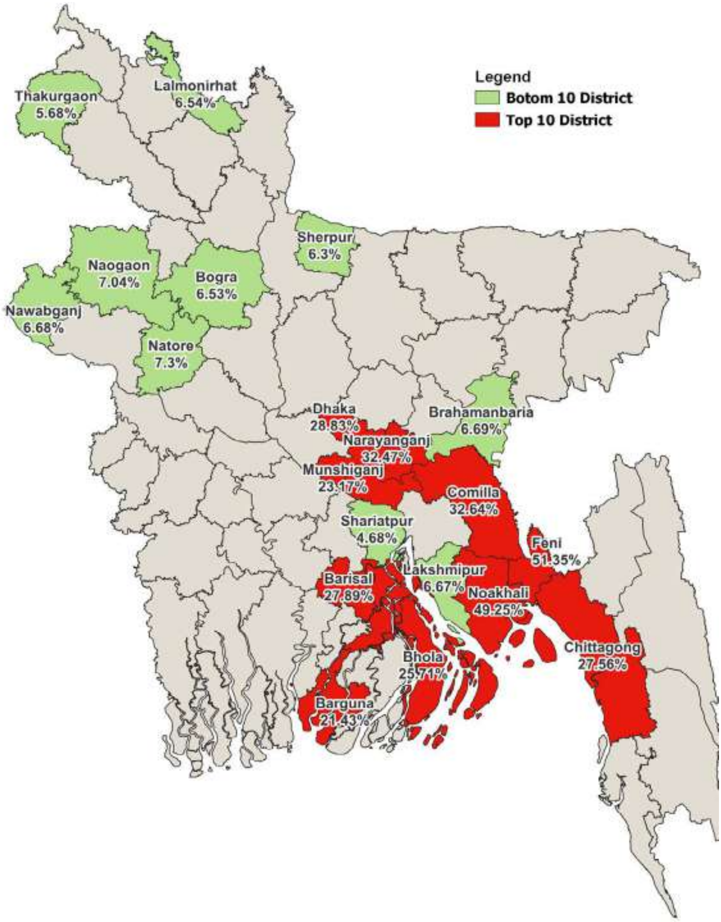

Top 6 Single Bid Contracts

Table 9 shows the highest value single-bid contracts, each exceeding a value of 100 crore. On top is a multi-storied construction project valued at 176 crore, which attracted only one bid. Azimpur PWD division awarded this project to Padma Associates & Engineers LTD based on single bid. Following closely, the second-highest contract, valued at 153 crore, was awarded to Mazid and Sons Construction Ltd by Rajshahi University, with only one bidder. The third notable contract, valued at 137 crore, involved the construction of a ten-story administrative building for Chittagong University, also having only one bidder. The two other highest value single-bid contracts are listed in the table below.

Table-9 : Top 6 Single Bid Contracts (in terms of value)

Brief Description of Contract	Contract Value (in Crore Taka)	Name of Supplier/ Contractor/ Consultant	Procuring Entity Name
Construction of Multi storied residential Flat for Government officers in Azimpur Gov. (Package No W-5). FY: 2019-20	176.19	Padma Associates & Engineers Ltd.	Azimpur PWD Division, New Market, Dhaka
Construction of 20 Storied Central Science Building.	153.67	Mazid Sons Construction Ltd.	Office of the Project Director, Rajshahi University
Construction of a Ten Storied Administrative Building	137.42	MJCL-MNHCL(JV)	Project Office, Jahangirnagar University
Procurement of SUV (Jeep) (2000cc - 2700cc)	126	Pragoti Industries Limited	Transport Section, Police. Headquarters, Dhaka
Construction of one 12-storied, three 10 storied building and one 8-storied building at, Nasirabad Housing Society,	106.21	M Jamal & Company Limited	Maintenance Circle, Dhaka
Pavement Widening, Strengthening, Raising, RCC Box Culvert, Protective Work, etc of Joydebpur - Tangail - Jamalpur Road (N-4) (Ch. 100+520 to 115+520) Under Tangail Road Division.	101.96	Wahid Construction Ltd.	Jamalpur Circle

Single Bidding in City Corporations

This section provides insights into the prevalence of single-bid procurement across various city corporations in Bangladesh. Among all the city corporations,

Chittagong City Corporation has the highest percentage of contracts awarded through single-bid procurement, accounting for approximately 62.70% of its contracts. Dhaka South City Corporation follows closely, with 55.21% of its contracts falling into the single-bid category. On the other hand, Cumilla City Corporation has the lowest percentage of contracts awarded through single-bid procurement, with only 5.04% of its contracts in this category. Other city corporations, such as Khulna, Sylhet, and Dhaka North City Corporation, also have relatively low percentages of single-bid contracts, indicating a relatively better competitive procurement environment in these areas.

Table-10 : Single Bidding in City Corporations

Agency	Number of Works	Sum of Contract Value (in Crore Taka)	Single_ Bid%
Chittagong City Corporation	1496	1304.91	62.70%
Dhaka South City Corporation	1431	4955.08	55.21%
Mymensingh City Corporation	166	707.53	42.17%
Gazipur City Corporation	634	3462.61	32.18%
Narayanganj City Corporation	204	764.65	31.37%
Rajshahi City Corporation	316	1628.66	19.94%
Dhaka North City Corporation	1703	4790.34	8.28%
Sylhet City Corporation	821	1393.18	7.55%
Khulna City Corporation	1593	982.77	6.91%
Comilla City Corporation	119	323.97	5.04%

Single Bidding in Municipalities

Sonaimuri Paurashava stands out as having all of its contracts awarded through single-bid procurement, indicating virtually no competition in its procurement processes. Barguna Paurashava follows closely, with 95.24% of its contracts falling into the single-bid category. Dagonbhuiyan Paurashava, Madhabdi Pourashava in Norshingdi, and Nangalkot Paurashava also have relatively high percentages of single-bid contracts, at 94.23%, 88.00%, and 87.50% respectively. All other municipalities listed in tables 11 and 12 below, also show high rates of single bidding both in terms of number and value of contracts.

Table-11 : Single bidding prone Top 10 municipalities

Agency	Number of Works	Sum of Contract Value (in Crore Taka)	Single_ Bid%
Sonaimuri Paurashava	29	2.2	100.00%
Barguna Paurashava	21	21.81	95.24%
Dagonbhuiyan Paurashava	52	8.09	94.23%
Madhabdi Pourashava, Norshingdi	25	11.35	88.00%
Nangalkot Paurashava	24	4.18	87.50%
Basurhat Paurashava	22	4.8	81.82%
Chowmuhani Pourashava	227	33.46	79.74%
Jhalokathi Paurashava	69	16.49	79.71%
Pabna Paurashava	26	94.05	73.08%
Kahaloo Paurashava	26	1.53	65.38%

Table-12 : Single bidding prone Top 10 municipalities (contract value & 60% single Bidding)

Agency	Number of Works	Sum of Contract Value (in Crore Taka)	Single_Bid%
Pabna Paurashava	26	94.05	73.08%
Jhenaidah Paurashava	35	37.1	62.86%
Chowmuhani Pourashava	227	33.46	79.74%
Barguna Paurashava	21	21.81	95.24%
Jhalokathi Paurashava	69	16.49	79.71%
Madhabdi Pourashava, Norshingdi	25	11.35	88.00%
Dagonbhuiyan Paurashava	52	8.09	94.23%
Basurhat Paurashava	22	4.8	81.82%
Nangalkot Paurashava	24	4.18	87.50%
Sreemangal Paurashava	22	3.71	63.64%

Road Transport and Highways Division

The data summarized in table 13 reveals a notable pattern of single-bid procurement within Road Transport and Highway Division, particularly contracts relating to workshops, equipment, and ferry services in different regions of Bangladesh. In several cases, such as the Workshop Division in Feni and Tejgaon, Dhaka, an overwhelming majority of contracts, close to 100%, are awarded through single bids, indicating a lack of competition. Similarly, the Ferry Division, Barisal, and Ferry Maintenance Division in Dhaka also show a high prevalence of single-bid awards.

Table-13 : Single bid prone RTHD entities (60% single bid)

Procuring Entity Name	Number of Works	Sum of Contract Value (in Crore Taka)	Single_ Bid%
Workshop Division, Tejgaon, Dhaka	1631	87.15	98.71%
Procurement & Storage Division, Dhaka	579	74	93.44%
Equipment Control Division, Dhaka	468	45.25	73.08%
Ferry Construction Division, Dhaka	464	38.84	80.39%
Ferry Maintenance Division, Dhaka	732	37.36	87.84%
Ferry Division, Barisal	781	36.35	96.93%
Ferry Division, Patuakhali	786	34.29	90.20%
Ferry Division, Khulna	502	28.54	86.25%
Workshop Division, Chittagong	255	12.32	92.94%
Workshop Division, Feni	198	10.73	99.49%

Single bidding in the Ministry of Housing and Public Works

The data presents a significant concentration of single-bid procurement in various Public Works Department (PWD) divisions, primarily in the Dhaka region. Narayangonj PWD Division in Narayangonj leads the list with high single-bid percentage of 89.49%, indicating a virtual lack of competitive participation in the tendering process. Chandpur PWD Division and PWD Resource Division in Dhaka also exhibit a high prevalence of single-bid awards, with percentages exceeding 80%. These numbers point to potential

issues with competition and transparency within the procurement procedures of these PWD divisions (see Table: 14 & 15).

Table-14 : Single bid prone PWD entities (60% single bid)

Procuring Entity Name	Number of Works	Sum of Contract Value (in Crore Taka)	Single_Bid%
Narayangonj PWD Division, Narayangonj	666	595.54	89.49%
Chandpur pwd division	574	200.59	83.97%
PWD Resource Division, Dhaka	469	142.59	80.81%
PWD EM Division-9, Dhaka	489	98.95	78.53%
PWD EM Division-8, Dhaka	1731	227.54	75.68%
PWD EM Workshop Division	1090	329.36	74.40%
PWD Wood Workshop Division	1085	416.99	73.36%
PWD EM Division-10, Dhaka	632	161.99	72.94%
Comilla PWD Division, Comilla	1075	841.31	65.67%
PWD EM Division-3, Dhaka	953	254.73	63.90%

Table-15 : Single bid prone PWD entities (contract value & 60% of single bid)

Procuring Entity Name	Number of Works	Sum of Contract Value (in Crore Taka)	Single_Bid%
Comilla PWD Division, Comilla	1075	841.31	65.67%
Narayangonj PWD Division, Narayangonj	666	595.54	89.49%
PWD Wood Workshop Division	1085	416.99	73.36%
PWD EM Workshop Division	1090	329.36	74.40%
PWD EM Division-3, Dhaka	953	254.73	63.90%
PWD EM Division-8, Dhaka	1731	227.54	75.68%
Gopalganj PWD Division	444	209.36	61.26%
Chandpur pwd division	574	200.59	83.97%
Norshingdi PWD Division, Norshingdi	451	169.35	62.08%
PWD EM Division-10, Dhaka	632	161.99	72.94%

Table-16 : Single bid winning contractors of Ministry of Housing and Public Works

Contractor	Number of Works	Single bid Percentage	Total Contract Value (Core BDT)	Total single bid Contract Value (Core BDT	PE
Padma associates and Engineers Limited	94	55.32%	690.90	232.49	PWD EM Division-8 Dhaka
MSS. Amanat Enterprise	537	46.93%	436.17	156.91	PWD EM Division-8 Dhaka
National Development Enineers limited	28	50.00%	547.93	143.65	PWD EM Division-4 Dhaka
MSS. Kohinur Enterprise	122	83.61%	150.25	124.96	PWD EM Division-4 Dhaka
M. Jamal & company LTD	11	9.09%	755.27	106.21	PWD EM Division-2, Segunbagicha Dhaka

Padma Associates and Engineers Limited were involved in 94 contracts, and 55.32% of these contracts were awarded through single-bid procurement. In terms of value, it is a top contractor in the Ministry of Housing and Public Works. MSS. Amanat Enterprise has participated in 537 contracts, with a relatively lower single-bid percentage of 46.93%. National Development Engineers Limited participated in 28 contracts, with 50 percent of them being awarded through single-bid procurement. MSS. Kohinur Enterprise was involved in 122 contracts, with a high single-bid percentage of 83.61%.

Concluding observations

1. Despite being introduced 12 years ago, e-tendering in Bangladesh covers only 25-40% of government procurement. Nearly all high value contracts are excluded from its scope.
2. The majority of e-procurement contracts (99%) fall within the Taka 1 to 25 crore value range.
3. Ten ministries and divisions account for 92% of the total number of works and nearly 97% of e-contract value, with the Local Government Division being the highest spender.
4. The top 5% of contractors control nearly 30% of e-contracts, and their market dominance is on the rise.
5. E-procurement sees an overall increase in the average number of bids, but the Open Tendering Method (OTM) receives only 3.54 bids per tender on average, while Limited Tendering Method (LTM) attracts 47.75 bids per tender.
6. The 10% price cap in the OTM promotes LTM, which requires no prior experience, is distorting potentials of market competition.
7. Approximately 46% of contracts receive fewer than 4 bids overall, with 65% of OTM contracts having less than 4 bidders, indicating low competition.
8. About 20.73% of all contracts are single bids, meaning one in five contracts is awarded through a single bid.
9. In OTM contracts, 26% are single bids, highlighting the prevalence of single-bid awards.
10. Local contractors secure around 70% of government contracts, while non-local contractors receive the remaining 30%.
11. The total value of single-bid contracts amounted to 600 billion BDT during the period, representing 15% of the total e-contract value.
12. There are 92 procuring entities where a significant 75% of tenders result in single bids, and 416 contractors have a single-bid percentage of at least 75%.

13. Feni and Noakhali districts have half of all contracts awarded through single-bid processes, with Comilla and Narayanganj following closely at one-third.
14. Chittagong City Corporation tops the list with approximately 62.70% of contracts awarded through single-bid procurement, followed by Dhaka South City Corporation at 55.21%.
15. Sonaimuri Paurashava has all contracts awarded through single-bid procurement, indicating no competition, while other Paurashavas like Barguna Dagonbhuiyan, Madhabdi, and Nangalkot also have high percentages of single-bid contracts.

Recommendations

1. All contracts of higher value currently not covered under e-GP should be expeditiously included in the e-tendering process.
2. The present practice of price caps in Open Tender Method (OTM) and Limited Tender Method (LTM) should be stopped to ensure open and fair competition and optimal value for money.
3. Overhaul the practices related to limited tendering methods (LTM), aligning them with the provisions of the Public Procurement Act of 2006.
4. To ensure open and fair competition and prevent potential collusions, procuring entities with a high incidence of single bidding should be subject to rigorous scrutiny by the relevant authorities.
5. All procuring entities as well as CPTU should attach high priority to adopt and enforce specific procedural measures to enhance competition.
6. The opportunity created by the e-GP system to promote a transparent, accountable fair, competitive and corruption-free procurement system should be regularly monitored and upgraded by implementing data-driven analysis for decision-making.

Annexure-1

Data Variables in each Contract

CONTRACT AWARDS DETAILS

1. Ministry/Division
2. Agency
3. Procuring Entity Name
4. Procuring Entity Code
5. Procuring Entity District
6. Contract Award for
7. Tender/Proposal ID
8. Invitation/Proposal Reference No.

KEY INFORMATION

9. Procurement Method

FUNDING INFORMATION

10. Budget and Source of Funds
11. Development Partner (if applicable)

PARTICULAR INFORMATION

12. Project/Programme Name (if applicable)
13. Tender/Proposal Package No.
14. Tender/Proposal Package Name
15. Date of Advertisement
16. Date of Notification of Award
17. Date of Contract Signing
18. Proposed Date of Contract Start
19. Proposed Date of Contract Completion
20. No. of Tenders/Proposals Sold
21. No. of Tenders/Proposals Received
22. Tenders/Proposals Responsive

INFORMATION ON AWARD

23. Brief Description of Contract
24. Contract Value (Taka)
25. Name of Supplier/Contractor/Consultant
26. Location of Supplier/Contractor/Consultant
27. Location of Delivery/Works/Consultancy
28. Was the Performance Security provided in due time?
29. Was the Contract Singed in due time?

ENTITY DETAILS

30. Name of Authorised Officer
31. Designation of Authorised Officer

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেবা খাত

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

মো. নেওয়াজুল মওলা, মো. সহিদুল ইসলাম ও মো. সাজ্জাদুল করিম

প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। কার্যকর ও টেকসই চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার (চিহ্নিত ও পৃথককরণ, সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন এবং অপসারণ) ঘাটতির কারণে পরিবেশদূষণ, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্যঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদন অনুযায়ী, শয্যাপ্রতি দৈনিক গড়ে উৎপন্ন চিকিৎসাবর্জ্যের পরিমাণের হিসাবে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।[১] বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাকের সাম্প্রতিক একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রতি মাসে প্রায় ৭ হাজার ৪৪০ টন চিকিৎসাবর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার অধিকাংশই সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতাভুক্ত নয়।[২] জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১১.৬-তে নগরসমূহে সব ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং উৎপন্ন বর্জ্যের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত প্রভাব কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।[৩] এ ছাড়া অভীষ্ট ৩, ৬, ৮, ১২ ও ১৩ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিত করতে টেকসই চিকিৎসাবর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮) হাসপাতালে দৈনিক উৎপাদিত চিকিৎসাবর্জ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণসহ তা ব্যবস্থাপনায় কার্যকর পদ্ধতি গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার নির্দেশনা প্রদান করেছে।[৪]

প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় (২০২১-২০২৪) জনস্বাস্থ্যের নিরাপত্তা নিশ্চিতে বিভিন্ন দেশে প্রচলিত ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশে একটি পরিকল্পিত চিকিৎসাবর্জ্য অপসারণব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।[৫] পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নে হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণব্যবস্থাকে প্রথম একটি নতুন ক্ষেত্র হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং পরবর্তী সবগুলো পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় চিকিৎসাবর্জ্য অপসারণের আগে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় পরিশোধন ও ব্যবস্থাপনার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। কিন্তু অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০২০-২০২৫) পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকি সৃষ্টিকারী চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার উল্লেখ রয়েছে।[৬] ইতিপূর্বে টিআইবির একটি গবেষণায় চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা চিহ্নিত হয়।[৭] পাশাপাশি চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ধারাবাহিক ব্যর্থতা এবং সুশাসনের ঘাটতিসংক্রান্ত প্রতিবেদন গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যস্থাপনার বিদ্যমান কাঠামো এবং এ ক্ষেত্রে গৃহীত কার্যক্রম সুশাসনের দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে।

---

* ২০২২ সালের ১৩ ডিসেম্বর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো–

- চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধি পর্যালোচনা এবং তা প্রতিপালনে সীমাবদ্ধতা ও চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা;
- চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, কারণ ও মাত্রা চিহ্নিত করা এবং
- গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে অধিকতর সুশাসনের জন্য সুপারিশ প্রস্তাব করা।

গবেষণার পদ্ধতি

এটি একটি মিশ্র পদ্ধতির (গুণগত ও পরিমাণগত) গবেষণা। গুণগত ও পরিমাণগত পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

তথ্যের উৎস: প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার লক্ষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উৎস অনুযায়ী তথ্যের ধরন ও তথ্যের উৎসসহ তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি সারণি-১-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণি-১ : তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

তথ্যের ধরন	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি	তথ্যের উৎস
প্রত্যক্ষ তথ্য	মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার	হাসপাতাল, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী
	জরিপ	সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান**
		চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী***
	পর্যবেক্ষণ	সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা এবং ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান
পরোক্ষ তথ্য	বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা	সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নির্দেশিকা; সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন; প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন; রেকর্ড বুক; গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য

**এই গবেষণায় ঠিকাদার বলতে চিকিৎসাবর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এ বর্ণিত 'দখলদার', যেমন সমিতি, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যারা লাইসেন্স গ্রহণ বা আইনগত চুক্তির মাধ্যমে বর্জ্য সংগ্রহ, পরিবহন, পরিশোধন এবং অপসারণের সাথে জড়িত।

***চিকিৎসা বর্জ্যকর্মী বলতে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন অনুযায়ী- হাসপাতালের ওয়ার্ডবয়, আয়া, কুক, ক্লিনার/পরিচ্ছন্নতাকর্মী; সিটি করপোরেশন/পৌরসভার ক্লিনার/পরিচ্ছন্নতাকর্মী; ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বর্জ্যকর্মী ইত্যাদি ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়েছে।

প্রত্যক্ষ তথ্য : প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, জরিপ ও পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা হয়েছে। গবেষণার বিষয়বস্তুর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত ব্যক্তি, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান ও সাবেক কর্মীসহ হাসপাতাল, সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা; ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, বিশেষজ্ঞ ও গণমাধ্যমকর্মীদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গুণগত ও পরিমাণগত তথ্য সরাসরি সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণে চেকলিস্ট ব্যবহার করা হয়েছে। এ ছাড়া হাসপাতাল, সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এবং এসব প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাবর্জ্য কর্মীদের সাথে জরিপ সম্পন্ন করা হয়েছে।

জরিপের নমুনায়ন-পদ্ধতি : জরিপের জন্য নমুনা নির্বাচনে বহুপর্যায় বিশিষ্ট স্তরায়িত নমুনায়ন (Multi Stage Sampling) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বাংলাদেশের জেলাগুলো থেকে ৪৫টি জেলা নির্বাচন করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত জেলার অন্তর্ভুক্ত ৪৭টি সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা এলাকাকে গবেষণা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিটি গবেষণা এলাকা থেকে শয্যা সংখ্যার ভিত্তিতে হাসপাতালগুলোকে দুটি স্তরে বিভক্ত করে (একটি স্তরে ১০০ শয্যার কম ও আরেকটি স্তরে ১০০ থেকে বেশি) প্রতিটি স্তর থেকে ১টি সরকারি এবং ১টি বেসরকারি– সর্বমোট ১৮৮টি হাসপাতালকে জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। গবেষণা এলাকার আওতাভুক্ত ৪৭টি সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং এই এলাকাগুলোতে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত ১২টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকেও জরিপের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তবে চূড়ান্তভাবে ২৩১টি প্রতিষ্ঠান (১৮১টি হাসপাতাল, ৩৮টি সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ এবং ১২টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান) জরিপে অংশগ্রহণ করে। এসব প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাবর্জ্য কর্মীদের মধ্য থেকে সমানুপাতিক নমুনায়ন পদ্ধতিতে (Proportionate Sampling) ৯৫ জনকে নির্বাচন করা হয় এবং ৯৩ জনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

সারণি-২ : জরিপের নমুনায়ন

জরিপের নমুনা		নির্বাচিত নমুনা সংখ্যা	জরিপ সম্পন্ন হয়েছে
প্রতিষ্ঠান	হাসপাতাল	১৮৮টি	১৮১টি
	সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা	৪৭টি	৩৮টি
	ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	১২টি	১২টি
মোট প্রতিষ্ঠান		**২৪৭টি**	**২৩১টি**
চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী		**৯৫ জন**	**৯৩ জন**

পরোক্ষ তথ্য : পরোক্ষ উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের আধেয় বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণার পরোক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নির্দেশিকা; সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিবেদন, প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, রেকর্ড বুক, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ইত্যাদি।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময় : জুন ২০২১-নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে গবেষণার তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই করা হয়েছে।

বিশ্লেষণকাঠামো

সুশাসনের সাতটি সূচকের আলোকে পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রের মাধ্যমে এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, যাচাই ও গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সারণি-৩ : সুশাসনের নির্দেশকের ভিত্তিতে বিশ্লেষণকাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	পর্যবেক্ষণের সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্র
আইন ও নীতির প্রতিপালন	▪ চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আইন, নীতি ও বিধি
সক্ষমতা	▪ অবকাঠামো; প্রযুক্তির ব্যবহার; জনবল ব্যবস্থাপনা; বাজেট; সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ
স্বচ্ছতা	▪ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর তথ্য প্রকাশ
জবাবদিহি	▪ চিকিৎসাবর্জ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অপসারণ কার্যক্রম তদারকি; পরিবেশগত তদারকি; নিরীক্ষা; অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা
অংশগ্রহণ	▪ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশীজনের সম্পৃক্ততা
সমন্বয়	▪ সরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়; সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়
অনিয়ম ও দুর্নীতি	▪ চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন; চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী ও ঠিকাদার নিয়োগ; তথ্য ব্যবস্থাপনা; বিভিন্ন অংশীজনের সংশ্লিষ্টতা

গবেষণার ফলাফল

সংশ্লিষ্ট আইন, নীতি ও বিধিমালা : সীমাবদ্ধতা ও প্রতিপালনে চ্যালেঞ্জ

চিকিৎসাবর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ : চিকিৎসাবর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা অনুযায়ী চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য 'কর্তৃপক্ষ' গঠন করার কথা থাকলেও 'কর্তৃপক্ষ' গঠনের দায়িত্ব কার তা উল্লেখ নেই। এ ছাড়া 'কর্তৃপক্ষ' কার কাছে জবাবদিহি করবে তারও উল্লেখ নেই। ফলে বিধিমালা জারি হওয়ার তিন মাসের মধ্যে 'কর্তৃপক্ষ' গঠন করার কথা থাকলেও ১৪ বছরেও তা কার্যকর হয়নি। এ ছাড়া লাইসেন্স ছাড়াই সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা এবং হাসপাতাল নির্ধারিত কিছু ঠিকাদারকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দিয়ে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বিধিমালায় চিকিৎসাবর্জ্যসংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ডেটাবেইস তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ না করার ফলে হাসপাতাল, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোতে বর্জ্যসংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না এবং চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার তথ্যসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ডেটাবেইস প্রস্তুত করা হয়নি।

চিকিৎসাবর্জ্য বিধিমালায় হাসপাতাল থেকে অপসারিত চিকিৎসাবর্জ্যের বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সিটি করপোরেশন, পৌরসভার দায়িত্ব ও জবাবদিহির বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি। ফলে সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়নি; ক্ষেত্রবিশেষে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার দায় এড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া বিধিতে তরল বা রাসায়নিক বর্জ্য অপসারণের ক্ষেত্রে তরল বর্জ্যকে আলাদাভাবে ক্ষতিকর ও অক্ষতিকর হিসেবে চিহ্নিত এবং পৃথক করার নির্দেশনা নেই, পানি মিশিয়ে তরল ও রাসায়নিক বর্জ্য পয়ঃপ্রণালিতে অপসারণের ক্ষেত্রে পানি ও রাসায়নিকের অনুপাত সুনির্দিষ্ট করা হয়নি এবং বর্জ্যের ধরন ও পরিমাণ অনুযায়ী পানি মেশানোর পরিমাণও নির্দিষ্ট করা নেই।[৮] ফলে ইচ্ছামাফিক তরল ও রাসায়নিক বর্জ্য পয়ঃপ্রণালিতে অপসারণের সুযোগ রয়েছে।

পুনঃচক্রায়ন ও পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্যের ব্যবস্থাপনার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন থাকলেও সে অনুসারে বিধিমালায় পুনঃব্যবহার (reuse) ও পুনঃচক্রায়নযোগ্য (recycle) বর্জ্যের আলাদা শ্রেণি তৈরি করা হয়নি। এ ছাড়া বিধিতে পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নযোগ্য চিকিৎসাসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রয়ানযোগ্য বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা হয় না। উপরন্তু পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য বিক্রির অর্থে ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্বাহ করা সম্ভব হলেও পরিবেশবান্ধব ক্রয়নীতি বা কার্যকর মডেল না থাকায় তা সম্ভব হয় না। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইনে চিকিৎসাবর্জ্য হ্রাসকরণে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হলেও বিধিতে তা অনুপস্থিত। ফলে হাসপাতালের বর্জ্য উৎপাদন আনুপাতিক হারে হ্রাস করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে হাসপাতালের অভ্যন্তরে বর্জ্য পরিবহনের জন্য বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী ট্রলিতে পৃথক কালার কোড এবং লেবেল থাকার নির্দেশনা বিধিতে অনুপস্থিত। যার ফলে সব ধরনের বর্জ্য একই ট্রলিতে পরিবহন করায় সংক্রমণ ও পরিবেশগত ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন অনুসারে বদ্ধ কনটেইনারযুক্ত যানবাহনে এবং সংক্রামক রোগের টিকা গ্রহণকারী চালকের মাধ্যমে বর্জ্য পরিবহন করার কথা বলা হলেও বিধিতে উল্লিখিত বর্জ্য পরিবহনে 'অনুমোদিত' যানবাহনের সংজ্ঞা বা তফসিল উল্লেখ করা হয়নি। অনুমোদিত যানবাহনের সংজ্ঞা নির্ধারিত না হওয়ায় ক্ষেত্রবিশেষে সব ধরনের যানবাহনে চিকিৎসাবর্জ্য পরিবহন করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে বদ্ধ কনটেইনারযুক্ত যানবাহন ব্যবহার না করায় সংক্রামক রোগ ও পরিবেশদূষণের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সরকার (সিটি করপোরেশন) আইন, ২০০৯ এবং স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ : সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা এলাকার হাসপাতালে সৃষ্ট বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্থানীয় সরকারের দায়িত্ব সম্পর্কে এ আইনে স্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে ক্ষেত্রবিশেষে সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার কার্যকর অংশগ্রহণ ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার কাজের একটি অন্যতম ক্ষেত্র হলেও চিকিৎসাবর্জ্যকে পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত **করা হয়নি**।

পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ : এই আইনে চিকিৎসাবর্জ্যকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে সুনির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করা হয়নি এবং এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। ফলে

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্ব প্রদানে ঘাটতি রয়েছে। আইনে উল্লেখ না থাকায় চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়মকারীদের আইনের আওতায় আনা যায় না।

পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ : বিধি ১৩তে বর্জ্য নিঃসরণ ও নির্গমনের মানমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও ক্ষেত্রবিশেষে আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত মানমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে তা নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে অধিকাংশ হাসপাতাল থেকে নির্ধারিত মাত্রার চেয়েও বেশি মাত্রায় তরল ও রাসায়নিক বর্জ্য নিঃসরণ হয়।

সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ

অবকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ

বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট রঙের পাত্রের ঘাটতি : চিকিৎসাবর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ অনুযায়ী বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য ৬টি নির্দিষ্ট রঙের পাত্র রাখার নির্দেশনা থাকলেও জরিপকৃত হাসপাতালের ৬০ শতাংশে তা নেই। এসব হাসপাতালের অভ্যন্তরে যত্রতত্র বর্জ্য ফেলা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে বর্জ্যকর্মী সব ধরনের বর্জ্য একত্রে বালতি বা গামলায় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেন।

বর্জ্য মজুতকরণ কক্ষের ঘাটতি : বিধি অনুযায়ী হাসপাতালগুলোতে বর্জ্য মজুতকরণ কক্ষ এবং সেখানে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস ও বর্জ্য পরিষ্কার করার জন্য পানি সরবরাহের নির্দেশনা থাকলেও এ-সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কক্ষ ও ওই সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। জরিপকৃত হাসপাতালের ৬৬ শতাংশে বর্জ্য মজুতকরণের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ নেই। যেসব হাসপাতালে মজুতকরণ কক্ষ আছে (৩৪ শতাংশ) তার ২৩ শতাংশের মজুতকরণ কক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা নেই। বর্জ্য মজুতকরণের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ না থাকায় উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য ফেলে রাখা হয়।

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ঘাটতি : বিধি অনুযায়ী বর্জ্য পরিশোধনের জন্য অটোক্লেভ যন্ত্র ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও জরিপকৃত হাসপাতালগুলোর ৪৯ শতাংশে এই যন্ত্র নেই। ফলে এসব হাসপাতালে চিকিৎসা উপকরণ পরিশোধন না করেই পুনঃব্যবহার করা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী 'লাল' শ্রেণিভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে হাসপাতালে তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) থাকা বাধ্যতামূলক হলেও ৮৩ শতাংশ হাসপাতালে ইটিপি নেই। যেসব হাসপাতালে (১৭ শতাংশ) ইটিপি আছে, সেগুলোর ১৬ শতাংশে এই ব্যবস্থা সচল নেই। ইটিপি না থাকায় অশোধিত তরল চিকিৎসাবর্জ্য অপসারণ করা হয়।

চিকিৎসাবর্জ্য শোধনাগার ও ল্যান্ডফিলের ঘাটতি : বিধি অনুযায়ী চিকিৎসাবর্জ্য শোধন ও অপসারণের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ ও অবকাঠামো তৈরির নির্দেশনা থাকলেও জরিপের আওতাভুক্ত বেশির ভাগ (৮০ শতাংশ) সিটি করপোরেশন বা পৌরসভায় চিকিৎসাবর্জ্য শোধনাগার নেই। মাত্র ৮টি সিটি করপোরেশন বা পৌরসভায় শোধনাগার আছে, এর মধ্যে ৫টিতেই চিকিৎসাবর্জ্য পরিশোধন করা হয় না।

চিত্র-১ : চিকিৎসাবর্জ্য শোধনাগার না থাকা (%)

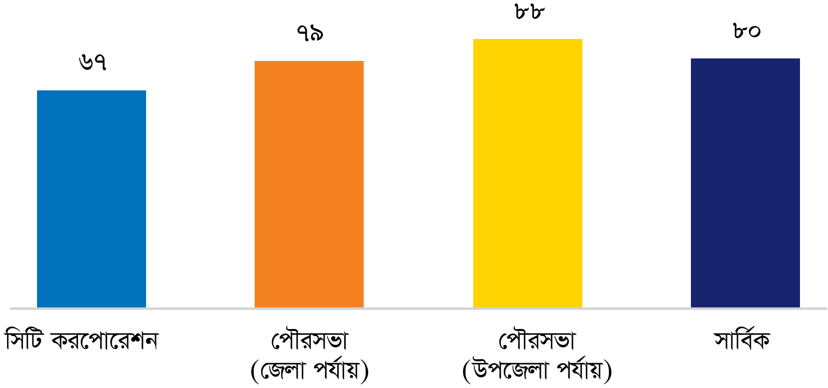

জরিপকৃত সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার ১৪ শতাংশে চিকিৎসাবর্জ্য অপসারণ করার জন্য কোনো ল্যান্ডফিল নেই। গবেষণার আওতাভুক্ত এলাকার মাত্র একটি সিটি করপোরেশনে স্যানিটারি ল্যান্ডফিল আছে। জনবসতি থেকে ল্যান্ডফিলের নিরাপদ দূরত্ব ন্যূনতম ৫০০ মিটার থাকা বাধ্যতামূলক হলেও ৭৭ শতাংশ সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার ল্যান্ডফিল জনবসতির ৫০০ মিটারের কম দূরত্বে অবস্থিত। গবেষণা আওতাভুক্ত ৮৬ শতাংশ সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ল্যান্ডফিলগুলো সুরক্ষিত নেই। ফলে ল্যান্ডফিল অরক্ষিত থাকায় পথশিশু, পশুপাখি, পানি ও বাতাসের মাধ্যমে বর্জ্য পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ছে।

জনবল ব্যবস্থাপনায় চ্যালেঞ্জ

জনবলের ঘাটতি : চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় জনবলের ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালের বর্জ্য ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপসারণের নির্দেশনা থাকলেও কর্মী সংকটের কারণে অধিকংশ ক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হয় না। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বর্জ্য অপসারণ না হওয়ায় বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুর্গন্ধ ছড়ানোর কারণে চিকিৎসা সেবাগ্রহীতাদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যবহৃত যন্ত্রগুলো (অটোক্লেভ, ইনসিনেরেটর, ইটিপি ইত্যাদি) এবং বর্জ্য পরিবহনে মোটর গাড়ি চালনার জন্য দক্ষ জনবলের ঘাটতি রয়েছে।

কার্যবণ্টন ও কর্মঘণ্টা সঠিকভাবে মেনে চলায় ঘাটতি : চিকিৎসাবর্জ্য কর্মীদের কার্যবণ্টন ও কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট করায় ঘাটতি রয়েছে। জরিপে অংশগ্রহণকারী বর্জ্যকর্মীদের ২৮ শতাংশের কার্যবণ্টন ও কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট নেই; ১২ শতাংশ বর্জ্যকর্মী দৈনিক ৮ ঘণ্টার বেশি (গড়ে প্রায় সাড়ে ১০ ঘণ্টা) সময় কাজ করেন, অন্যদিকে ৪৪ শতাংশ কর্মী দৈনিক ৮ ঘণ্টার কম (গড়ে সাড়ে ৫ ঘণ্টা) সময় কাজ করেন। বর্জ্যকর্মীদের একাংশের ওপর কাজের চাপ বেশি থাকায় চিকিৎসাবর্জ্য সংগ্রহ, পৃথককরণ, সংরক্ষণসহ পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

চিত্র-২ : কার্যবণ্টন ও কর্মঘণ্টা নির্দিষ্ট না থাকা (%)

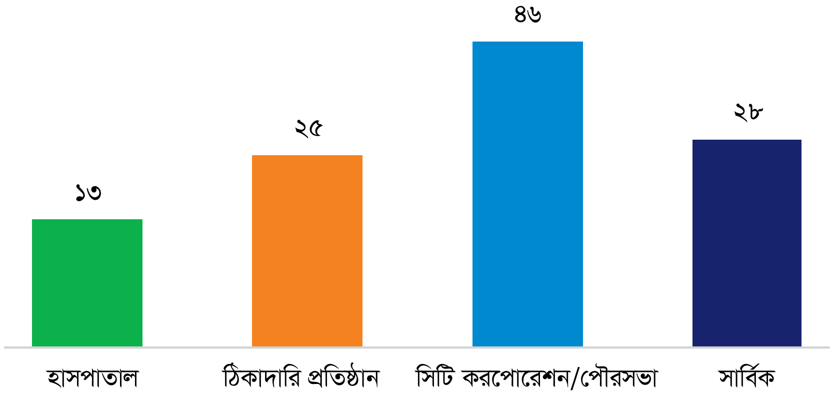

চিকিৎসাবর্জ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণে ঘাটতি : বিধি অনুযায়ী চিকিৎসাবর্জ্য কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করার নির্দেশনা থাকলেও তা প্রতিপালনে ঘাটতি রয়েছে। সার্বিকভাবে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৪৪ শতাংশ কর্মীর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ নেই। এ ছাড়া ৬৮ শতাংশ কর্মী জানেন না চিকিৎসাবর্জ্য মোট কয়টি রঙের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হয়। কর্মীদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় অটোক্লেভ, ইনসিনেরেটর, ইটিপি ইত্যাদি যন্ত্র চালনাসহ বর্জ্য সংগ্রহ, পৃথককরণ, সংরক্ষণ এবং পরিবহনে সক্ষমতার ঘাটতি অব্যাহত থাকছে।

চিত্র-৩ : চিকিৎসাবর্জ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ না দেওয়া (%)

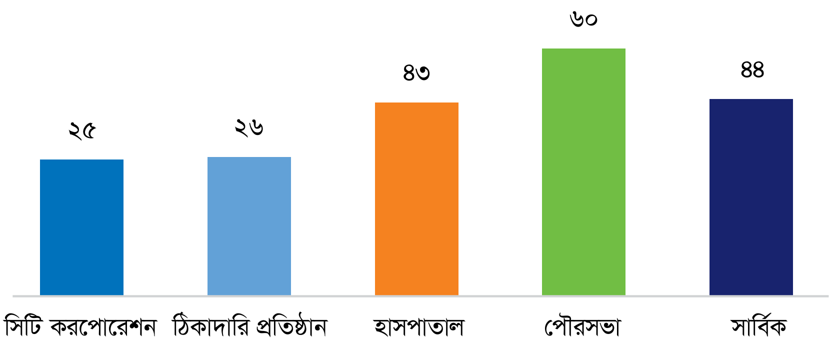

পেশাগত ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত করার ক্ষেত্রে ঘাটতি: বর্জ্যকর্মীদের পেশাগত ঝুঁকি যেমন ধারালো বর্জ্যের আঘাত, সংক্রামক রোগ, শ্বাসকষ্ট, চর্মরোগ ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত করানোর ক্ষেত্রে ঘাটতি বিদ্যমান। সার্বিকভাবে জরিপে অংশগ্রহণকারী ১৭ শতাংশ বর্জ্যকর্মী উল্লিখিত ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত নন।

চিত্র-৪ : বর্জ্যকর্মীদের পেশাগত ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত না থাকা (%)

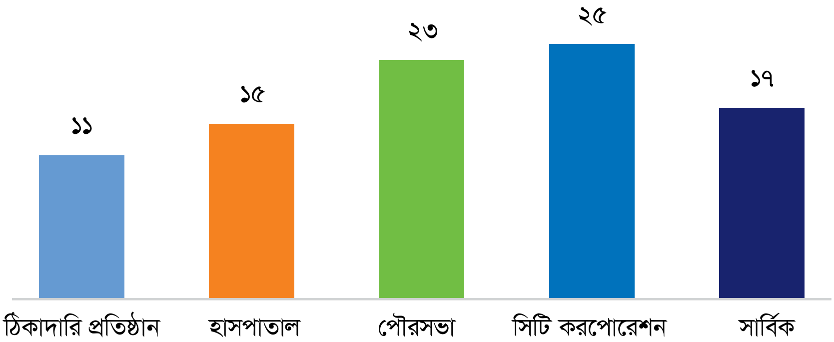

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় বাজেটঘাটতি

জরিপকৃত সব সিটি করপোরেশন এবং ৭৭ শতাংশ পৌরসভায় চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা কোনো বাজেট বরাদ্দ নেই। মাত্র ২৩ শতাংশ পৌরসভা তাদের 'বর্জ্য ব্যবস্থাপনার একটি উপখাত হিসেবে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ষিক ১-৮ লাখ টাকা খরচ করে থাকে। যদিও পৌরসভার শ্রেণিভেদে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বার্ষিক ১০-৫০ লাখ টাকা প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া বাজেটঘাটতির কারণে হাসপাতালগুলোর আধুনিক প্রযুক্তির ইটিপি ও ইনসিনেরেটর ক্রয় করার সামর্থ্য নেই। ক্ষেত্রবিশেষে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিলের অজুহাতে হাসপাতালে ইটিপি, ইনসিনেরেটর, অটোক্লেভসহ বর্জ্য শোধন ও বিনষ্টকারী যন্ত্র ব্যবহার করা হয় না।

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতার চ্যালেঞ্জ

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়সংখ্যক কাভার্ড ট্রাক, ভ্যান, ট্রলিসহ লজিস্টিকস ঘাটতি রয়েছে। পরিবহন, লজিস্টিকস ও প্রয়োজনীয়সংখ্যক দক্ষ লোকবলের অভাবে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো দৈনিক চিকিৎসাবর্জ্য সংগ্রহ করতে পারে না। ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি না থাকায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো চিকিৎসাবর্জ্য পরিশোধন করতে পারে না। এ ছাড়া চিকিৎসাবর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মচারীদের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের ঘাটতি রয়েছে।

সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে চ্যালেঞ্জ

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে কর্মীদের স্বাস্থ্যঝুঁকি : চিকিৎসাবর্জ্য অন্যান্য বর্জ্যের সাথে মিশ্রিত না করার নির্দেশনা থাকলেও অন্যান্য সাধারণ বর্জ্যের সাথে একত্রে চিকিৎসাবর্জ্য সংগ্রহ করা হয়। সার্বিকভাবে জরিপে অংশগ্রহণকারী ৫৪ শতাংশ বর্জ্য সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত কর্মী চিকিৎসাবর্জ্য অন্যান্য বর্জ্যের সাথে একত্রে সংগ্রহ করে থাকেন।

চিত্র-৫ : চিকিৎসাবর্জ্য অন্যান্য বর্জ্যের সাথে একত্রে সংগ্রহ করা (%)

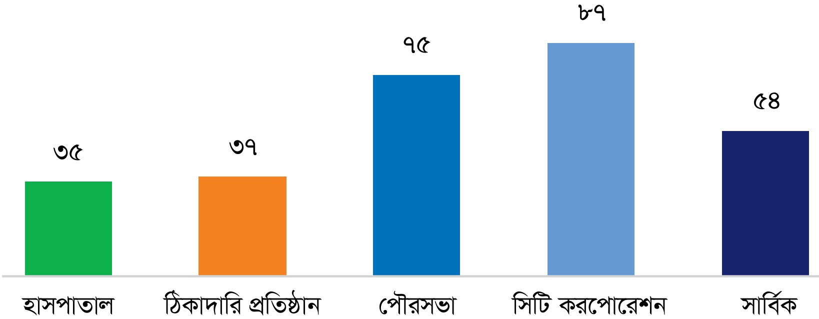

বিধি অনুযায়ী সুরক্ষা উপকরণ, যেমন পোশাক (গ্লাভস, মাস্ক, বুট ইত্যাদি), যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সামগ্রী প্রদানের নির্দেশনা থাকলেও সার্বিকভাবে ৩১ শতাংশ ক্ষেত্রে বর্জ্যকর্মীদের মাঝে তা প্রদান করা হয় না (এ হার হাসপাতালের ক্ষেত্রে ১০ ও সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার ক্ষেত্রে ৫১ শতাংশ)। এ ছাড়া ২৬ শতাংশ বর্জ্যকর্মীকে কোভিড-১৯-এর টিকা এবং ৩৮ শতাংশ বর্জ্যকর্মীকে অন্যান্য সংক্রামক রোগ (যক্ষ্মা, হেপাটাইটিস, ডিপথেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা ইত্যাদি) প্রতিরোধে টিকা প্রদান করা হয়নি (তথ্য সংগ্রহকালীন সময় পর্যন্ত)।

পরিবেশ সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে ঘাটতি : বিধি অনুযায়ী চিকিৎসাবর্জ্য বিনষ্ট করতে ইনসিনারেটর ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার ৮৩ শতাংশ চিকিৎসাবর্জ্য বিনষ্ট করতে তা ব্যবহার করে না এবং ৪৬ শতাংশ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবর্জ্য উন্মুক্ত পদ্ধতিতে জ্বালিয়ে বিনষ্ট করে।

চিত্র-৬ : চিকিৎসাবর্জ্য বিনষ্ট ও অপসারণ (%)

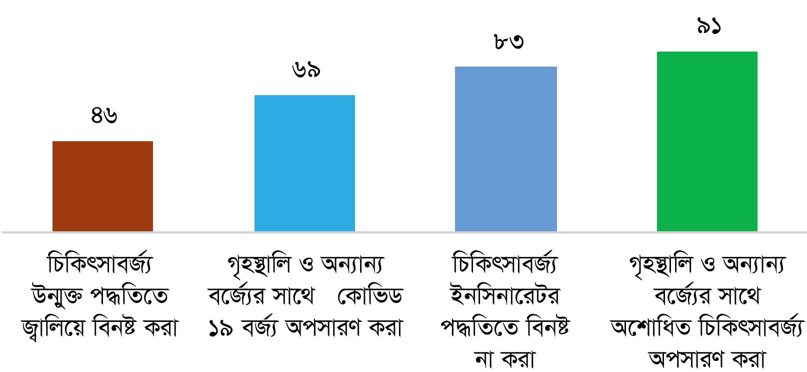

বিধি অনুযায়ী চিকিৎসাবর্জ্য পরিশোধন করে অবমুক্ত করার নির্দেশনা থাকলেও জরিপকৃত ৬৯ শতাংশ সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা গৃহস্থালি বর্জ্যের সাথে অশোধিত চিকিৎসাবর্জ্য অপসারণ

করে এবং ৯১ শতাংশ সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা গৃহস্থালি বর্জ্যের সাথে কোভিড-১৯ বর্জ্য অপসারণ করে।

স্বচ্ছতার চ্যালেঞ্জ

তথ্য প্রকাশে ঘাটতি

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান, বাজেট, বার্ষিক প্রতিবেদন ইত্যাদি প্রকাশ করা হয় না। সার্বিকভাবে জরিপকৃত ৬৭ শতংশ হাসপাতালে বর্জ্য ফেলার নির্দেশিকা প্রদর্শন করা হয় না। হাসপাতালে বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগে অবস্থানকারী রোগী ও দর্শনার্থীদের জন্য কালারকোড ও সাংকেতিক চিহ্ন অনুযায়ী বর্জ্য ফেলার নির্দেশিকা প্রদর্শন করা হয় না। এ ছাড়া পরিবেশ অধিদপ্তর সুনির্দিষ্টভাবে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ করে না।

জবাবদিহির চ্যালেঞ্জ

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি

হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ও গাইডলাইন অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, তা তদারকিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ঘাটতি রয়েছে। সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার নিজস্ব বর্জ্যকর্মীসহ ঠিকাদার কর্তৃক চিকিৎসাবর্জ্য সংগ্রহ, পরিশোধন ও অপসারণ কার্যক্রম তদারকি এবং ল্যান্ডফিলে চিকিৎসাবর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতাল ও সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকি এবং ল্যান্ডফিলগুলোর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের ঘাটতি রয়েছে।

সারণি-৪ : চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তদারকিতে ঘাটতি

দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান	তদারকিতে ঘাটতি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	• হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা; বিধিমালা ও গাইডলাইন অনুসরণ
সিটি করপোরেশন/ পৌরসভা	• নিজস্ব বর্জ্যকর্মীসহ ঠিকাদার কর্তৃক চিকিৎসাবর্জ্য সংগ্রহ, পরিশোধন ও অপসারণ কার্যক্রম • ল্যান্ডফিলে চিকিৎসাবর্জ্য অপসারণ কার্যক্রম
পরিবেশ অধিদপ্তর	• হাসপাতাল ও সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম • ল্যান্ডফিলগুলোর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা

নিরীক্ষায় ঘাটতি

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার ওপর ২০১৬ সালে একটি পরিবেশগত নিরীক্ষা সম্পন্ন হলেও পরে মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কার্যালয় (ওসিএজি) আর কোনো নিরীক্ষা সম্পন্ন করেনি। ওসিএজির

পর্যবেক্ষণের (২০১৬) ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজন যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ (কর্তৃপক্ষ ও স্থানীয় কমিটি গঠন, ল্যান্ডফিল নির্মাণ ইত্যাদি) করেনি।

অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থায় ঘাটতি

চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত অভিযোগ দায়ের ও নিরসনে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই।

অংশগ্রহণের চ্যালেঞ্জ

বিধিতে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত জাতীয় উপদেষ্টা কমিটিতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিশেষজ্ঞসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ থাকলেও সংশ্লিষ্ট অংশীজন এ বিষয়ে কোনো উদ্যোগ নেয়নি। হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনাবিষয়ক গাইডলাইনে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সচেতন নাগরিকদের অংশগ্রহণে বিভিন্ন স্তরে কমিটি গঠন করার নির্দেশনা থাকলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি। সাংবাদিক, এনজিওকর্মী, বর্জ্য বিশেষজ্ঞসহ সচেতন নাগরিক প্রতিনিধিদের সাথে কার্যকর চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অধিপরামর্শ বা মতবিনিময় সভা করা হয়নি। কিছু বেসরকারি সংস্থার আগ্রহ ও স্বপ্রণোদিত উদ্যোগে এ খাতের ব্যবস্থাপনা শুরু হলেও বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়নি।

সমন্বয়ের চ্যালেঞ্জ

সরকারি প্রাতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

'কর্তৃপক্ষ' গঠন করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর এবং বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের মধ্যে সমন্বয় নেই, ফলে আপিলেড কর্তৃপক্ষসহ জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি, সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যকর নেই। জেলা প্রশাসক বা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের মাসিক সমন্বয় সভায় হাসপাতাল প্রতিনিধি নিয়মিত অংশগ্রহণ করে না। এ ছাড়া হাসপাতালের সাথে সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার কাজেরও সমন্বয় হয় না।

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি

ঠিকাদারের সাথে হাসপাতাল ও সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার সমন্বয়ে ঘাটতি থাকায় কার্যকর কর্মপরিকল্পনা তৈরি হয়নি।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

হাসপাতালে চিকিৎসাবর্জ্য সংরক্ষণে অনিয়ম

চিকিৎসাবর্জ্য বিধিমালা অনুযায়ী প্রতিটি বর্জ্য সংরক্ষণ পাত্রে বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী কালার কোড থাকা এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের নির্দেশনা থাকলেও হাসপাতালগুলোতে তা প্রতিপালনে ঘাটতি রয়েছে। সার্বিকভাবে ২৯ শতাংশ হাসপতালের বর্জ্য সংরক্ষণের কালার কোড পাত্র নেই এবং ৫১ শতাংশ পাত্রে সাংকেতিক চিহ্ন নেই। তা ছাড়া বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী ক্ষেত্রবিশেষে হাসপাতালগুলো পাত্রে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে না। কালার

কোড থাকলেও বর্জ্যের ধরন অনুযায়ী অনুযায়ী সঠিক পাত্রে বর্জ্য সংরক্ষণ না করে সব ধরনের বর্জ্য একই পাত্রে রাখা হয়। পর্যবেক্ষণে আরও দেখা যায়, নির্দিষ্ট পাত্রে বর্জ্য না ফেলে তার পাশে ফেলে রাখা হয়। এ ছাড়া রাসায়নিক ও তেজস্ক্রিয় বর্জ্য আলাদা করা এবং তা সাবধানতার সাথে ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি রয়েছে।

চিত্র-৭ : নির্দেশনা অনুযায়ী বর্জ্য সংরক্ষণ পাত্র ব্যবহার না করা (%)

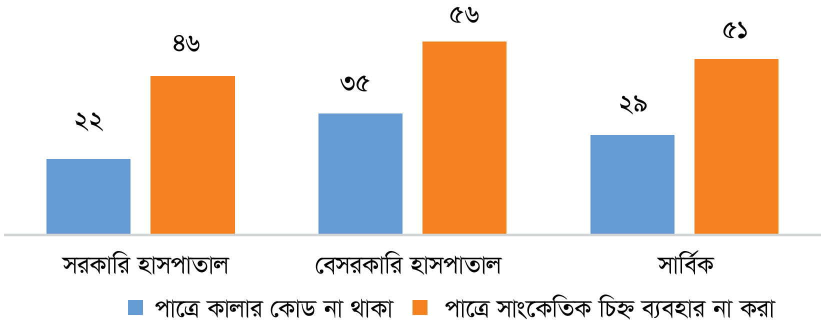

কোভিড-১৯ ও সাধারণ চিকিৎসাবর্জ্য একত্রে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা

সাধারণ চিকিৎসাবর্জ্য ও কোভিড-১৯-এর চিকিৎসাবর্জ্য আলাদাভাবে ব্যবস্থাপনা করা হয় না। সার্বিকভাবে ৪২ শতাংশ ক্ষেত্রে কোভিড-১৯-এর বর্জ্য ও সাধারণ চিকিৎসাবর্জ্য একত্রে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

চিত্র-৮ : সাধারণ চিকিৎসাবর্জ্যের সাথে কোভিড-১৯-এর সুরক্ষা বর্জ্য একত্রে সংগ্রহ করা (%)

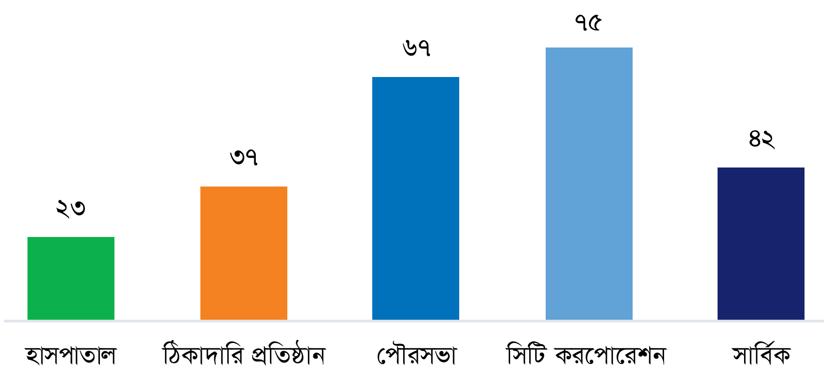

চিকিৎসাবর্জ্য পরিশোধন ও বিনষ্টকরণে অনিয়ম ও দুর্নীতি

চিকিৎসাবর্জ্য বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী, চিকিৎসাবর্জ্য পুনঃব্যবহার রোধে ব্যবহৃত রাবার বা প্লাস্টিক নল ও বিভিন্ন ব্যাগ টুকরো করে কাটার নির্দেশনা থাকলেও তা প্রতিপালনে ঘাটতি

রয়েছে। সার্বিকভাবে ২৮ শতাংশ হাসপাতালে ব্যবহৃত রাবার বা প্লাস্টিকের ব্যাগ কাটা হয় না এবং ৩১ শতাংশ হাসপাতালে ব্যবহৃত রাবার বা প্লাস্টিকের নল কাটা হয় না। গাইডলাইন অনুযায়ী পুনঃব্যবহার রোধ করার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সুচ ব্যবহারের পরপরই ধ্বংস বা গলিয়ে দিতে হয়।[৯] দেখা যায়, ৪৯ শতংশ হাসপাতালে সুচ ধ্বংসকারী (নিডল ডেস্ট্রয়ার) যন্ত্র নেই।

সিন্ডিকেটের মাধ্যমে চিকিৎসাবর্জ্য বিক্রি

হাসপাতালের দুই ধরনের চিকিৎসাবর্জ্য অবৈধভাবে বাইরে বিক্রি করা হয়- পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য ও পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য।

সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য বিক্রি : হাসপাতালের কর্মীদের একাংশ (সিন্ডিকেটের অংশ) পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য, যেমন ব্যবহৃত কাচের বোতল, সিরিঞ্জ, স্যালাইন ব্যাগ ও রাবার বা প্লাস্টিক নল নষ্ট না করে পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য সংগ্রহকারীর (সিন্ডিকেটের অংশ) কাছে বিক্রি করে দেন। পরে এই সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পুনঃব্যবহারযোগ্য বর্জ্য সঠিক প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত না করেই পরিষ্কার ও প্যাকেটজাত করে ওষুধের দোকান ও বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে বিক্রি করে দেন। এসব উপকরণ সঠিকভাবে জীবাণুমুক্ত করা হয় না এবং এসব উপকরণ পুনঃব্যবহারের ফলে এইচআইভিসহ মারাত্মক সংক্রামক রোগের ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে।[১০]

সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পুনঃচক্রায়নযোগ্য বর্জ্য বিক্রি : একইভাবে হাসপাতালের কর্মীদের একাংশ পুনঃচক্রায়নযোগ্য চিকিৎসাবর্জ্য (ব্যবহৃত সিরিঞ্জ, ব্লেড, ছুরি, কাঁচি, রক্তের ব্যাগ ও নল, ধাতব উপকরণ ইত্যাদি) নষ্ট বা ধ্বংস না করে সংক্রামিত অবস্থাতেই ভাঙারির দোকানে এবং রিসাইক্লিং কারখানাগুলোয় (সিন্ডিকেটের অংশ) বিক্রি করে দেন। সংক্রমিত অবস্থায় এসব বর্জ্য পরিবহন করার ফলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মী ও রিসাইক্লিং কারখানার কর্মীদের বিভিন্ন সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং পরিবেশদূষণের ঝুঁকি বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি জেলার বিভিন্ন হাসপাতালের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিদিন প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কেজি প্লাস্টিক চিকিৎসাবর্জ্য অবৈধভাবে বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।[১১]

ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অবৈধভাবে বর্জ্য বিক্রি : ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও বর্জ্যের অবৈধ ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে। তারা বর্জ্য নষ্ট না করে কালোবাজারে বিক্রি করে দেয়। একটি সুপরিচিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কালোবাজারে প্লাস্টিক চিকিৎসাবর্জ্যের অবৈধ ব্যবসার অভিযোগ রয়েছে।

চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী-সংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি

চিকিৎসাবর্জ্যকর্মী নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি : চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি সংঘটিত হয়। জরিপে দেখা যায়, ৫৫ শতাংশ বর্জ্যকর্মী নিয়োগ পেয়েছেন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে। অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বর্জ্যকর্মীদের মধ্যে স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন ৪৬ শতাংশ, প্রভাবশালীর হস্তক্ষেপে ৪২ শতাংশ এবং ঘুষ বা বিধিবহির্ভূত অর্থের মাধ্যমে ১৪ শতাংশ।

চিত্র-৯ : বর্জ্যকর্মী নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি (%)

তা ছাড়া সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় সাধারণ নিয়োগের সময় চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী হিসেবে আলাদাভাবে নিয়োগ দেওয়া হয় না। তাদের সাধারণ বর্জ্যকর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে পরে চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। বর্জ্যকর্মীদের চাকরি স্থায়ীকরণের ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। যেমন বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে নতুন ও অস্থায়ী কর্মীর শিক্ষানবিশকাল শেষ হওয়ার আগেই দ্রুত চাকরি স্থায়ীকরণ করা হয়েছে।

চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী নিয়োগে বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন : হাসপাতাল, সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানে বর্জ্যকর্মী নিয়োগে বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে, যার পরিমাণ নিয়োগভেদে ২ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত।

সারণি-৫ : চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী নিয়োগে বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন

প্রতিষ্ঠান	দুর্নীতির পরিমাণ (টাকা)	অর্থের গ্রহীতা
সরকারি হাসপাতাল	১-২ লাখ	স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উচ্চপর্যায়সহ বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ
সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা	৫-৬০ হাজার	মেয়র, কাউন্সিলর, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ, শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা
ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	২-১০ হাজার	কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের একাংশ

চিকিৎসাবর্জ্য কর্মীর বেতন প্রদানে অনিয়ম ও দুর্নীতি : হাসপাতাল, সিটি করপোরেশন বা পৌরসভা ও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের বর্জ্যকর্মীদের মাসিক বেতন প্রদানে কালক্ষেপণের অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া কর্মী সরবরাহকারী এজেন্সির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত বর্জ্যকর্মীদের মাসিক বেতন থেকে আংশিক কর্তনের অভিযোগ রয়েছে।

ঠিকাদার নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি

বিধিমালা অনুযায়ী চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা ও যোগ্যতা অনুযায়ী চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণের লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ যোগ্যতার ভিত্তিতে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে

লাইসেন্স প্রদান করার নিয়ম থাকলেও তা মানা হয় না; বরং হাসপাতাল এবং সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার সাথে চুক্তি করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। অধিকাংশ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চিকিৎসাবর্জ্য পৃথককরণ, পরিবহন, পরিশোধন ও অপসারণের নিয়ম না মেনেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। যেমন বর্জ্য জীবাণুমুক্ত করার জন্য যতটুকু সময় অটোক্লেভ মেশিনে রাখা প্রয়োজন তার আগেই বের করে ফেলা হয়। ঢাকার দুটি সিটি করপোরেশনে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে সুযোগ না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানকেই দীর্ঘদিন ধরে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। এ ছাড়া একটি সিটি করপোরেশনে অদক্ষ ও অভিজ্ঞতাহীন প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। বিবিধ অনিয়মের অভিযোগ থাকলেও প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তথ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম

বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও নথিপত্র সংরক্ষণ করার নির্দেশনা থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃক তা প্রতিপালনে ঘাটতি রয়েছে। যেমন ৭৩ শতাংশ হাসপাতাল বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে না, ৬৩ শতাংশ হাসপাতালে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত নথি সংরক্ষণ করা হয় না এবং স্টক-রেজিস্টার নেই ৪৬ শতাংশ হাসপাতালে। যেসব হাসপাতাল (২৭ শতাংশ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করে তাদের মধ্যে প্রায় ১৬ শতাংশের নিয়মিত প্রতিবেদন তৈরি করা হয় না।

চিত্র-১০ : হাসপাতালে চিকিৎসাবর্জ্য বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম (%)

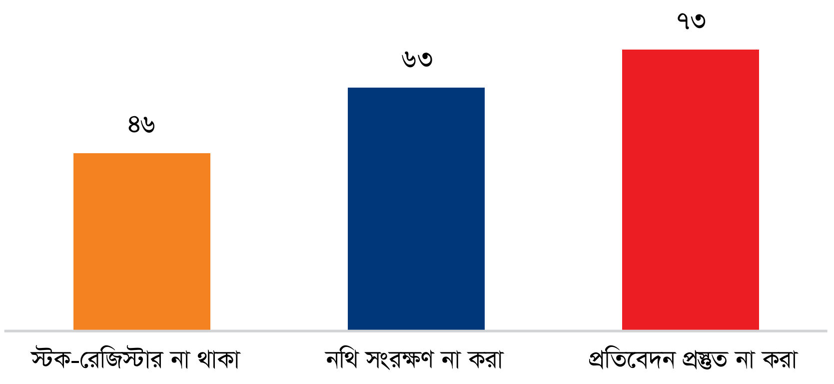

পরিবেশ ছাড়পত্রসংক্রান্ত অনিয়ম ও দুর্নীতি

সব হাসপাতালের জন্য ছাড়পত্র নেওয়ার বিধান থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে সরকারি হাসপাতাল ছাড়পত্র নেয় না। বেসরকারি হাসপাতালে ছাড়পত্র পেতে পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের একাংশ কর্তৃক হয়রানির অভিযোগ রয়েছে। যেমন ছাড়পত্র প্রদান ও নবায়নে ইচ্ছাকৃত কালক্ষেপণ করা হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে নির্ধারিত ফির চেয়ে ৩-৪ গুণ বেশি টাকা দিতে বাধ্য করা হয়।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণায় চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত আইনের বিবিধ দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক বিদ্যমান চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনাসংক্রান্ত আইন, বিধিমালা, গাইডলাইন, সম্পূরক বিধি এবং নির্দেশিকা প্রয়োগ ও প্রতিপালনে ঘাটতির চিত্র উঠে এসেছে। চিকিৎসাবর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ গত ১৪ বছরেও বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান, সংশ্লিষ্ট অংশীজনের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সার্বিকভাবে তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি 'কর্তৃপক্ষ' গঠনের কথা থাকলেও তা হয়নি। অন্যতম অংশীজন হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতাল ও সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার কর্মকর্তাসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্টজন বিদ্যমান আইনিকাঠামো এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সঠিকভাবে অবগত নয়। একই সাথে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট এসব প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, সমন্বয় এবং অংশীজনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করায় ঘাটতি রয়েছে। অধিকাংশ হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নেই। হাসপাতাল ও বহির্বিভাগীয় ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, বাজেট, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ জনবলের ঘাটতি বিদ্যমান। এ ছাড়া এ ক্ষেত্রটিতে বিবিধ অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান। চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী নিয়োগে বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে অবহেলা এবং বিবিধ অনিয়ম-দুর্নীতি থাকলেও তা প্রতিরোধে পদক্ষেপ গ্রহণে ঘাটতি রয়েছে। ফলে সংক্রমণসহ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশদূষণের ঝুঁকি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বিকভাবে বলা যায় চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ সুরক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও এই ক্ষেত্রটিকে যথাযথ প্রাধান্য দেওয়া হয়নি।

সুপারিশমালা

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নিম্নলিখিত নীতিনির্ধারণী ও দিকনির্দেশনামূলক সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে:

১. চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়, তদারকি ও তত্ত্বাবধান নিশ্চিত করতে 'কর্তৃপক্ষ' গঠন করতে হবে এবং জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বয় কমিটি গঠন করতে হবে।

২. আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণ এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে চিকিৎসাবর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ সংশোধন করতে হবে।

৩. পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় সুস্পষ্টভাবে চিকিৎসাবর্জ্যকে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর হিসেবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে।

৪. চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, হাসপাতাল, সিটি করপোরেশন বা পৌরসভাসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে সমন্বয় করে কার্যকর কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

৫. চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির জন্য এ ক্ষেত্রটিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে।

৬. চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনায় আধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের জন্য ইটিপি ও এলাকাভিত্তিক কেন্দ্রীয় ইনসিনারেটর স্থাপন করতে হবে এবং দক্ষ জনবল দ্বারা চিকিৎসাবর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণ করতে হবে।

৭. চিকিৎসাবর্জ্যের ঝুঁকি সম্পর্কে হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসাবর্জ্য কর্মী এবং জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. সিটি করপোরেশন বা পৌরসভায় চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদাভাবে জনবল নিয়োগ দিতে হবে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের দক্ষ করে তুলতে হবে।

৯. চিকিৎসাবর্জ্য কর্মীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যবিমা সুবিধা প্রদান করতে হবে।

১০. কেন্দ্রীয় ডেটাবেইস তৈরি করে উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণ সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনাবিষয়ক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অংশীজনের ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত করতে হবে।

১১. পুনঃব্যবহার ও পুনঃচক্রায়নযোগ্য চিকিৎসাবর্জ্যের অবৈধ ব্যবসা বন্ধে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] 'Report on health-care waste management status in countries of the South-East Asia Region', World Health Organization (WHO), বিস্তারিত দেখুন: https://apps.who.int/iris/handle/10665/258761, সর্বশেষ ভিজিট: ৩০.১১.২২

[২] 'Effective Management of Medical Waste amid COVID-19 Pandemic', BRAC, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3PhIWDZ, সর্বশেষ ভিজিট: ২৫.১০.২১।

[৩] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জতিসংঘ, বিস্তারিত দেখুন: https://bangladesh.un.org/en/sdgs/11, সর্বশেষ ভিজিট: ২৫.১০.২১।

[৪] জাতীয় পরিবেশ নীতি (২০১৮), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3W9q63V, সর্বশেষ ভিজিট: ৩০.১১.২২।

[৫] প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-৪১), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3UQ2Y9E, সর্বশেষ ভিজিট: ০১.০৬.২১।

[৬] ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3VKyaZt, সর্বশেষ ভিজিট: ০১.০৬.২১।

[৭] টিআইবি, 'বেসরকারি চিকিৎসাসেবা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', (ঢাকা: টিআইবি, ২০১৮), বিস্তারিত দেখুন: https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/5542, সর্বশেষ ভিজিট: ০৮.০৭.২২।

[৮] চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা: আইনটি সংশোধন করা জরুরি, প্রথম আলো, বিস্তারিত দেখুন: https://bit.ly/3UGj85m, সর্বশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২০২২।

[৯] চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন (২০১৫-১৬)।

[১০] M. A., O'Hare, W. T., & Sarker, M. H. (2011). An illicit economy: Scavenging and recycling of medical waste. *Journal of environmental management*, *92*(11), 2900-2906.

[১১] PRISM's plastic medical waste goes to the black market'. The Business Standard, বিস্তারিত দেখুন: https://www.tbsnews.net/bangladesh/prisms-plastic-medical-waste-goes-black-market-171949, সবশেষ ভিজিট: ০৮.১২.২০২২।

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*

তাসলিমা আক্তার ও মো. মাহ্‌ফুজুল হক

গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) একটি মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস/রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের অংশ। বাংলাদেশ সরকারের সহায়ক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিডিআরসিএস দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, সাংগঠনিক উন্নয়ন, মানবসেবায় চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনাসহ একটি শক্তিশালী সমাজ গড়ার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।[১] সোসাইটির একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল মানবসেবায় চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে, যা ১৯৫৩ সালে ক্যাথলিক মিশনারি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

ক্যাথলিক মেডিকেল মিশনারিজ ১৯৭১ সালে হাসপাতালটি ডিড অব গিফট নং ৭৬৯৬/১৯৭১-এর আওতায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কাছে হস্তান্তর করলে এর নামকরণ হয় হলি ফ্যামিলি রেড ক্রস হাসপাতাল। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সোসাইটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি করার ফলে হাসপাতালটির নাম পরিবর্তিত হয়ে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল হয়। ২০০০ সালে মেডিকেল কলেজ হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে এবং বর্তমানে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নামে পরিচালিত হচ্ছে। হাসপাতালটি চিকিৎসাসেবার ফি থেকে আয় এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদানের টাকায় পরিচালিত হয়।[২]

হাসপাতালটি *দি মেডিকেল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২*[৩]–এর অধীনে নিবন্ধিত। বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ১৫ সদস্যের ব্যবস্থাপনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়, যেখানে একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং ১২ জন সদস্য থাকেন। হাসপাতালটি উক্ত ব্যবস্থাপনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি, যিনি পদাধিকারবলে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিরও সভাপতি। পর্ষদের অন্য সদস্যরা সোসাইটির ৬৮টি ইউনিটের (৬৪টি জেলা ও ৪টি সিটি ইউনিট) প্রতিটি ইউনিটের দুজন ডেলিগেট এবং সংশ্লিষ্ট চারটি মন্ত্রণালয়ের চারজন প্রতিনিধি সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত। বিডিআরসিএস কর্তৃক হাসপাতাল-সম্পর্কিত সব ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং কার্যক্রম সম্পাদন হয়।

---

*২০২৩ সালের ২৫ জুন ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নে নয় (৯) সদস্যবিশিষ্ট হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে। কমিটি কর্তৃক হাসপাতালটি পরিচালিত ও তাদের কার্যক্রমের জন্য বিডিআরসিএসের ব্যবস্থাপনা পর্ষদের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ। হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি একজন কনভেনর (বিডিআরসিএসের চেয়ারম্যান), সাতজন সদস্য, একজন সদস্য সচিব (হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক) নিয়ে গঠিত। হাসপাতালটি বিডিআরসিএসের অভ্যন্তরীণ বিধিবিধান, যেমন স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ফিন্যান্স, অডিট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড সার্ভিস রুলস ২০১৫, মানবসম্পদ নীতি, জেন্ডার পলিসি ইত্যাদি অনুযায়ী পরিচালিত।[৪]

গবেষণার যৌক্তিকতা

প্রেসিডেন্টস অর্ডার নম্বর ২৬, ১৯৭৩ (পিও-২৬) ভিত্তিতে গঠিত সংস্থার অঙ্গ সংগঠনের পরিচালনা পদ্ধতি অন্যান্য হাসপাতাল থেকে ভিন্ন হওয়ায় এটি স্বাস্থ্য খাতে একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান। বিধি (পিও-২৬, ১৯৭৩) অনুসারে, মানবিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে বিডিআরসিএসকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিধিতে সংস্থাটির স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিডিআরসিএসের মানবসেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে চিকিৎসা কার্যক্রম অন্যতম। ৫২৮ শয্যাবিশিষ্ট হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বাংলাদেশে বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতের বৃহত্তম একটি জনসেবামূলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। অলাভজনক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির আয়, এর সুনাম ও রোগীর সংখ্যার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত; বিশেষ করে, রোগীর চিকিৎসাসেবা প্রদান করে অর্জিত আয়ের সাথে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদানে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত। হাসপাতালটি জনগণের উন্নত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক সেবা নিশ্চিতে পিছিয়ে পড়েছে।[৫]

মানবিক সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত হওয়া হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সূত্রে উত্থাপিত হচ্ছে। বিশেষ করে,

- জনবল নিয়োগে অনিয়ম; প্রদত্ত চিকিৎসাসেবায় রোগীদের অসন্তুষ্টি, আস্থাহীনতা
- হাসপাতাল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতি এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙে অ্যাডহক কমিটি গঠন ইত্যাদি

স্বাস্থ্য খাতের এমন একটি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হলেও সুশাসন বিষয়ে কাঠামোবদ্ধ গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। অন্যদিকে, স্বাস্থ্য খাত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত। ইতিপূর্বে টিআইবি সরকারি ও বেসরকারি (লাভজনক) স্বাস্থ্য খাত ও প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিআইবির নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মতো একটি ব্যতিক্রমী এবং অলাভজনক হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উদঘাটনে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য ও আওতা

প্রধান উদ্দেশ্য

হাসপাতালের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য

- হাসপাতাল পরিচালনা নীতি ও কাঠামো, আইন, বিধিবিধান পর্যালোচনা করা;
- সেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতির স্বরূপ ও এর কারণ চিহ্নিত করা;
- চিকিৎসাসেবায় সেবাগ্রহীতা ও অন্যান্য অংশীজনের অভিজ্ঞতা ও মতামত পর্যালোচনা করা এবং
- গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণার পরিধি

গবেষণায় শুধু হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, মেডিকেল কলেজ ও এর শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। গবেষণার পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে হাসপাতালসংশ্লিষ্ট বিধি ও নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা/কার্যকারিতা (অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, জনবলকাঠামো, নিয়োগ ও পদায়ন, বাজেট, আয়-ব্যয়, নিরীক্ষা, হাসপাতালের পরিবেশ), স্বপ্রণোদিত ও হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ, সংরক্ষণ ও প্রচারব্যবস্থা, ব্যবস্থাপনা পর্ষদ গঠন প্রক্রিয়া, ক্ষমতা ও এর প্রয়োগ, সমন্বয়, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থা, নিরীক্ষা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল প্রদত্ত সেবা কার্যক্রম, অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, কারণ ও প্রতিরোধ ইত্যাদি।

গবেষণার পদ্ধতি ও গবেষণা সময়

তথ্য সংগ্রহপদ্ধতি ও উৎস

এই গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ। মুখ্য তথ্যদাতাদের মধ্যে রয়েছে হাসপাতালসংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, চিকিৎসক, নার্স, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কর্তৃপক্ষ, ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি, গণমাধ্যমকর্মী, সেবাগ্রহীতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন (মোট তথ্যদাতা ৮০ জন)। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, পরিবেশ, তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থা, নথিপত্র প্রভৃতি বিষয় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। গবেষণাভুক্ত বিষয়কে সুশাসনের নির্দেশকের (সক্ষমতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অনিয়ম ও দুর্নীতি) আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে হাসপাতাল পরিচালনা বিধি, নীতি, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ও প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক নথি, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এপ্রিল ২০২২ থেকে মে ২০২৩ পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, হাসপাতালটির সাথে সার্বিক সম্পর্ক ও হাসপাতালের সুশাসনের প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টতা ও দায়বদ্ধতা বিষয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটির (আইসিআরসি) ঢাকা অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য টিআইবির পক্ষ থেকে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। একইভাবে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজের (আইএফআরসি) ঢাকা অফিসের সাথেও এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করা হয়। এ ক্ষেত্রে একটি সংক্ষিপ্ত ই-মেইলে তারা জানায় যে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে আইএফআরসির সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু কোভিড-১৯ জরুরি পরিস্থিতিতে আইএফআরসি বিডিআরসিএসের মাধ্যমে হাসপাতালে কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে।

গবেষণার ফলাফল

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নীতির সীমাবদ্ধতা : আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতি[৬] ও সোসাইটির সাংবিধানিক আদেশ (পিও-২৬, ১৯৭৩)[৭] অনুসারে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি পরিচালিত হলেও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ও কমিটির সদস্য কারা হবেন সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই। ফলে বিডিআরসিএসের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, ট্রেজারার ও ক্ষমতাসীন দলীয় রাজনীতিসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কমিটিতে প্রাধান্য পেয়েছেন এবং হাসপাতাল পরিচালনা, নিয়োগ, বিভিন্ন উন্নয়নকাজ, অনুদানের অর্থের আয়-ব্যয়সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিডিআরসিএস চেয়ারম্যানকে একচ্ছত্র ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সমিতি বা সংস্থার প্রধান নির্বাহী হিসেবে চেয়ারম্যান ব্যবস্থাপনা পর্ষদের মাধ্যমে সোসাইটির সব কার্যক্রম সম্পাদন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের এবং এ ক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। বিডিআরসিএসকে হাসপাতালসহ সোসাইটি এবং সোসাইটি অধিভুক্ত সমিতি বা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধানসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমুদয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিডিআরসিএসের একটি মানবসম্পদ নীতি[৮] থাকলেও হাসপাতালে নিয়োগসহ এর পরিচালনায় পৃথক কোনো নীতিমালা নেই। হাসপাতালের জন্য আলাদা মানবসম্পদকাঠামো এবং অর্গানোগ্রামও নেই। ফলে অপরিকল্পিত নিয়োগ, পদায়ন, পদোন্নতিসহ হাসপাতালের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

হাসপাতালে অবকাঠামোগত সমস্যা : হাসপাতালের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে রোগীদের মানসম্মত সেবাদানের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে এখনো হাসপাতালে অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। বহুদিনের পুরোনো ভবন হওয়ায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধার ঘাটতি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবিনের মোজাইক, শয্যার হাতল ও ওয়াশরুমের দরজা ভাঙা, কমোডের ফ্লাশে সমস্যা, বেসিনের সাথে সংযুক্ত পাইপ নষ্ট থাকাসহ অবকাঠামোগত বিবিধ দুর্বলতা বিরাজমান। রোগীদের ব্যবহারের কিছু কিছু কেবিন এবং ইন্টার্ন ডাক্তারদের কক্ষের এসি প্রায়ই নষ্ট থাকে, কিছুদিন পরপর ঠিক করলেও তা সঠিকভাবে কাজ করে না। ইন্টার্নদের কক্ষে ডেস্ক নেই, বেসিন অনেক পুরোনো, বাথরুমের লাইট ও কমোডের হ্যান্ড পাইপ নষ্ট। ডাক্তারদের ব্যবহৃত বাথরুমগুলোর মেঝে, বেসিন

ও কমোড অনেক পুরোনো। ডাক্তারদের চেম্বার ও অফিসকক্ষেরও অবকাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে। রোগী এবং ভিজিটরদের ব্যবহারের লিফটগুলো পুরোনো হওয়ায় প্রায়ই মেরামত করাতে হয়। এ ছাড়া লিফটগুলো ধীরগতিতে কাজ করে। জরুরি এবং ঝুঁকিপূর্ণ রোগীকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে দ্রুত স্থানান্তরে সময়ক্ষেপণ হয় এবং রোগীর ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া রোগী বা রোগীর ভিজিটরদের ব্যবহারের জন্য টয়লেটের স্বল্পতা রয়েছে। বহির্বিভাগের কিছু টয়লেট ব্যবহার অনুপযোগী।

আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সুবিধার ঘাটতি : হাসপাতালটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তরিত হলেও প্রয়োজনীয় সব রোগের চিকিৎসাব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি নেই। গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা যন্ত্রপাতি যেমন লিভার, গলব্লাডার, পিত্তনালি এবং অগ্ন্যাশয়ের অবস্থা নির্ণয়, পাথর অপসারণে ইআরসিপি যন্ত্র, এমআরআই যন্ত্র, চক্ষু এবং ডেন্টাল ইউনিটে যন্ত্রপাতি, স্কিনের চিকিৎসায় লেজার যন্ত্র, মেমোগ্রাফি, বায়োপসি, টিবি পরীক্ষার যন্ত্র, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট রোগীকে শক দেওয়ার জন্য ডিফিব্রিলেটর যন্ত্র নেই। বাইপাস সার্জারি, এনজিওগ্রামসহ জটিল রোগের চিকিৎসাব্যবস্থাও হাসপাতালটিতে নেই। এন্ডোসকপি ও কোলনস্কপি যন্ত্রটি পুরোনো হওয়ায় সেবা কার্যক্রম ব্যাহত হয়। এ ছাড়া অপারেশন থিয়েটারে আধুনিক যন্ত্রপাতির ঘাটতি রয়েছে।

হাসপাতালের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি : হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি রয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেবিনে গুমোট গন্ধ, স্যাঁতসেঁতে দেয়াল, ফ্যান ও জানালা নিয়মিত পরিষ্কার না করা এবং রাস্তায় রাখা বর্জ্য থেকে কেবিনে দুর্গন্ধ আসাসহ বিবিধ অভিযোগ রয়েছে। কেবিনের রোগীর শয্যার চাদর প্রতিদিন বদলানো হয় না, রোগীর পক্ষ থেকে বলা হলেও পরিবর্তন করা হয় না। এমনকি ভর্তির পর ৪-১৫ দিনের মধ্যে মাত্র এক দিন বিছানার চাদর পরিবর্তন করার অভিযোগ রয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তি এক শিশুর মা বলেন, 'হাসপাতালের সুন্দর রিসিপশন দেখে মনে হয় ভেতরটাও সুন্দর ও পরিপাটি। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে ভর্তি হয়েছি, না হলে শুধু অপরিষ্কার থাকার জন্য অন্য হাসপাতালে চলে যেতাম। একজন রোগী সুস্থ হওয়ার জন্য হাসপাতালে আসে, কিন্তু এই পরিবেশে এসে রোগী আরও অসুস্থ হয়ে যাবে, যাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো তারা এই হাসপাতালে সেবা নিতে আসবে না, আবার যারা একবার সেবা নিয়ে যাচ্ছে তারাও আর আসবে না।'

ভুল চিকিৎসা ও সেবা নিশ্চিতে উপযুক্ত পরিবেশের ঘাটতি : চিকিৎসাসেবা কাজে ডাক্তার ও নার্সদের গাফিলতি সম্পর্কে অভিযোগ রয়েছে। এতে কখনো কখনো রোগীরা শারীরিক ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যেমন রোগীর ফাইল চেক না করে সুন্নতে খাতনার রোগীর গলার টনসিল অপারেশন, কর্তব্যরত নার্স কর্তৃক নির্ধারিত ওষুধ না দিয়ে অন্য ওষুধ দেওয়ায় রোগীর অবস্থার অবনতি এবং আইসিইউতে ভর্তি করানো, ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু এবং হাসপাতালে বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি ঘটনার অভিযোগ রয়েছে।

ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের হাসপাতালে প্রবেশের দিন ও সময়সূচি নির্দিষ্ট থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে তা মানা হয় না। বহির্বিভাগে করিডরে মেডিকেল প্রতিনিধিদের ঘোরাঘুরি এবং সেবা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটানো, চিকিৎসক ও কর্মীদের বেতন অনিয়মিত হওয়া, দীর্ঘদিন গ্র্যাচুইটি অর্থ

বকেয়ার ঘটনায় কর্মীদের প্রতিবাদ সমাবেশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবরুদ্ধ করে রাখা, কখনো নার্স কর্তৃক রোগীর সাথে খারাপ আচরণ ও জরুরি প্রয়োজনে নার্সকে ডেকে না পাওয়া, রোগী থেকে বকশিশ আদায় ইত্যাদি ঘটনায় রোগীদের মনে উদ্বেগ ও হাসপাতাল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হয়।

প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রশাসনিক জনবল নিয়োগ : অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, কানসালট্যান্ট, রেজিস্ট্রার, মেডিকেল কর্মকর্তা, ইন্টার্ন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী দ্বারা হাসপাতালটি পরিচালিত হয়। ৫২৮ শয্যার হাসপাতালে ৬৫২ জনের অধিক জনবল রয়েছে। এর মধ্যে ৩০০ জনের অধিক প্রশাসনিক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। রাজনৈতিকভাবে নিয়োগের ফলে প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজনের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেওয়ার ঘটনা যেমন ঘটেছে, আবার হাসপাতালের প্রাত্যহিক চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনায় চিকিৎসক, নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি রয়েছে।[৯]

বিশেষ করে, নিজস্ব পরিচ্ছন্নতাকর্মীর স্বল্পতা রয়েছে। কর্মরত মোট ৫৫ জনের মধ্যে নিজস্ব মাত্র ১৯ জন। অধ্যাপক এবং জুনিয়র চিকিৎসকের স্বল্পতা, বহির্বিভাগ ও অন্তর্বিভাগের চিকিৎসা কার্যক্রম ব্যাহত হয় এবং সেবাগ্রহীতাদের অসন্তুষ্টি বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক কনসালট্যান্টও নেই। কনসালট্যান্ট রয়েছে মাত্র তিনজন। সার্জারি, আইসিইউ, সিসিইউ, আলট্রাসনোগ্রাম এবং রেডিওলজিতে চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালে কর্মরত কর্মীদের ২০৮ জনের সুনির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই যারা অলস সময় ও ছুটি কাটায় বলে অভিযোগ রয়েছে।[১০]

হাসপাতালে আর্থিক সামর্থ্যের ঘাটতি এবং আর্থিক অব্যবস্থাপনা : হাসপাতালের আর্থিক সামর্থ্যের ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক, নার্স ও কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-ভাতা অনিয়মিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। একটানা পাঁচ থেকে সাত মাসের বেতন বকেয়া থাকার নজির রয়েছে। গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড, ওষুধ কোম্পানির কাছে বকেয়া ওষুধের দামসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কাছে টাকা বকেয়া রয়েছে। অবসর নেওয়া ২৩৬ জন কর্মীর এককালীন গ্র্যাচুইটির অর্থ বকেয়া থাকার অভিযোগ রয়েছে।[১১] অবসরের পর গ্র্যাচুইটির টাকা এককালীন দেওয়ার কথা থাকলেও টাকা না দেওয়ায় ডাক্তার, নার্স ও কর্মীরা আদালতে মামলা করেন।

৩১ ডিসেম্বর ২০২১-এর তথ্য অনুযায়ী, হাসপাতালে বেতন বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ডে টাকার ঘাটতি প্রায় ৮ কোটি টাকা, হাসপাতালের কাছে ওষুধ কোম্পানির বকেয়া প্রায় ৪ কোটি টাকা, অবসরপ্রাপ্তদের গ্র্যাচুইটির প্রায় ৩১ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে প্রায় ১৮ লাখ টাকা বকেয়া রয়েছে।[১২] বাজেট স্বল্পতায় হাসপাতালের সেবা সম্পর্কিত প্রচারণা কার্যক্রমেও ঘাটতি রয়েছে। স্বল্প পরিসরে লিফলেট, সাইনবোর্ড, ব্যানার তৈরি করা হয় এবং তা পর্যাপ্ত নয়। এতে সাধারণ জনগণ হাসপাতালের সুনির্দিষ্ট সেবা সম্পর্কে অবগত হতে পারে না।

হাসপাতালের আয়ের সবচেয়ে বড় খাত কেবিন বা সিট ভাড়া। কিন্তু রোগী কমে ৫২৮ শয্যার হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ রোগী থাকায় হাসপাতালের আয় হ্রাস পেয়েছে। এ ছাড়া, ল্যাবরেটরি, ফার্মেসি, মেডিকেল ও সার্জিক্যাল, অপরেশন ও রুম চার্জ থেকে আয় ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। আয় বৃদ্ধিতে যথাযথ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়েছে।

তথ্য প্রকাশ ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি

তথ্য অধিকার আইনে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কিন্তু হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ও তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার প্রবিধানমালা ২০১০-এর ধারা অমান্য করার উদাহরণ রয়েছে। প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশসহ আইনের ধারা ৬-এ বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী সাংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াসংক্রান্ত তথ্য প্রতিষ্ঠানটি প্রকাশ করেনি। নাগরিক তথ্য অধিকার নিশ্চিতে হাসপাতালে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা এবং বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর ও ইমেইলও প্রকাশ করেনি।

হাসপাতালের ওয়েবসাইটে হাসপাতাল সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয় তথ্যের অনুপস্থিতি রয়েছে। আয় ও ব্যয়সহ হাসপাতালের সম্ভাব্য বাজেট, নিরীক্ষা প্রতিবেদন, প্রতিবছর সেবাগ্রহীতার সংখ্যা, জনবল, অবকাঠামো, লজিস্টিকস, সংশ্লিষ্ট বিধি ও আদেশ, ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করেনি। এ ছাড়া *বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সেন্ট্রাল ডেটা অ্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম* ওয়েবসাইটটিতে হাসপাতাল সম্পর্কিত কোনো তথ্য নেই।[১৩]

হাসপাতাল কার্যক্রমের ওপর পৃথক বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুপস্থিতি রয়েছে। বিডিআরসিএস কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে হাসপাতাল সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতাল সম্পর্কিত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তথ্য সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও জনসম্মুখে প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। যেমন হাসপাতাল প্রদত্ত সেবা, সেবামূল্য, সেবা প্রদানের সময়সূচি, সেবাপদ্ধতি, কর্তব্যরত চিকিৎসকের পূর্ণাঙ্গ তালিকা, এলাকা ও দূরত্ব অনুযায়ী অ্যাম্বুলেন্স সেবার মূল্য তালিকা জনসম্মুখে প্রদর্শন করা হয়নি। চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য হলেও এ ধরনের তথ্য নাগরিক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রদান করা হয়নি এবং তথ্য প্রাপ্তির জন্য সাক্ষাৎকার চেয়ে প্রতিষ্ঠানটিতে পাঠানো চিঠির কোনো জবাব দেয়নি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

হাসপাতালের সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অনুদানের তথ্য প্রচারে ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালের প্রাপ্ত অনুদান সম্পর্কে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের নথি সংরক্ষণ ও প্রচারে ঘাটতি রয়েছে। এ ক্ষেত্রে শুধু অনুদানের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক হাসপাতাল প্রাঙ্গণে একটি বোর্ড টানানো রয়েছে যা এপ্রিল ২০১৫ থেকে এপ্রিল ২০২১ পর্যন্ত সময়ের। অনুদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও এ-সংক্রান্ত রেজল্যুশন, প্রাপ্ত অনুদানের তারিখ, টাকার পরিমাণ, চেক নম্বর, দানের উদ্দেশ্য এবং দানের প্রক্রিয়া উল্লেখপূর্বক কোনো নথি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। অনুদানের অর্থে খরচের সুনির্দিষ্ট তথ্য, অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের নথি সংরক্ষণ এবং ঘোষণাকৃত অনুদানের টাকায় সম্পাদিত কাজের সত্যতা যাচাইয়েরও সুযোগ নেই। এ ছাড়া এ-সংক্রান্ত খরচের পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদনও নেই।

এ ছাড়া উৎসভেদে (সরকার, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে) হাসপাতালের আয়ের হিসাব সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। ২০১৯-২০২২ সময়ে প্রকৃত আয় প্রকৃত ব্যয় থেকে বেশি

হলেও হাসপাতালের অনেক খাতে অর্থ বকেয়া ও ঘাটতি রয়েছে। মুনাফা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন খাতে বকেয়া থাকার কারণ সম্পর্কে কোনো সঠিক ব্যাখ্যা জানা যায়নি।

জবাবদিহির ঘাটতি

হাসপাতাল পরিচালনা কার্যক্রমে জবাবদিহি ও তদারকি ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালটি পরিচালনায় চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালের উন্নয়নকাজ, অনুদানের অর্থের আয়-ব্যয়সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজের সিদ্ধান্ত ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভায় আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণের কথা থাকলেও তা করা হয় না। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হওয়ায় হাসপাতালের পরিচালক নিয়োগ ও পদায়নেও চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত পছন্দ এবং দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ, ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কর্মীদের চাকরিচ্যুতি ও ঢাকার বাইরে বদলির অভিযোগ রয়েছে। এনাম কমিশনের সুপারিশ অনুসারে হাসপাতালের নিজস্ব মানবসম্পদকাঠামো প্রস্তুত করা হয়নি। ফলে বিভিন্ন সময় হাসপাতালে অপরিকল্পিত এবং অপ্রয়োজনীয় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এতে হাসপাতালের অর্থের অপচয় ও ক্ষতি বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকবল ও রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস এবং অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করা ও অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিচার না করার অভিযোগ রয়েছে।

বিডিআরসিএস প্রণীত কমপ্লিন রেসপন্স মেকানিজম গাইডলাইন[১৪] থাকলেও অভিযোগ প্রদান ও প্রতিকারব্যবস্থা কার্যকর নয় এবং অভিযোগ করলে কর্তৃপক্ষ তা প্রতিকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। হাসপাতালে অভিযোগ বাক্স রয়েছে, তবে সেবা সম্পর্কিত অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণার ঘাটতি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের কাছে মৌখিকভাবে অভিযোগ জানালেও তার প্রতিকার করা হয়নি। হাসপাতালের বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপনপূর্বক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলেও হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রমের দুর্বলতা বিশ্লেষণপূর্বক নথি নেই।

অনিয়ম ও দুর্নীতি

সরকারি ও বেসরকারি (বাণিজ্যিক) হাসপাতালের ন্যায় হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম-দুর্নীতির চিত্র সম্পর্কে জানা যায়।

লাইসেন্স নবায়ন : হাসপাতালের লাইসেন্স নিয়মিত নবায়ন করা হয় না। ২০২১ সালে তিন বছরের নবায়ন একত্রে করা হয়। লাইসেন্স পুনঃনবায়ন ছাড়াই হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০২১-২২ সালের নবায়ন সম্পন্ন না করেই কর্তৃপক্ষ হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

পরিচালকদের স্বাধীনভাবে কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা : রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নির্বাচন করা হয়েছে। চেয়ারম্যানের কথামতো কাজ না করায় হাসপাতাল পরিচালকের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অভিযোগ রয়েছে এবং পরিচালক পরিবর্তন হলে হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে অজুহাতে ঘন ঘন পরিচালক পরিবর্তন করার ঘটনা ঘটেছে।

নিয়োগ বা পদায়ন ও পদোন্নতি : হাসপাতালে জনবল নিয়োগ, পদায়নে চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত পছন্দ ও দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য দেওয়া হয়। হাসপাতালে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগেও দলীয় প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, এলাকার পরিচিতি বিবেচনায় নিয়োগ দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। ডাক্তার নিয়োগে অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে- চাকরিপ্রার্থীদের কাছে ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ চাওয়া হয়েছে। হাসপাতাল পরিচালক ও সিনিয়র ডাক্তারের সুপারিশে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে চিকিৎসক ও কর্মচারী নিয়োগেরও অভিযোগ রয়েছে। অদক্ষ কর্মীদের নিয়োগ দেওয়া এবং নিয়োগকৃতদের সংশ্লিষ্ট বিভাগে কাজের শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকার অভিযোগসহ কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মীদের দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে।

পদোন্নতিতে দলীয় প্রভাবের অভিযোগ রয়েছে। কর্মীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ও পদোন্নতিতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা, অনেক ক্ষেত্রে মূল্যায়ন ও পদোন্নতিতে প্রয়োজনীয় কাগজ যেমন এমপ্লয়মেন্ট রিকুইজিশন ফরম পূরণ, ইন্টারভিউ, বিজ্ঞাপন প্রকাশ, পদোন্নতি ও ইনক্রিমেন্টের ভিত্তি, জব ডেসক্রিপশন ইত্যাদি নথি ছাড়াই মূল্যায়ন করা ও পদোন্নতি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালের কর্মকর্তা, সেবিকা, কর্মচারীদের বেতন গ্রেডে অসংগতি বা বৈষম্যের অভিযোগ এবং প্রাপ্যের চেয়ে বেশি বেতন স্কেল প্রদানের ঘটনা ঘটেছে। অদক্ষদের পদোন্নতি প্রদান এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীকে জুনিয়র অফিসার পদে পদোন্নতি প্রদানেরও অভিযোগ রয়েছে।

চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও কমিশন : বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক হাসপাতালের বহির্বিভাগে নিয়মিত রোগী দেখা এবং চিকিৎসকের মাধ্যমে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর চিকিৎসাসেবা দেওয়া হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা হাসপাতালের বাইরে প্রাইভেট চেম্বার করেন এবং ইন্টার্ন ডাক্তারের মাধ্যমে রোগীকে চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চেম্বারে যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে ভিজিটিং কার্ড প্রদান করেন। বিভিন্ন অজুহাতে অধ্যাপক ও চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখানোর পরামর্শ দেওয়া হয়। *'হলি ফ্যামিলিতে চিকিৎসক নিয়মিত বসেন না, ওনার জুনিয়ররা বসে, হাসপাতালে ভর্তি হলে খরচ কমাতে পারবে না, তাদের মনোনীত হাসপাতালে ভর্তি হলে কম খরচে সেবা দিতে পারবে, এখানে সিজার করালে জুনিয়ররা করবে, তিনি করবেন না'*– এ ধরনের কথা বলে রোগীদের অন্য প্রতিষ্ঠানে যেতে উদ্বুদ্ধ করার ঘটনা ঘটে থাকে, যেখানে চিকিৎসকের ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে।

হাসপাতাল প্রদত্ত পরীক্ষার প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সন্দেহ দূর করা এবং নিশ্চিত হয়ে সেবা প্রদানের অজুহাতে রোগীকে হাসপাতালের বাইরের প্রতিষ্ঠান থেকে প্যাথলজি পরীক্ষা ও আলট্রাসনোগ্রাম করানোর পরামর্শ প্রদান করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কখনো কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থে হাসপাতালের যন্ত্র নষ্ট করে রাখার অভিযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে টেকনিশিয়ান কর্তৃক বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে অর্থ আয়, পাশাপাশি হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল থেকে রোগী পাঠিয়ে কমিশন পেয়ে থাকে। হাসপাতালে ফিজিওথেরাপি সেবা নিতে আসা রোগীদের সংশ্লিষ্ট কর্মী কর্তৃক বাসায় গিয়ে সেবা প্রদানের অভিযোগ রয়েছে। আবার কমিশনের লোভে হাসপাতাল স্টাফ কর্তৃক রোগীদের বেসরকারি বাণিজ্যিক অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারে উৎসাহিত করা হয় বলে তথ্যদাতারা জানান।

ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনে বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের সাথে অসম চুক্তি সম্পাদন : কিডনি রোগীদের উন্নত চিকিৎসা-সুবিধা প্রদানে ডায়ালাইসিস সেন্টারে প্রয়োজনীয় যন্ত্র ও শয্যাসংখ্যা বৃদ্ধিতে হাসপাতাল ও

বিতর্কিত জেএমআই হসপিটাল রিকুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে হাসপাতালে একটি বিশেষায়িত ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন করা হয় (ডিসেম্বর ২০২০)। হাসপাতালের ২০ শয্যার একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ডায়ালাইসিস সেন্টার থাকা সত্ত্বেও নতুনভাবে প্রতিষ্ঠানটির সাথে চুক্তি করা হয়। এটি একটি অসম চুক্তি এবং 'শুভংকরের ফাঁকি' বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা জানায়।

চুক্তিতে ২০টি মেশিন সরবরাহ করার কথা থাকলেও ১২টি মেশিনের মাধ্যমে কাজ চলছে। এর মধ্যে ৮টি মেশিন জেএমআই কর্তৃক সরবরাহকৃত, বাকি চারটি হাসপাতালের নিজস্ব। জেএমআইকে সুবিধা দিতে হাসপাতালের নিজস্ব মেশিন অকেজো রাখার অভিযোগ রয়েছে। চুক্তিতে ডায়ালাইজার সর্বোচ্চ চারবার ব্যবহারের উল্লেখ এবং প্রতিবার রোগী প্রতি টাকা আদায়ের পরিমাণ নির্ধারিত থাকলেও পুনর্ব্যবহারে জেএমআই কত টাকা পাবে তার উল্লেখ নেই। এ কাজে জেএমআইয়ের প্রশাসনিক কোনো খরচ (সেন্টার প্রতিষ্ঠায় অগ্রিম বাড়ি ভাড়া, মাসিক ভাড়া, চিকিৎসক, নার্স ও কর্মচারীর বেতন ইত্যাদি) না হলেও লাভের বড় একটি অংশ গ্রহণ করছে। আবার ডায়ালাইজার সর্বোচ্চ চারবার ব্যবহার সম্পর্কে বলা থাকলেও একবার ব্যবহারের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এতে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বেশি পরিমাণে অর্থ আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। উল্লেখ্য, জেএমআই কর্তৃক সরবরাহকৃত একসেসরিজ (ফ্লুইড, ব্লাড লাইন, ক্যানুলা, গ্লাভস) ব্যবহারে রোগী প্রতি ২ হাজার ৬৫০ টাকার মধ্যে ১ হাজার ৫০০ টাকা (৫৬ দশমিক ৬ শতাংশ) জেএমআই গ্রহণ করছে।

চুক্তিতে জেএমআইয়ের লভ্যাংশ প্রতিবছর ৪ শতাংশ হারে বাড়ানোর সুযোগ এবং সেন্টারের চিকিৎসক, নার্স ও কর্মচারীর বেতন, মাসিক ভাড়া ইত্যাদি খরচ না হলেও লাভের বড় অংশ জেএমআই গ্রহণ করছে। এ ছাড়া ডায়ালাইসিস বিভাগ থেকে ব্যক্তিস্বার্থে রোগীকে বাইরের প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতাল উক্ত ইউনিট প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখনো লাভ করতে না পারলেও প্রতি মাসে জেএমআইকে বিল দিয়েছে। ফলে এ খাত থেকে হাসপাতালের আয় ২০১৯ সালে প্রায় ১ দশমিক ৫ কোটি টাকা থেকে ২০২০ সালে প্রায় ৭১ লাখ, ২০২১ সালে প্রায় ৫১ লাখে এসে দাঁড়ায়।[১৫]

ক্রয় ও সংস্কার : হাসপাতালের ক্রয়-প্রক্রিয়ায় নির্ধারিত পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। নির্দিষ্ট সীমা বা তিন লাখ টাকার বেশি ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান না করে প্রাইস কোটেশন পদ্ধতি অনুসরণ, একই ব্যক্তি থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে প্রাইস কোটেশন সংগ্রহ ও পছন্দের ব্যক্তিকে কাজ দেওয়া হয়েছে। তুলনামূলক প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠান ও পণ্যের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক মূল্যায়ন না করে একক বিক্রেতাকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চিকিৎসা সরঞ্জাম যেমন ওটি লাইট, ওটি টেবিল, ভেন্টিলেটর চলতি বাজার দরের চেয়ে বেশি দামে ক্রয় করা হয়েছে। নির্দিষ্ট দোকান থেকে ক্রয়ে কমিশন হিসেবে এসি, টিভি, ফ্রিজ, ওভেন, ওয়াশিং মেশিন নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, ট্রেড লাইসেন্স, ট্যাক্স শনাক্তকরণ নম্বর, ভ্যাট নিবন্ধন নম্বর সঠিকভাবে যাচাই না করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। বৃহৎ ক্রয়ে প্রতিযোগিতামূলক ও উন্মুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। এসি, স্টিল, সিমেন্ট ও নির্মাণসামগ্রী ক্রয় এবং ক্রয়সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে নথিতে উল্লিখিত ঠিকানায় না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

এ ছাড়া বিল প্রদানে কর এবং ভ্যাট না কেটে বিল প্রদান এবং সরকার রাজস্ব হারানোর অভিযোগ রয়েছে। নগদ অর্থ পরিশোধে নির্ধারিত সীমা (১০ হাজার টাকা) লঙ্ঘন করে প্রায় ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত নগদ প্রদান করা হয়েছে। কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন না করলেও সম্পূর্ণ বিল প্রদান, কার্যাদেশে উল্লিখিত টাকার অতিরিক্ত বিল প্রদানে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ না করা এবং এ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নথি হাসপাতালে না থাকার নজির রয়েছে।

রোগীর পথ্য দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে ক্রয় করা হয় না। স্থানীয়ভাবে বাজার কমিটি গঠন করে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে এ ক্ষেত্রে অনিয়মের সুযোগ তৈরি হয়েছে। কমিটির সবাই বাজারে না যাওয়ায় শুধু খাদ্য বিভাগের লোকদের দিয়ে বাজার করানো হয়। মুরগি, চাল, সবজি ইত্যাদি পরিমাণে কম ক্রয় করে ভাউচারে বেশি দেখানো হয় এবং বাজারমূল্য থেকে বেশি মূল্য দেখানো হয়। এ ছাড়া হাসপাতালের ক্যানটিন বরাদ্দেও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

হাসপাতালের প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি, যেমন প্রিন্টার টোনার, খাতা, কলম, গ্লাভস, সুই, সুতা, বাল্ব, তোয়ালে, জুতা, টিস্যু, ব্যাগ, পর্দা ইত্যাদি ক্রয়ে বাজারমূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে ক্রয় রসিদ প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করা হলেও তা যাচাই করা হয় না। এ ছাড়া গাইনি ওয়ার্ড, কেবিন/সেমি-কেবিন, হাসপাতালের সামনের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ, বহির্বিভাগের স্যুয়ারেজ লাইন মেরামতসহ বিধি সংস্কার এবং আধুনিকায়নের কাজে প্রকৃত খরচের চেয়ে অধিক খরচ দেখানোর অভিযোগ রয়েছে।[১৬]

হাসপাতালে ভর্তি রোগীর চিকিৎসায় সব ওষুধ না লাগা সত্ত্বেও কখনো কখনো বিল পরিশোধ করানো এবং ক্ষেত্রবিশেষে রোগীর ওষুধ চুরি হওয়ার ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে সব সময় সব ধরনের ওষুধের সরবরাহ থাকে না। এ সুযোগে মেডিকেল প্রতিনিধিরা হাসপাতালের নার্স, ফার্মেসি কর্মী, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের একাংশের মধ্যস্থতায় সরাসরি ওষুধ বিক্রি করেন। ওষুধ বাজারজাতকরণে ওষুধ কোম্পানি থেকে চিকিৎসকদের গাড়ি সার্ভিসিং, ল্যাপটপ, মোবাইল সেট, আসবাব, এসি, টিভি, ফ্রিজ, নগদ অর্থসহ বিভিন্ন ধরনের গিফট গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। রি-এজেন্ট ব্যবহারে পর্যাপ্ত রোগী না হওয়ায় তা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া এবং কর্মরত টেকনিশিয়ান কর্তৃক রি-এজেন্ট চুরি এবং অন্যত্র বিক্রির অভিযোগ রয়েছে।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

গবেষণার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও সুশাসনের বিবিধ চ্যালেঞ্জ প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। হাসপাতালটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ দুর্বল। ক্ষেত্রবিশেষে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালাও অনুপস্থিত। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট আইনে দুর্বলতাসহ প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যমান আইন প্রতিপালন এবং এর কার্যকর প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। চেয়ারম্যানের একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং হাসপাতাল পরিচালনা কার্যক্রমে তার অবারিত হস্তক্ষেপ প্রতিষ্ঠানটিতে জবাবদিহি নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিসহ সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করেছে। হাসপাতালের লাইসেন্স নিয়মিত নবায়ন না করা, ক্রয় আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বাংলাদেশ মেডিকল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল-সংক্রান্ত আইন ও বিধান অমান্য করলেও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহি নিশ্চিত করা হয়নি। হাসপাতালের জন্য

পৃথক জনবলকাঠামো না থাকায় অপরিকল্পিত নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতিসহ হাসপাতালের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জবাবদিহি নেই। একটি মানবিক সহায়তা সংস্থা এবং রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের অংশ হলেও হাসপাতালটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক অনুদান এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব সঠিকভাবে নথিভুক্ত করেনি যা অংশীজনদের আস্থার সংকট তৈরি করেছে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানটিতে আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়নি। ফলে হাসপাতাল কার্যক্রমে অস্বচ্ছতা ও অব্যবস্থাপনার সাথে সাথে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। হাসপাতালটি আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, সুবিধা ও সেবার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতেও ব্যর্থ হয়েছে। বিবিধ সক্ষমতার ঘাটতি পূরণ ও আয় বৃদ্ধিতে যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের ঘাটতিও লক্ষণীয়। প্রতিষ্ঠানটিতে অদক্ষ কর্মীদের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি প্রদান করার মাধ্যমে অনিয়ম ও দুর্নীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করা হয়েছে। অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, অসম চুক্তিসহ বিবিধ দুর্নীতির কারণে চিকিৎসাসেবার মান নিম্নগামী হয়েছে, সুনাম নষ্ট হয়েছে, রোগীর সংখ্যা ও হাসপাতালের আয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে অন্য হাসপাতালের সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়ে ক্রমেই একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি, হাসপাতালটিতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতির পরিপন্থী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে, যা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বিনষ্ট করছে।

সুপারিশমালা

গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো−

নীতিকাঠামো

১. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অর্ডার, ১৯৭৩ বা প্রেসিডেন্টস অর্ডার নং ২৬, ১৯৭৩ সংশোধন করে চেয়ারম্যানের একক ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে। আয়-ব্যয়, কার্যক্রম ও নীতি-সিদ্ধান্ত বোর্ড সভার সবার সম্মতির ভিত্তিতে গৃহীত হতে হবে এবং বোর্ডের কাছে জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হতে হবে।

২. হাসপাতালের জন্য একটি কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত মানবসম্পদ কাঠামো বা অর্গানোগ্রাম তৈরি করতে হবে।

৩. একটি পৃথক বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে হাসপাতালটির ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সব স্তরের কর্মীর নিয়োগ, পদোন্নতি, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে তাদের জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক

৪. হাসপাতালটির সুনাম পুনরুদ্ধার এবং হাসপাতালে সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বচ্ছতা

৬. হাসপাতালে আয়-ব্যয় এবং ক্রয়সহ সব ধরনের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। একটি বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা তৈরি এবং সব ধরনের ক্রয় নিয়ম মেনে সম্পাদন করতে হবে।

৭. তথ্য অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী হাসপাতালের বিভিন্ন তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষকে নিচের বিষয়গুলোয় পদক্ষেপ গ্রহণ নিতে হবে–

- হাসপাতালের আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব নিশ্চিতে সব ধরনের নথিপত্র সংরক্ষণ ও নিয়মিতভাবে বার্ষিক ভিত্তিতে খ্যাতিসম্পন্ন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা করতে হবে;
- প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়সহ প্রশাসনিক সব কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনতে হবে;
- হাসপাতালের ওয়েবসাইটে প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সম্পর্কিত তথ্যের নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;
- হাসপাতাল প্রদত্ত সব সেবা, সেবা মূল্য, সেবা প্রদানের সময়সূচি ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক একটি পরিপূর্ণ নাগরিক সনদ এবং তথ্যবোর্ড প্রণয়ন ও এটি হাসপাতালের প্রধান ফটকে প্রদর্শন করতে হবে। বিভাগ অনুযায়ী কর্তব্যরত চিকিৎসকের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন ও প্রদর্শন করতে হবে;
- হাসপাতালের সেবা সম্পর্কে জনগণকে জানাতে এবং উৎসাহিত করতে প্রচার বাড়াতে হবে।

জবাবদিহি এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

৮. চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবাবদিহি নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনভিত্তিক বার্ষিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

৯. সব ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের যথাযথ প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করে কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. হাসপাতাল পরিচালনা ও তদারকিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি স্বাধীন হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

১১. সেবাগ্রহীতা কর্তৃক অভিযোগ দাখিলে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভিযোগ নিরসন করে সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে।

১২. হাসপাতালের সব ধরনের ক্রয়ে সংশ্লিষ্ট আদেশ ও নিয়মনীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

১৩. হাসপাতালের সব ধরনের নিয়োগ ও পদোন্নতি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, পক্ষপাতহীন এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হতে হবে।

১৪. কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক আচরণবিধি প্রবর্তন এবং এটি তাদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বিস্তারিত দেখুন- https://bdrcs.org/who-we-are ; https://bdrcs.org/mission-vision/,সর্বশেষ ভিজিট: ৯ ডিসেম্বর ২০২১।

[২] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইট, বিস্তারিত দেখুন- https://bdrcs.org/bdrcs-annual-report-2019/, পৃষ্ঠা-৫৫; সর্বশেষ ভিজিট: ০৯ ডিসেম্বর ২০২১।

[৩] দি মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২, বিস্তারিত দেখুন- http://bdcode.gov.bd/upload/bdcodeact/2020-11-18-16-54-35-638_Ordinance_No_IV_of_1982_final_26_04_2006.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ১০ এপ্রিল ২০২৩।

[৪] বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অর্গানোগ্রাম, বিস্তারিত দেখুন- https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2020/11/BDRCS-Organizational-Structure.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ২০ জুন ২০২৩।

[৫] *বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর.কম*, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত দেখুন- https://bangla.bdnews24.com/health/article1802394.bdnews; *প্রথম আলো*, ৮ অক্টোবর ২০১৩, বিস্তারিত দেখুন- https://www.prothomalo.com/bangladesh/সংকটে-হলি-ফ্যামিলি-হাসপাতাল; *সমকাল*, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬, বিস্তারিত দেখুন- https://samakal.com/bangladesh/article/1612256609; *ডিবিসি নিউজ*, ৬ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত দেখুন- https://dbcnews.tv/articles/হলি-ফ্যামিলিতে-নিয়োগ-পদোন্নতি-ও-বেতনে-ব্যাপক-অনিয়ম; *বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম*, ১৬ নভেম্বর ২০১৭, বিস্তারিত দেখুন- https://www.banglanews24.com/health/news/bd/617600.details; সর্বশেষ ভিজিট: ০১ মে ২০২৩; বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, নিউজ লেটার, ব্যবস্থাপনা পর্ষদ নির্বাচন ২০২১-২০২৩।

[৬] বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বিস্তারিত দেখুন- https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2020/12/Safety-Security-Policy-and-Guideline_Bangla.pdf, পৃষ্ঠা-৪৯ ও ৫০।

[৭] বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বিস্তারিত দেখুন- https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2020/11/PO26.pdf, সর্বশেষ ভিজিট: ০১ মে ২০২৩।

[৮] বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বিস্তারিত দেখুন- https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2021/06/Human-Resource-HR-Policy-.pdf।

[৯] ডিবিসি নিউজ, ৬ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত, https://dbcnews.tv/news/হলি-ফ্যামিলিতে-নিয়োগ-পদোন্নতি-ও-বেতনে-ব্যাপক-অনিয়ম/; বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত, https://bangla.bdnews24.com/health/article1802394.bdnews, সর্বশেষ ভিজিট: ১২ মার্চ ২০২৩।

[১০] প্রাগুক্ত।

[১১] সারা বাংলা, ১৩ নভেম্বর ২০১৮, বিস্তারিত দেখুন- https://sarabangla.net/post/sb-168687/, সর্বশেষ ভিজিট: ১৪ এপ্রিল ২০২৩

[১২] হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, অডিট রিপোর্ট, ২১ ডিসেম্বর ২০২২।

[১৩] বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বিস্তারিত দেখুন- https://bdrcsmisweb.azurewebsites.net/, সর্বশেষ ভিজিট: ২০ জুন ২০২৩।

[১৪] বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বিস্তারিত দেখুন-https://bdrcs.org/guideline-on-complaints-response-mechanism-crm/, সর্বশেষ ভিজিট: ১৫ জুন ২০২৩।

[১৫] হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, অডিট রিপোর্ট, ২০২০ এবং অডিট রিপোর্ট ২০২১।

[১৬] পর্যালোচনা: Public Procurement Act, 2006 and Public Procurement Rules 2008; Income Tax (Ordinance) 1984; Vat Act 2012; BDRCS Standing Orders on Finance Management; Standing Orders; Report on Independent Forensic and Investigative Audit on Renovation and Purchase of Medical/electrical/electronic equipment and other accessories at Holy Family Red Crescent Medical College and Hospital-HFRCMcH, November 2021.

ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন*

ফারহানা রহমান ও মো. সাজেদুল ইসলাম

প্রেক্ষাপট

দারিদ্র্যবিমোচন বর্তমান সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত বিষয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনার (২০২১-২০৪১) দারিদ্র্য ও বৈষম্য সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রায় ২০৪১ সালের মধ্যে দেশের চরম দারিদ্র্য নির্মূল করা এবং দারিদ্র্যের হার ন্যূনতম পর্যায়ে নিয়ে আসার অঙ্গীকার করা হয়েছে।[১] এরই পরিপ্রেক্ষিতে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা[২] ও বিগত কয়েকটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ও বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ ছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)[৩] এর লক্ষ্য ১.১-এ ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের অবসান ও লক্ষ্য ১.২-এ দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী সব বয়সের নারী, পুরুষ ও শিশুর সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা এবং লক্ষ্য ২.১-এ ক্ষুধার অবসান ঘটানোর অঙ্গীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশে চরম দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদের উন্নয়ন এবং এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের উদ্দেশ্যে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সামাজিক সুরক্ষা বা নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বহুল আলোচিত। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রকার কার্যক্রমের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ইতিবাচক ভূমিকা বা প্রভাব বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে উঠে এসেছে।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের একটি অগ্রাধিকার খাত, যা ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। এসডিজিতে প্রস্তাবিত কর্মপন্থার সাথেও এই ক্রমবর্ধমান বাজেট বরাদ্দ সামঞ্জস্যপূর্ণ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১ লাখ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা, যা জাতীয় বাজেটের** ১৬ দশমিক ৫৮ শতাংশ এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১ লাখ ১৩ হাজার ৫৭৬ কোটি টাকা। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় প্রায় ১১৫টি কর্মসূচি রয়েছে, যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি, খোলাবাজারে বিক্রি (ওএমএস), 'ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি)***, খাদ্য ভর্তুকি, কর্মসংস্থান কর্মসূচি, বিধবা এবং স্বামী পরিত্যক্ত নারীদের ভাতা, কাজের বিনিময়ে টাকা

*২০২৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর টিআইবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত পর্যালোচনা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

**২০২৩-২৪ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট ৭,৬১,৭৮৫ কোটি টাকা।

*** ভিডব্লিউবি উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় বিতরণ করা হয়। ভিডব্লিউবি/ভিজিডি'র ক্ষেত্রে দুই বছর পরপর উপকারভোগী পরিবর্তন করে নতুন দরিদ্র নারীদের পরবর্তী দুই বছরের জন্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছর থেকে ভিজিডির নাম পরিবর্তন করে ভিডব্লিউবি করা হয়েছে।

(কাবিটা), টেস্ট রিলিফ (টিআর), দরিদ্র মাতাদের মাতৃত্বকালীন ভাতা, ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), দুর্যোগ-পরবর্তী দরিদ্রদের সহায়তা ভাতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীরা অন্যদের তুলনায় বেশি এবং বহুমুখী প্রতিকূলতার শিকার। দুস্থ নারীর দারিদ্র্য বিমোচনে বিভিন্ন প্রকার সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি অন্যতম, যা আগে ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট বা দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি)[৪] নামে পরিচিত ছিল। ভিডব্লিউবি কার্যক্রমে বর্তমান চক্রের (২০২৩-২০২৪) মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ১০ লাখ ৪০ হাজার এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের সংশোধিত বাজেট ১ হাজার ৯৪০ কোটি ২৬ লাখা টাকা ও ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ কার্যক্রমের বাজেট ২ হাজার ২৯ কোটি ১০ লাখ টাকা।

ভিডব্লিউবি কর্মসূচি : সূচনা, বিকাশ ও বাস্তবায়ন

১৯৭৪ সালের ৩ অক্টোবর বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে দরিদ্র মানুষের জন্য খাদ্যসহায়তা কার্যক্রম শুরু হয়। পরে ১৯৮২ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় অধীনে দুস্থ মহিলা উন্নয়ন (ভিজিডি) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৮৮ সালে এ কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করে উন্নয়ন কার্যক্রমে উন্নীত করা হয়। উপকারভোগীরা শতভাগ মহিলা হওয়ায় ১৯৯৬ সালে ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয় হতে এ কর্মসূচি মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৪ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে কর্মসূচিটি পরিচালিত হয়। ২০১০-এর অক্টোবর থেকে বাংলাদেশ সরকারের একক অর্থায়নে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে ভিজিডি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এই কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের মুখ্য দায়িত্ব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের। ২০১৫ সালে জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (এনএসএসএস) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা একীভূত করে এ কর্মসূচির নাম পরিবর্তন করে ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) প্রস্তাব করা হয়। তবে সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তর দুটি ভাতা একসঙ্গে করার বিষয়ে একমত হতে পারেনি। তাই কর্মসূচিগুলো আলাদা রেখে ২০২২ সালে তিনটি অগ্রাধিকার শর্ত যুক্ত করে এই ভাতার নাম পরিবর্তন করে ভিডব্লিউবি করা হয়।

ভিজিডি কর্মসূচি প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন ২০১২ অনুযায়ী, ভিজিডি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পর উপকারভোগী পরিবারের গড় মাসিক আয় ৭৮ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায় (২ হাজার ২৭১ টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪ হাজার ৫৩ টাকা)।[৫] এ প্রতিবেদনের পাশাপাশি অন্যান্য মূল্যায়ন প্রতিবেদনেও দেখা যায়, উপকারভোগীর খাদ্যনিরাপত্তা এবং আবাসনের গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে।[৬] সরকারি এই কর্মসূচি দারিদ্র্য হ্রাস করতে এবং আয়-উৎপাদনমূলক কার্যক্রম তৈরি করতে

উপকারভোগীদের সহায়তা করলেও উপকারভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রায়ই বিভিন্ন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। এ ছাড়া ভিজিডি বা ভিডব্লিউবি কার্যক্রমে উপকারভোগীদের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বা তালিকাভুক্তিতে অনিয়ম দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইতিপূর্বে ভিজিডি কর্মসূচির প্রভাব, অন্তর্ভুক্তি ও বিতরণে সুশাসন সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা হলেও দুস্থ নারীদের উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচনে অন্তর্ভুক্তি ও বর্জন সংশ্লিষ্ট শর্তাবলি কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে– এ নিয়ে মাঠপর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে টিআইবি প্রথম ২০১৫ সালে নির্বাচিত উপকারভোগীদের তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের উদ্যোগ নেয়। যার উদ্দেশ্য উপকারভোগী নির্বাচনে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করা। টিআইবির অনুপ্রেরণায় পরিচালিত সচেতন নাগরিক কমিটির (সনাক) সহায়তায় ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) সদস্যরা গত তিন চক্রে (২০১৯-২০, ২০২১-২২, ২০২২-২৩) সর্বমোট ৪৩টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ১০১টি উপজেলার তালিকা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করে। কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট উপজেলার সবগুলো ইউনিয়নে তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা হয় এবং এর ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন তালিকা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। এ প্রতিবেদনে বিগত তিনটি চক্রের উপকারভোগী নির্বাচনের তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের (যা একই পদ্ধতিতে করা হয়েছে) তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলাফল তুলে ধরা হয়েছে।

চিত্র-১ : ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর তালিকাভুক্তির প্রক্রিয়া

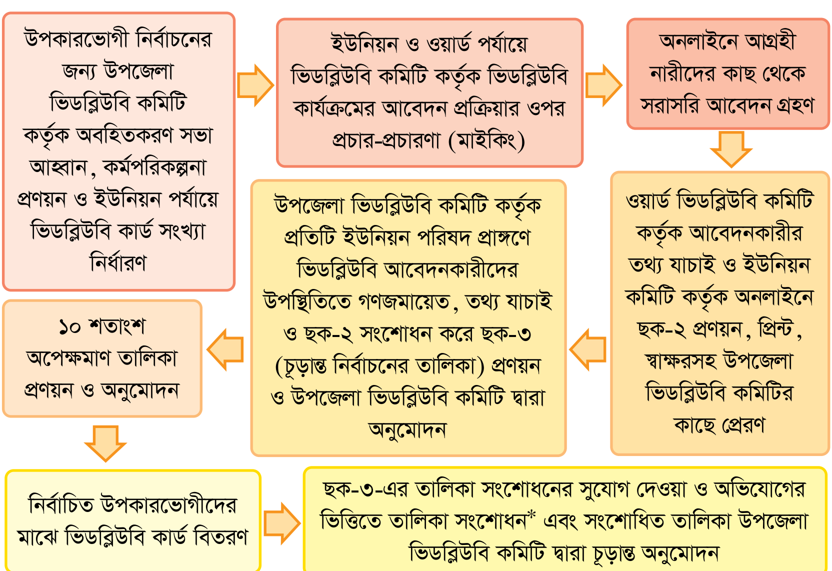

* সর্বশেষ ধাপে তালিকা সংশোধনের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে সনাকের সহায়তায় ইয়েস কর্তৃক স্বেচ্ছায় এবং অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও) ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে কর্ম এলাকার বাইরের উপজেলায় যাচাই-বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়

প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য, বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ও পরিধি

উদ্দেশ্য

- ভিডব্লিউবি কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনের বিভিন্ন শর্তাবলি-সংক্রান্ত পরিপত্রের সীমাবদ্ধতা ও মাঠপর্যায়ে প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণ করা;
- টিআইবি কর্তৃক পরিচালিত উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করা;
- প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নীতিনির্ধারণী ও দিকনির্দেশনামূলক সুপারিশ প্রস্তাব করা।

বিশ্লেষণপদ্ধতি : এটি মূলত পরিমাণগত পর্যালোচনা প্রতিবেদন যেখানে সংশ্লিষ্ট নথিপত্র পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সনাক কর্তৃক পরিচালিত ভিডব্লিউবি বা ভিজিডির উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের তথ্য-উপাত্তের বিশ্লেষণ এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিধি : প্রযোজ্য শর্তাবলির মধ্য থেকে পরোক্ষ তথ্যনির্ভরশীল ভিজিডি বা ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির অযোগ্যতার দুটি শর্তের (১. নতুন তালিকাভুক্তির ক্ষেত্রে বিগত এক-দুটি চক্রে কোনো উপকারভোগী একই সুবিধা পেয়েছে কি না এবং ২. নতুন তালিকার কোনো সদস্য সরকার প্রদেয় সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতায় বিধবা ভাতা বা বয়স্ক ভাতা পেয়েছে কি না) ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। তিনটি চক্রে সর্বমোট ৪৩টি জেলার ১০১টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৪৫৫ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাইয়ের তথ্য এ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসন : বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ

উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত ব্যত্যয় বা চ্যালেঞ্জ

বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা যায়, ভিডব্লিউবি কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীদের তালিকাভুক্তিতে ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ভোটপ্রাপ্তির আশা, ইত্যাদি অব্যাহত থাকায় প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচন ঝুঁকির সম্মুখীন।[৭] এ ছাড়া প্রচারণার ঘাটতির কারণে অনেক দুস্থ নারী কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে না পারায় সব দুস্থ নারী আবেদন না করার কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তির অযোগ্য নারীদের আবেদন করা ও অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে।[৮]

তিন চক্রের যাচাই-বাছাইয়ে দেখা যায়, ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক পর্যাপ্ত এবং যথাযথভাবে আবেদনকারীদের তালিকা যাচাই-বাছাই করা হয় না এবং ছক-২ তৈরি হওয়ার পর সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে সরেজমিন কার্যকর যাচাই-বাছাই করা হয় না এবং অনলাইনে মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের তথ্যভান্ডার যথাযথভাবে যাচাই না করার ফলে আগের দুই চক্রের উপকারভোগী ছক-৩–এ সন্নিবেশিত হয়। ফলে উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি দেখা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের ঘাটতি থাকায় অন্য সামাজিক কর্মসূচির উপকারভোগী ভিজিডি বা ভিডব্লিউবি কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। আরও দেখা যায়, ত্রুটির পেছনে

অন্যতম কারণ একক রেজিস্ট্রি এমআইএস (Single Registry MIS) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা না হওয়া। অনলাইন অ্যাপে সরাসরি আবেদন তথ্যভান্ডারে তথ্য জমা ও যাচাই-বাছাইয়ে সুবিধা দিলেও দুস্থ নারী, বিশেষ করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনলাইনভিত্তিক অ্যাপে অভিগম্যতা কম। ফলে পরনির্ভরশীল হওয়ায় অনেকে আবেদন করতে আগ্রহী হন না। এ ছাড়া পরিপত্র পর্যালোচনা করেও কিছু সীমাবদ্ধতা ও প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়, যা সারণি-১-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ অনেক সময় উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি ও অনিয়ম-দুর্নীতির সুযোগ তৈরি করে।

সারণি-১ : উপকারভোগী নির্বাচন, খাদ্য ও কার্ড বিতরণসংক্রান্ত পরিপত্রের[৯] সীমাবদ্ধতা

বিষয়	পর্যবেক্ষণ	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমি	অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে উপকারভোগীর নিজ মালিকানাধীন বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ সর্বোচ্চ শূন্য দশমিক ১৫ একর উল্লেখ থাকলেও খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ উল্লেখ নেই। এমনকি আবেদন ফরমেও এ বিষয়ে তথ্য নেওয়া হয় না	সচ্ছল উপকারভোগী নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়
পরিবার বা খানার সর্বোচ্চ মাসিক আয়	পরিবার বা খানার সর্বোচ্চ মাসিক আয় কত হবে তা শর্তাবলির মধ্যে উল্লেখ নেই	
সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন	পরিপত্রে উপকারভোগী নির্বাচনের পুরো প্রক্রিয়ার কোথাও সমাজসেবা অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ করা হয়নি এবং ওয়ার্ড কমিটিতে যাচাই-বাছাইয়ে সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি নেই	বিধবা ভাতা ও বয়স্ক ভাতাপ্রাপ্ত উপকারভোগী ভিডব্লিউবি উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়
ওয়ার্ড কমিটিতে সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ	আবেদনকারীর তথ্য ওয়ার্ড কমিটির প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাইয়ের মূল দায়িত্ব হলেও এ কমিটিতে সচেতন নাগরিক, পেশাজীবী গোষ্ঠী এবং দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে অনুপস্থিত	প্রভাব বিস্তারের সুযোগ তৈরি হয়

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন...

বিষয়	পর্যবেক্ষণ	প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ
অভিযোগ নিষ্পত্তি করে তালিকার নাম সংশোধন	অনুমোদিত (ছক-৩ এ সন্নিবেশিত) বাছাইকৃত উপকারভোগীদের নামের তালিকা ইউপির নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেওয়ার পর কেউ যদি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করে, তবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এ তদন্ত কমিটির সদস্য কারা হবেন তা পরিপত্রে স্পষ্ট করা হয়নি	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার ইচ্ছামাফিক কমিটি গঠনের সুযোগ; সঠিক উপকারভোগী নির্বাচিত না হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়

টিআইবি কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই : ত্রুটি ও সংশোধন

২০১৯-২০২০ চক্রে ৪৩টি জেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৬টি উপজেলার ৯০১টি ইউনিয়নের ১ লাখ ৮৭ হাজার ৯৬৩ জন উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই করে সর্বোচ্চ ত্রুটি (৩ দশমিক ৬৩ শতাংশ) পাওয়া যায়। পরবর্তী চক্রগুলোতে যাচাই-বাছাইয়ে ত্রুটির পরিমাণ কমতে থাকে, যা টিআইবি পরিচালিত যাচাই-বাছাইয়ের ইতিবাচক প্রভাব নির্দেশ করে। ২০২৩-২৪ চক্রে অন্য চক্রের তুলনায় উপকারভোগীদের মধ্যে বিধবা ও বয়স্ক ভাতা এবং বিগত চক্রে ভিজিডি ভাতাপ্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার এবং মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটির শতকরা হার হ্রাস পেয়েছে (সারণি ২)।

সারণি-২ : বিভিন্ন চক্রের উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির চিত্র

চক্র	বিভিন্ন ধরনের ত্রুটি হার (%)			
	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটির শতকরা হার (সংখ্যা)	পূর্ববর্তী চক্রে ভিজিডি কার্ডপ্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)	একই চক্রে বিধবা ভাতাপ্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)	একই চক্রে বয়স্ক ভাতাপ্রাপ্ত উপকারভোগীর শতকরা হার (সংখ্যা)
২০১৯-২০২০ (n=১,৮৭,৯৬৩)	৩.৬৩ (৬,৮২৩)	৩.৩৪ (৬,২৭২)	০.১৯ (৩৬২)	০.১০ (১৮৯)
২০২১-২০২২ (n=৯৫,৭৭৩)	৩.০২ (২,৮৯২)	২.৬৬ (২,৫৪৪)	০.২৪ (২৩৪)	০.১২ (১১৪)
২০২৩-২০২৪ (n=৯৩,৭১৯)	২.৪১ (২,২৫৯)	২.২০ (২,০৬২)	০.২০ (১৯১)	০.০১ (৬)

'n' তালিকাভুক্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা নির্দেশ করছে

বিভিন্ন চক্রের উপকারভোগীর তালিকায় প্রাপ্ত ত্রুটির বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপজেলাভিত্তিক ত্রুটির হার হিসাব করা হয়েছে। যাচাই-বাছাইয়ে অন্তর্ভুক্ত উপজেলাগুলোর মধ্যে ১০টি উপজেলা চিহ্নিত করা হয়েছে, যেখানে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ত্রুটি পাওয়া গেছে। ২০২৩-২৪ চক্রে উপকারভোগীর তালিকায় সর্বোচ্চ ত্রুটির হার ছিল এমন ১০টি উপজেলা হলো বরগুনা সদর, যশোর সদর, সিলেট সদর, দিরাই, লক্ষ্মীপুর সদর, মতলব উত্তর, জামালপুর সদর, রাজৈর, সুনামগঞ্জ সদর এবং দিনাজপুর সদর (চিত্র ২)।

চিত্র-২ : ২০২৩-২৪ চক্রে ১০টি উপজেলা যেখানে উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি (%) বেশি

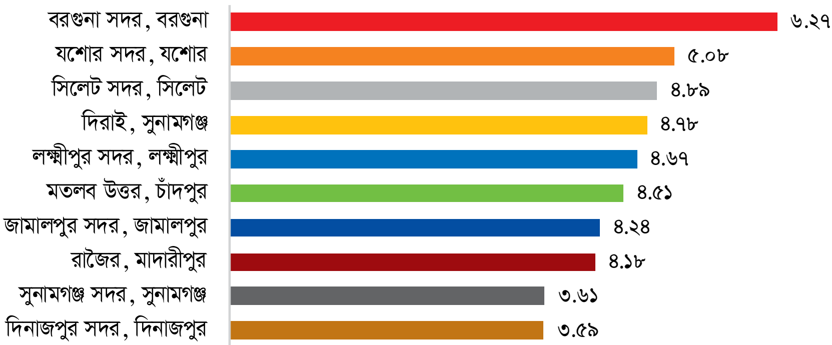

২০২৩-২৪ চক্রে উপকারভোগীর তালিকায় সর্বনিম্ন ত্রুটির হার ছিল এমন ১০টি উপজেলা হলো গাজীপুর সদর, মধুপুর, ময়মনসিংহ সদর, মুক্তাগাছা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর, ঝালকাঠি সদর, শ্রীমঙ্গল, বরিশাল সদর, পটুয়াখালী সদর এবং মুন্সিগঞ্জ সদর (চিত্র ৩)।

চিত্র-৩ : ২০২৩-২৪ চক্রে ১০টি উপজেলা যেখানে উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি (%) কম

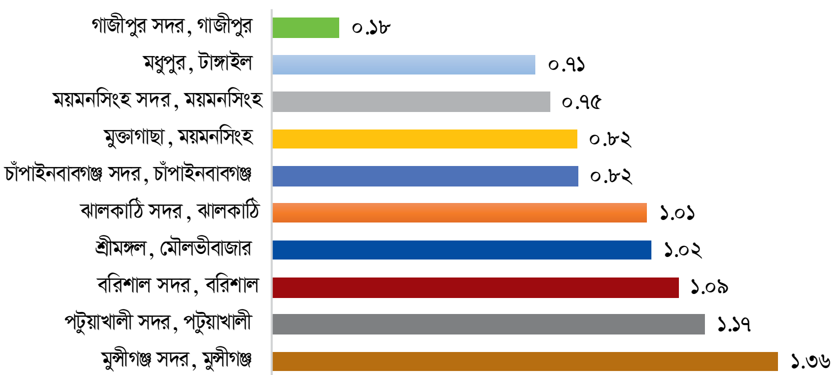

বিভিন্ন চক্রের যাচাই-বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ২০২৩-২৪ চক্রে সর্বোচ্চ সংশোধন হয়েছে, যা টিআইবির যাচাই-বাছাই কার্যক্রমের গ্রহণযোগ্যতা নির্দেশ করে। এই চক্রে উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটি পাওয়া গিয়েছিল ২ দশমিক ৪১ শতাংশ এবং এর বিপরীতে সংশোধন করা হয়েছে ৯২ দশমিক ৬১ শতাংশ (সারণি ৩)।

সারণি-৩ : তিন চক্রের যাচাই-বাছাইয়ে প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন (সংখ্যা ও শতাকরা হার)

চক্র	মোট উপকারভোগীর তালিকায় ত্রুটিযুক্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন* করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণের সংখ্যা	ত্রুটি সংশোধন করে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণের শতকরা হার
২০১৯-২০২০	৬,৮২৩	৪,৯১০	৭১.৯৬
২০২১-২০২২	২,৮৯২	১,৯০২	৬৫.৭৭
২০২৩-২০২৪	২,২৫৯	২,০৯২	৯২.৬১
মোট	১১,৯৭৪	৮,৯০৪	-

*মোট প্রাপ্ত ত্রুটির বিপরীতে সংশোধন-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ত্রুটিযুক্ত উপকারভোগী বাদ দিয়ে অপেক্ষমাণ তালিকা হতে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তকরণ

বিভিন্ন চক্রের যাচাই-বাছাই ও ত্রুটি সংশোধনের কিছু ইতিবাচক প্রভাব

- বিগত তিন চক্রে স্থানীয় প্রশাসন (ইউএনও) এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ২৬টি উপজেলায় সনাক কর্তৃক উপকারভোগীর তালিকা যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।
- ২০১৯-২০ চক্রে ৯৬টি উপজেলার মধ্যে ৫১টি উপজেলায়, ২০২১-২২ চক্রে ৫০টি উপজেলার মধ্যে ২২টি উপজেলায়, ২০২৩-২৪ চক্রে ৪৯টি উপজেলার মধ্যে ৪০টি উপজেলায় ১০০ শতাংশ ত্রুটি সংশোধন করে নতুন উপকারভোগী অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
- টিআইবির তিন চক্রের যাচাই-বাছাইয়ের ফলে আনুমানিক ৬,৪১০.৮৮ মেট্রিকটন চাল প্রতিস্থাপিত প্রকৃত উপকারভোগী ভোগ করতে পেরেছেন।
- তিন চক্রে ৮ হাজার ৯০৪ জন প্রতিস্থাপিত উপকারভোগী নারী বিভিন্ন প্রকার দক্ষতা উন্নয়ন, স্বাবলম্বী ও ক্ষমতায়নবিষয়ক প্রশিক্ষণ পাওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

ভিডব্লিউবির উপকারভোগী নির্বাচনে বিভিন্ন ইতিবাচক উদ্যোগ ও অর্জন সত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে নানাবিধ ঘাটতি ও চ্যালেঞ্জ এখনো বিদ্যমান। সনাকের সহায়তায় ইয়েস সদস্য কর্তৃক তিনটি চক্রে ১০১টি উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ৯৪৮টি ইউনিয়নের সর্বমোট ৩ লাখ ৭৭ হাজার ৪৫৫ জন উপকারভোগীর

তালিকা যাচাই-বাছাই করা হয় এবং সর্বমোট ১১ হাজার ৯৭৪ জন অনুপযুক্ত উপকারভোগী চিহ্নিত হয়, ফলে অনুপযুক্ত উপকারভোগীর স্থলে অপেক্ষমাণ তালিকার ৮ হাজার ৯০৪ জন প্রকৃত উপকারভোগীকে এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তিন চক্রে উপকারভোগী তালিকার যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত ত্রুটি সংশোধনের হার সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক ২০২৩-২৪ চক্রে (৯২ দশমিক ৬১ শতাংশ)। তবে তালিকাভুক্তির দুটি অযোগ্যতার শর্তের মধ্যে 'পূর্বের একটি/দুটি চক্রে একই সুবিধা পাওয়া' শর্তটি অনেক ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয়নি। বর্তমান চক্রে (২০২৩-২৪) এই শর্ত পূরণ হয়নি ২ দশমিক ২০ শতাংশ নির্বাচিত উপকারভোগীর ক্ষেত্রে।

উপকারভোগী নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কমিটি কর্তৃক কার্যকর যাচাই-বাছাই ও পরিবীক্ষণের ঘাটতির কারণে উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি দেখা যায়। সংশ্লিষ্ট কমিটি যাচাই-বাছাই সঠিকভাবে না করার পেছনে রয়েছে ঘুষ, রাজনৈতিক প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, ভোট প্রাপ্তির আশা, ইত্যাদি অনিয়ম দুর্নীতি যা ভিডব্লিউবির উপকারভোগী নির্বাচনে ত্রুটি অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়া Single Registry MIS-এর অনুপস্থিতি, কার্যকর যাচাই-বাছাই এবং সমন্বয়ের ঘাটতির কারণে সৃষ্ট ত্রুটি ভিডব্লিউবি কর্মসূচি তথা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা কঠিন হচ্ছে। যাচাই-বাছাইয়ের এ ত্রুটির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় তুলনামূলক সচ্ছল নারী উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। এ ছাড়া অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা ও চাষযোগ্য মোট জমির পরিমাণ এবং সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ উল্লেখ না থাকায় তুলনামূলক সচ্ছল নারী উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। উপরিউক্ত ব্যত্যয় বিবেচনা নিয়ে যাচাই-বাছাই কার্যক্রমকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য এই কর্মসূচিতে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্যতার শর্তাবলি এবং অন্তর্ভুক্তি ও অগ্রাধিকারের শর্ত বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।

সুপারিশমালা

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের জন্য নিম্নলিখিত নীতিনির্ধারণী ও দিকনির্দেশনামূলক সুপারিশমালা প্রস্তাব করা হচ্ছে–

পরিপত্র সংশোধনসংক্রান্ত

১. অন্তর্ভুক্তির অগ্রাধিকার শর্তাবলিতে খানা বা পরিবারের বসতভিটা, চাষযোগ্য মোট জমির সর্বোচ্চ পরিমাণ ও পরিবারের সর্বোচ্চ মাসিক আয়ের পরিমাণ উল্লেখ এবং তা আবেদন ফরমেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. ত্রুটিমুক্ত উপকারভোগী নির্বাচনে ওয়ার্ড কমিটিতে নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সম্পৃক্ত করতে হবে।

৩. উপকারভোগীর নামের তালিকায় অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গঠিত তদন্ত কমিটিতে কারা নিয়োগ পাবেন, তাদের যোগ্যতার শর্তাবলি, কর্মপরিধি, প্রক্রিয়া, প্রতিবেদন দাখিলের মেয়াদ এবং গৃহীতব্য ব্যবস্থাবলি পরিপত্রে তদন্ত কমিটির নিয়োগের শর্তে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

সক্ষমতাসংক্রান্ত

৪. কর্মসূচি সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পরিপত্রের আলোকে সংশ্লিষ্ট সব কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি ও কমিটির সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন ও নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৫. সব সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সমন্বয়ের মাধ্যমে একক রেজিস্ট্রি এমআইএস (Single Registry MIS) পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং তা দ্রুত কার্যকর করতে হবে। একক তথ্যভান্ডার তথা এমআইএসে জাতীয় পরিচয়পত্রভিত্তিক জমির মালিকানাসহ আর্থিক অবস্থাসংক্রান্ত তথ্য সংযুক্ত ও হালনাগাদ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. ইউনিয়নভিত্তিক জাতীয় পরিচয়পত্রসহ দুস্থ নারীর তালিকা ও তা নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে এবং এর অনুপাতে ইউনিয়নভিত্তিক ভিডব্লিউবি উপকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করতে হবে।

৭. অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়াকে অধিকতর অভিগম্য ও সহজসাধ্য করতে সংশ্লিষ্ট কার্যালয়গুলোকে দুস্থ নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

সচ্ছতা ও জবাবদিহি-সংক্রান্ত

৮. আবেদনের প্রক্রিয়া শুরুর আগে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

৯. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাকে (জিআরএস) সহজ ও কার্যকর করার জন্য নিচের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করতে হবে:

- অভিযোগ প্রতিকারব্যবস্থা সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের অবহিত করতে হবে এবং বিভিন্ন সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দ্বিধায় অভিযোগ জানাতে উৎসাহিত করতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের জন্য যেকোনো সহজলভ্য পদ্ধতিতে (অভিযোগ বাক্স, ইমেইল, ওয়েবসাইট, হটলাইন নম্বর ইত্যাদি) অভিযোগ জানানোর সুযোগ দিতে হবে।
- সেবাগ্রহীতাদের আস্থা অর্জনের জন্য অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিয়মিত (প্রতি মাসে) ওয়েবসাইটে বা উপজেলা মহিলাবিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করতে হবে।

১০. ভিডব্লিউবি যাচাই-বাছাইয়ে তৃতীয় পক্ষকে (নাগরিক সমাজ, পেশাজীবী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি) সম্পৃক্ত করতে হবে।

১১. পরিপত্র অনুসরণ করে উপকারভোগী নির্বাচন করতে হবে এবং যেসব এলাকায় ত্রুটি পাওয়া যাবে, সেই সব এলাকায় শতভাগ সংশোধনের উত্তম চর্চা অনুসরণ করতে হবে।

১২. উপকারভোগীর চূড়ান্ত তালিকা ইউনিয়ন পরিষদের নোটিশ বোর্ডে ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও শুদ্ধাচারসংক্রান্ত

১৩. অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের অবস্থান ও পরিচয়নির্বিশেষে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিভাগীয় পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে (দুদক) অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৪. সব পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রযোজ্য আচরণগত নীতিমালা জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার অঙ্গীকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন ও কার্যকর করতে হবে।

১৫. সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের শুদ্ধাচার পুরস্কার, প্রণোদনা, পদোন্নতি দেওয়াসহ বিভিন্নভাবে সুরক্ষা দেওয়া হতে বিরত থাকতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (৩১ জুলাই, ২০২৩)।

[২] অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১০ জুলাই, ২০২৩)।

[৩] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, https://bangladesh.un.org/bn/sdgs (১০ জুলাই, ২০২৩)।

[৪] বিস্তারিত তথ্য মহিলাবিষয়ক অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে; dwa.gov.bd/sites/default/files/files/dwa.portal.gov.bd/miscellaneous_info/8334a7ad_86ef_42a6_9591_6a7a3be5e39e/2022-03-31-08-31-71ca409e951ba7164e2e998c5c655935.pdf।

[৫] বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (৩১ জুলাই, ২০২৩)।

[৬] বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (৩১ জুলাই, ২০২৩)।

[৭] টিআইবি, '*সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১০*', (ঢাকা: টিআইবি, ২০১০), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/546 (৪ জুন, ২০২৩); টিআইবি, '*সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১২*', (ঢাকা: টিআইবি, ২০১২), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/4237 (৪ জুন, ২০২৩); টিআইবি, 'স্থানীয় সরকার খাত: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়', (ঢাকা: টিআইবি, ২০১৪), https://www.ti-bangladesh.org/images/2014/fr_ds_lg_study_14_bn.pdf (৪ জুন, ২০২৩); টিআইবি, '*সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৫*', (ঢাকা: টিআইবি, ২০১৬), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/5124 (৪ জুন, ২০২৩); টিআইবি, '*সেবা খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০১৭*', (ঢাকা: টিআইবি, ২০১৮), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/5666 (৪ জুন, ২০২৩); টিআইবি, '*সেবা*

খাতে দুর্নীতি: জাতীয় খানা জরিপ ২০২১', (ঢাকা: টিআইবি, ২০২২), https://www.ti-bangladesh.org/articles/household-survey/6521 (১০ জুলাই, ২০২৩)।

৮ টিআইবি, *'বাংলাদেশের আদিবাসী ও দলিত জনগোষ্ঠী: অধিকার ও সেবায় অন্তর্ভুক্তির চ্যালেঞ্জ এবং করণীয়'*, (ঢাকা: টিআইবি, ২০১৯), https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/5787 (১০ জুলাই, ২০২৩)।

৯ বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (৩১ জুলাই, ২০২৩)।

ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ*

মো. মোস্তফা কামাল, রাজিয়া সুলতানা ও মো. জুলকারনাইন

প্রেক্ষাপট

ডেঙ্গু বাহক বাহিত রোগ (ভেক্টর বর্ন ডিজিজ), যা এডিস মশার মাধ্যমে ছড়িয়ে থাকে। *এডিস ইজিপটাই* ও *এডিস এলবোপিকটাস* প্রজাতির মশার মাধ্যমে এই রোগের সংক্রমণ হয়ে থাকে। ডেঙ্গু ছাড়াও এই মশা চিকুনগুনিয়া ও জিকাভাইরাস ছড়িয়ে থাকে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যমতে, প্রতিবছরে ১০০টি দেশে প্রায় ৪০ কোটি মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়।[১] বাংলাদেশে ১৯৬৪ সাল থেকে ডেঙ্গুর ঘটনা রেকর্ড করা হলেও নিয়মিতভাবে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরু হয় ২০০০ সাল থেকে।[২] মূলত ২০১৭ সাল থেকে ডেঙ্গুর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ২০২৩ সালে এর ভয়াবহ প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যায়। উল্লেখ্য, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৭ সালে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব কম হলেও এডিস মশার মাধ্যমে ১৩ হাজার ৮১৪ জন চিকুনগুনিয়ায় আক্রান্ত হয়, যা দেশের ১৭টি জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল।[৩]

চিত্র-১ : বাংলাদেশে বছর অনুযায়ী ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা

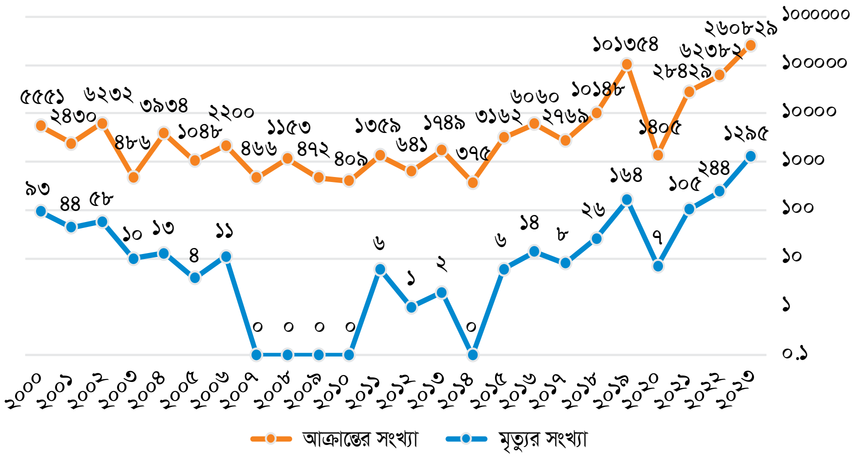

২৫ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে (তথ্যের উৎস: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর)[৪]

---

*২০২৩ সালের ৩০ অক্টোবর ঢাকায় সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ।

উল্লেখ্য, ২০০৭ থেকে ২০১০ এবং ২০১৪ সালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদনে কোনো ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যুর সংখ্যা পাওয়া যায়নি। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের সাধারণ প্রবণতা পরিবর্তন এবং বছরব্যাপী এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও ডেঙ্গু মোকাবিলা কার্যক্রম চলমান না থাকায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ডেঙ্গুর প্রকোপ মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। ইতিপূর্বে দেশে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের সময়কাল সাধারণত মে-সেপ্টেম্বর হলেও ২০১৬ সাল থেকে বছরব্যাপী ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ দেখা যায়। ২০২৩ সালে বছরের শুরু থেকেই দেশব্যাপী ব্যাপক আকারে ডেঙ্গু ছড়িয়ে পড়ে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২৫ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ২ লাখ ৬১ হাজার এবং মৃত্যুর সংখ্যা ১ হাজর ২৯৫।[৫] তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রকৃত আক্রান্তের সংখ্যা সরকার প্রদত্ত সংখ্যার চেয়ে ১০ গুণ বেশি হবে। আগের বছরগুলোতে ঢাকার দুটি সিটি করপোরেশনের মধ্যে অধিক আক্রান্ত হলেও ২০২৩ সালে সংক্রমণ ঢাকার বাইরে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ে। ২৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আক্রান্তের প্রায় ৬৩ শতাংশ ঢাকার বাইরের রোগী।[৬] আক্রান্তের সংখ্যা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে কয়েকগুণ বেড়ে যাওয়ায় ডেঙ্গু আক্রান্তদের চিকিৎসাব্যবস্থায় ব্যাপক সংকট পরিলক্ষিত হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ১০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া সব রোগীর মধ্যে ৫৬ থেকে ৭৭ শতাংশ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৭৭ শতাংশ রোগী ২০২৩ সালের অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে (৮ থেকে ১৪ অক্টোবর ২০২৩) মারা গেছে।[৭] কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে ডেঙ্গু রোগের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হলেও এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও ডেঙ্গু আক্রান্তের চিকিৎসাব্যবস্থায় সংকট বিরাজমান রয়েছে।

গবেষণার যৌক্তিকতা

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টে ২০৩০ সালের মধ্যে সব ধরনের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের (Tropical Disease) মহামারি নির্মূল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে (অভীষ্ট ৩)।[৮] ডেঙ্গু ব্যাপকতা বৃদ্ধি বিষয়ে পূর্ব সতর্কতা থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের যথাসময়ে যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ না করা, মশা নিয়ন্ত্রণে অব্যবস্থাপনা, কীটনাশক ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি, চিকিৎসাব্যবস্থার পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ না করায় রোগীদের হয়রানি ও মৃত্যু, চিকিৎসাসামগ্রীর সংকট তৈরি ইত্যাদি অভিযোগ সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সুশাসন প্রতিষ্ঠায় টিআইবির কার্যক্রমে স্বাস্থ্য একটি অন্যতম খাত। যার ধারাবাহিকতায় টিআইবি ২০১৯ সালে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশানের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে[৯] এবং এই চ্যালেঞ্জ থেকে উত্তরণে ধারাবাহিকভাবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে অধিপরামর্শ কার্যক্রম বজায় রাখে। টিআইবির অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২০২৩ সালের জুলাই মাসে ডেঙ্গু রোগের প্রকোপ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের করণীয় হিসেবে কিছু সুপারিশমালা প্রদান করলেও তাতে গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি।[১০] প্রায় দুই দশক ধরে অব্যাহত থাকা ডেঙ্গু সংকট মোকাবিলায় টিআইবিসহ বিভিন্ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞরা নানাবিধ সুপারিশ প্রস্তাব করলেও এই সুপারিশ বাস্তবায়ন কতটুকু কার্যকর হচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা থেকে ও সার্বিকভাবে স্বাস্থ্য খাতে টিআইবির চলমান কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা। সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যগুলো হচ্ছে–

- এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।
- ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসাব্যবস্থায় সুশাসনের চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা।
- এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও ডেঙ্গু চিকিৎসাব্যবস্থা সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকা পর্যালোচনা করা এবং
- ডেঙ্গু সংকট প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনের বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সুপারিশ প্রদান করা।

গবেষণার পরিধি

এই গবেষণায় মূলত দুটি বিষয় যথা এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম ও ডেঙ্গু চিকিৎসাব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় এডিস মশা প্রতিরোধ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন, এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর পূর্বাভাস, মশা নিধনে জনবল ও উপকরণ, সরকারি ক্রয় ও সরবরাহ, কীটনাশকের মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষা, মাঠপর্যায়ে সমন্বিতপদ্ধতি প্রয়োগ, মশানিধন কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ ও মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয় কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে ডেঙ্গু চিকিৎসাব্যবস্থার আওতায় ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি, রোগ-নির্ণয় (সরকারি ও বেসরকারি), চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম (সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল), চিকিৎসাসামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ এবং চিকিৎসাসামগ্রীর বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গবেষণার আওতাভুক্ত বিষয়গুলো সুশাসনের ছয়টি সূচকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সুশাসনের ছয়টি সূচকের মধ্যে রয়েছে সক্ষমতা ও কার্যকারিতা, সাড়া প্রদান, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং অংশগ্রহণ ও সমন্বয়।

গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যের উৎসের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর), সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, সরকারি হাসপাতাল ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। পরোক্ষ তথ্য হিসেবে প্রাসঙ্গিক আইন ও বিধি, গবেষণা প্রতিবেদন, বিভিন্ন দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সুশাসনের ছয়টি সূচকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, কীটতত্ত্ববিদ, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত, তাদের মতামত ও অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক

তথ্যের ক্ষেত্রে ঢাকা ও জেলা পর্যায়ের হাসপাতাল, সিটি করপোরেশন, পৌরসভার কার্যক্রমবিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা বিবেচনায় ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত সর্বোচ্চ আক্রান্ত ১০টি জেলাকে গবেষণা এলাকা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই ১০টি জেলা হচ্ছে ঢাকা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, পটুয়াখালী, মানিকগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, পিরোজপুর, চাঁদপুর, ফরিদপুর ও কুমিল্লা।

সারণি-১ : সর্বোচ্চ ডেঙ্গু আক্রান্ত ১০টি জেলা

ক্রমিক নং	জেলা	আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা	মৃত্যু সংখ্যা
১	ঢাকা	৮১,৩৭৮	৬১৮
২	চট্টগ্রাম	৯,১৩৬	৭১
৩	বরিশাল	৮,২৩৬	৬৫
৪	পটুয়াখালী	৫,০১৯	৫
৫	মানিকগঞ্জ	৪,৯৫৩	৬
৬	লক্ষ্মীপুর	৪,০৭৫	০
৭	পিরোজপুর	৩,৭৯৪	৯
৮	চাঁদপুর	৩,৫১০	০
৯	ফরিদপুর	৩,৪৭৮	৪৭
১০	কুমিল্লা	৩,৪২৩	১

তথ্যের উৎস : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ডেঙ্গু প্রেস রিলিজ, ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩

গবেষণা সময়কাল

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ থেকে ২৫ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত।

গবেষণার ফলাফল

বাংলাদেশে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশলপত্র ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও বিদ্যমান আইন অনুসরণে ঘাটতি

ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গুসহ যেকোনো ধরনের ভেক্টরবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের কৌশলপত্র, নির্দেশনা ও মানদণ্ড প্রণয়ন এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে এর আলোকে তাদের নিজস্ব কর্মকৌশল প্রণয়নের সুপারিশ করে থাকে। বাংলাদেশে যেকোনো ধরনের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলের জন্য নিজস্ব আইন ও বিধিবিধান রয়েছে এবং সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বা মশা নিয়ন্ত্রণে এসব আইন অনুসরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে সার্বিকভাবে বাংলাদেশে ডেঙ্গু সংকট মোকাবিলা কার্যক্রমে ব্যাপক ঘাটতি ও সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হয়েছে যা সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'গ্লোবাল ভেক্টর কন্ট্রোল রেসপন্স ২০১৭-৩০' কৌশলপত্র

যেকোনো ধরনের মশা বা ভেক্টরবাহিত রোগ প্রতিরোধের জন্য ওই রোগের বাহক নিয়ন্ত্রণ বা নির্মূল করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য বাহকবাহিত রোগ (ভেক্টর বর্ন ডিজিজ) নিয়ন্ত্রণে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১৭ সালে 'গ্লোবাল ভেক্টর কন্ট্রোল রেসপন্স ২০১৭-৩০' কৌশলপত্র প্রণয়ন করে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে এই কৌশলপত্রের আলোকে জাতীয় ভেক্টর কন্ট্রোল কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের আহ্বান জানায়। কৌশলপত্রে চারটি মূল স্তম্ভ এবং দুটি মূল উপাদানের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত মশক নিধন কার্যক্রম নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে।

উল্লিখিত কাঠামো অনুসারে ডেঙ্গু প্রতিরোধে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দেশিত চারটি মূল স্তম্ভের মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে সংশ্লিষ্ট খাত ও প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও এ-সম্পর্কিত কার্যক্রম বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, কমিউনিটি সম্পৃক্তকরণ ও মোবিলাইজেশন; তৃতীয়ত, মশা সার্ভেইলেন্স এবং গৃহীত কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং সবশেষে মশা প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত টুলস ও পদ্ধতির সম্প্রসারণ করা। কৌশলটিতে মশক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের দুটি মূল ভিত্তি হচ্ছে মশক নিধন সক্ষমতা ও সামর্থ্যের উন্নয়ন এবং কীটতত্ত্ব ও ভেক্টর নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা ও উদ্ভাবন জারি রাখা। এসব কর্মকাণ্ডের কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, অধিপরামর্শ, রিসোর্স মোবিলাইজেশন ও অংশীজনের মধ্যে সমন্বয় এবং আইন, নীতি ও মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা।

চিত্র-২ : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল ভেক্টর কন্ট্রোল রেসপন্সকাঠামো

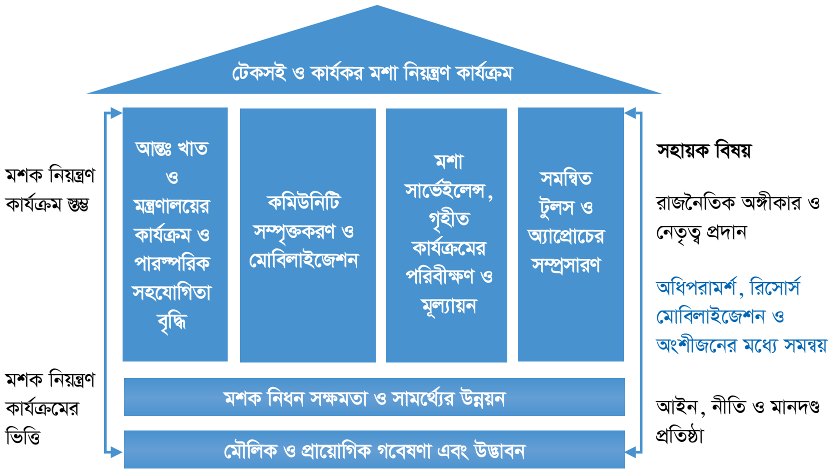

তথ্যের উৎস : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, গ্লোবাল ভেক্টর কন্ট্রোল রেসপন্স ২০১৭-৩০, জেনেভা, ২০১৭

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিত সমন্বিত মশক ব্যবস্থাপনা

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমন্বিত মশা বা বাহক ব্যবস্থাপনা হ্যান্ডবুকে (Handbook for integrated vector management) এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে চারটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে:[১১]

পরিবেশগত পদ্ধতি (environmental) : এডিস মশার উৎসস্থল বা প্রজননক্ষেত্র নির্মূল করা।

যান্ত্রিক পদ্ধতি (mechanical) : মশা ধরার ফাঁদ ব্যবহার করা।

জৈবিক পদ্ধতি (biological) : প্রাকৃতিকভাবে মশার শুককীট নিধন করা, গাপ্পিফিশ, ব্যাকটেরিয়া, বোটানিক্যাল কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি।

রাসায়নিক পদ্ধতি (chemical) : রাসায়নিক প্রয়োগের মাধ্যমে মশা নিধন করা (অ্যাডাল্টিসাইড, লার্ভিসাইড), বায়োর‍্যাশনাল কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি।

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও ডেঙ্গু সংকট মোকাবিলায় এ চারটি পদ্ধতি একই সাথে বছরব্যাপী প্রয়োগের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে; বিশেষ করে বাংলাদেশে এ বছরের ডেঙ্গুর প্রকোপ কমাতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক পরিবেশগত পদ্ধতি প্রয়োগ এবং বাসা-বাড়ি বা অফিসের অভ্যন্তরে (ইন্ডোর স্পেস স্প্রেইং) মশার স্প্রে করার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা হয়।[১২]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কৌশলে বাহক (ভেক্টর) বাহিত রোগ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট অংশীজন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্লোবাল ভেক্টর কন্ট্রোল রেসপন্স কৌশলপত্র অনুযায়ী মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্যসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ভূমিকায় রাখা হয়েছে। এই কৌশলপত্রে মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য খাতের বাইরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়, যেমন কৃষি, পরিবেশ, গৃহায়ণ, অর্থ, পরিবহন, নগর উন্নয়ন ও স্থানীয় সরকার কর্তৃপক্ষকে এই কার্যক্রমের গুরুত্বপূর্ণ অংশীজন হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারি দপ্তর ও প্রতিষ্ঠানের বাইরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা/জাতিসংঘ, গবেষণা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, স্থানীয় কমিউনিটি এবং নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষকে এই কাজে সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে। ভারত, ব্রাজিলসহ অনেক দেশে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন 'জাতীয় ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি'র মাধ্যমে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসারে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের উল্লিখিত অংশীজনদের নিয়ে একটি টাস্কফোর্স তৈরি করার কথা বলা হয়েছে, যারা সার্বিকভাবে এই মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তদারকি করবেন।

বাংলাদেশে বিদ্যমান সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণসংশ্লিষ্ট আইন

সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮

সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮-এর ধারায় দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান ও তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এই আইনের ধারা ৫ (১) (ক) অনুযায়ী সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল এবং

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিস্তার হতে জনগণকে সুরক্ষা প্রদানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্মকৌশল প্রণয়নসহ সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ধারা ৫ (১) (খ) অনুসারে কর্মকৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করবে। ধারা ৫ (১) (ঝ) উল্লেখ করা হয়েছে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বাহক বাহিত রোগ প্রতিরোধে ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে কীটনাশকের নিরাপদ মাত্রা নির্ধারণ, তথ্য সংগ্রহের জন্য যেকোনো প্রাঙ্গণে প্রবেশ, প্রজননস্থল ব্যবস্থাপনা করবে। ধারা ৯-এ সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিধিবিধানের অনুসরণ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ধারা ৫ (২) অনুযায়ী এই আইনের অধীনে দায়িত্ব পালন এবং কার্যসম্পাদনের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক দায়ী থাকবেন বলে বলা হয়েছে।[১৩]

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ অনুসরণে ঘাটতি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রস্তাবিত কৌশলপত্র অনুসরণ করে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ বা ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এখন পর্যন্ত সমন্বিত কৌশল প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়নি। এ ছাড়া দেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরকে দৃশ্যমান কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করতে দেখা যায়নি। স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় আগস্ট ২০২১-এ 'ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা' প্রণয়ন করেলেও[১৪] সেখানে বাংলাদেশের সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণে বিদ্যমান আইন ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসরণে ব্যাপক ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই নির্দেশিকায় গৃহীত কর্মপরিকল্পনায় বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণ ও সমন্বয়ের ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় জনস্বাস্থ্য বা রোগতাত্ত্বিক এবং কীটতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও অ্যাপ্রোচ উপেক্ষিত হয়েছে। এ ছাড়া মশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পদ্ধতি সম্পর্কিত বিবরণ এই নির্দেশিকায় অনুপস্থিত। এর পাশাপাশি মশা জরিপ, হটস্পট চিহ্নিতকরণ প্রক্রিয়া, ডেঙ্গু সার্ভেইল্যান্স প্রক্রিয়া সম্পর্কিত নির্দেশনাও এখানে অনুপস্থিত। অন্যদিকে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা, বিশেষ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ভূমিকা এখানে সুনির্দিষ্ট করা হয়নি। কিছু কিছু অংশীজনের ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলেও অংশীজনেরা এই কার্যক্রম কোন পদ্ধতিতে বা কোন প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়ন করবেন, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার ঘাটতি লক্ষ করা যায়। এই নির্দেশনায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, বিশেষজ্ঞ (জনস্বাস্থ্যবিদ, কীটতত্ত্ববিদ ও মহামারি বিশেষজ্ঞ) ইত্যাদি অংশীজনদের সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অনুপস্থিত রয়েছে।

এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা ও কৌশল প্রণয়ন

সাড়া প্রদানে (Responsiveness) ঘাটতি

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২২ অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত ব্রাজিলে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৫ লাখ ৬৯ হাজার ৭৪৬।[১৫] অন্যদিকে বাংলাদেশে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার ৯৭।[১৬]

চিত্র-৩ : দেশভিত্তিক ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ২০২৩

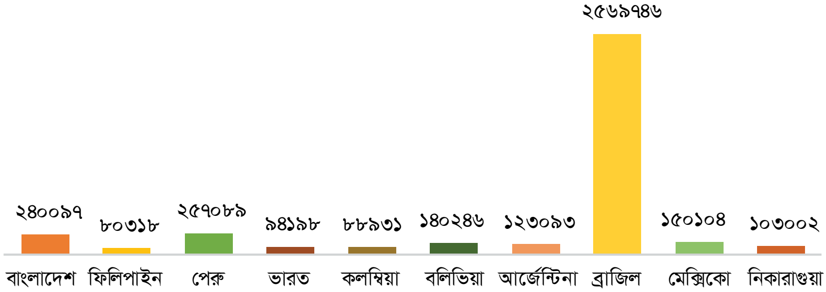

বিভিন্ন উৎস থেকে সংকলন, ২২ অক্টোবর ২০২৩

এ সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা ব্রাজিল ব্যতীত অন্যান্য দেশের প্রায় সমপর্যায়ের হলেও সর্বোচ্চ ডেঙ্গু আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে মৃত্যুর সংখ্যা (১ হাজার ২১৪ জন) ও মৃত্যুর হারের (শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ) দিক থেকে প্রথম অবস্থানে রয়েছে।[১৭] কিন্তু ব্রাজিলের তুলনায় বাংলাদেশে ডেঙ্গু রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ১০ গুণ কম হলেও বাংলাদেশে মৃতের সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশ ও পেরুর ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা প্রায় সমান হলেও পেরুর ডেঙ্গু মৃত্যুর হারের (শূন্য দশমিক ২ শতাংশ) তুলনায় বাংলাদেশে মৃত্যুর হার (শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ) দ্বিগুণের বেশি। অন্যদিকে বলিভিয়া, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো এবং নিকারাগুয়ার ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা কাছাকাছি হলেও এই দেশগুলোর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার যথাক্রমে শূন্য দশমিক শূন্য ৫, শূন্য দশমিক শূন্য ৫, শূন্য দশমিক শূন্য ৩ এবং শূন্য দশমিক শূন্য ১ শতাংশ। এর মধ্যে নিকারাগুয়াতে ডেঙ্গু আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর হার কম। ফিলিপাইন, ভারত ও কলম্বিয়ায় ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখের নিচে এবং এই দেশগুলোতে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার যথাক্রমে শূন্য দশমিক ৩৭, শূন্য দশমিক শূন্য ৯, এবং শূন্য দশমিক শূন্য ৮ শতাংশ। এর মধ্যে ফিলিপাইনে ডেঙ্গু আক্রান্তের তুলনায় মৃত্যুর হার তুলনামূলক বেশি।

চিত্র-৪ : দেশভিত্তিক ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা ২০২৩

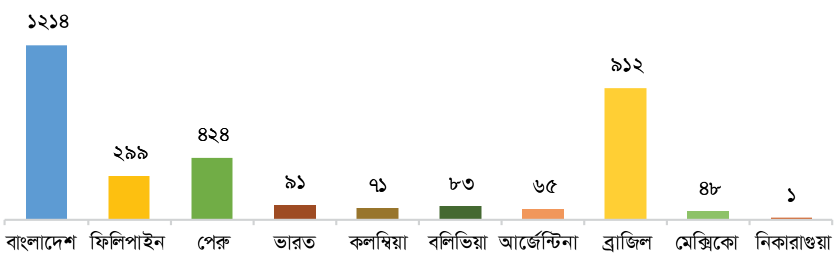

বিভিন্ন উৎস থেকে সংকলন, ২২ অক্টোবর ২০২৩

বাংলাদেশে আগে সন্দেহভাজন, সম্ভাব্য এবং পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত সবাইকে আক্রান্ত হিসেবে গণনা করা হতো। ২০১০ সাল থেকে শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে চিহ্নিত রোগীদের ডেঙ্গু আক্রান্ত হিসেবে

সংজ্ঞায়িত করা হয়।[১৮] ২০১০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বছর অনুযায়ী কম-বেশি হলেও চিত্র ৫-এ দেখা যাচ্ছে যে সর্বশেষ চার বছরের ডেঙ্গু রোগী মৃত্যুহার প্রায় সমরূপ রয়েছে।

চিত্র-৫ : বাংলাদেশে বছরভিত্তিক ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার (%)

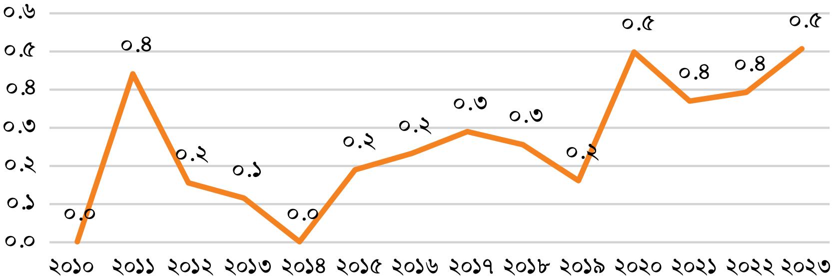

তথ্যের উৎস : স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশে ২০০০ সাল থেকে ডেঙ্গুর সংকট বিরাজ করছে। তবে কয়েক বছর, বিশেষ করে ২০১৬ সালের পর থেকে বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্য (চিত্র ১) এবং ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার (চিত্র ৫) ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে ডেঙ্গুর কারণে মৃত্যুর হার করোনাভাইরাসের (১ দশমিক ৪ শতাংশ) কাছাকাছি হলেও ডেঙ্গুকে করোনাভাইরাসের মতো একই গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

তবে ধারাবাহিকভাবে ডেঙ্গু সংকট বিরাজমান থাকা এবং ক্রমাগত এই সংকট বৃদ্ধি পেতে থাকলেও সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাড়া প্রদানে যথেষ্ট ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। স্বাস্থ্যসংকট হিসেবে ডেঙ্গুকে রাজনৈতিকভাবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক যথাযথ রাজনৈতিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়নি। জাতীয় সংসদে বিরোধী দল কর্তৃক ডেঙ্গুবিষয়ক উদ্বেগ তুলে ধরা হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী কর্তৃক অন্যান্য দেশের ডেঙ্গু সংকটের সাথে বাংলাদেশের অবস্থান তুলনা করে সংসদে উত্থাপিত বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়।[১৯]

অন্যদিকে ডেঙ্গু সংকট মোকাবিলায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা ও দেশের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ডেঙ্গুর ভয়াবহতাকে অস্বীকার করা ও বিভ্রান্তকর তথ্য প্রদানের বিষয়টি লক্ষ করা গেছে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী তার এক বক্তব্যে বলেন, *'ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়; স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ চিকিৎসাসেবা দেওয়া।'*[২০] যদিও সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ অনুযায়ী যেকোনো ধরনের সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের। অন্যদিকে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী তার এক বক্তব্যে বলেন, *'মশা মারার দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের একার না'* এবং *'সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার চেয়ে দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভালো।'*[২১] [২২] এ ছাড়া ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের মেয়র বলেন, *'ডেঙ্গু নির্মূল সম্ভব নয়, ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে'* এবং *'ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে অন্যান্য দেশের তুলনায় ভালো অবস্থানে রয়েছি।'*[২৩]

এডিস মশা জরিপ, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিতকরণ, ডেঙ্গুর পূর্বাভাস

মশা জরিপ : যথাযথ সাড়া প্রদান ও সক্ষমতার ঘাটতি

ঢাকার দুটি সিটি করপোরেশন এলাকায় নিয়মিতভাবে বছরে তিনবার মশা জরিপ (প্রাক বর্ষা, বর্ষা ও বর্ষা পরবর্তী মৌসুমে) পরিচালনা করে।[২৪] আর ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, যশোর জেলায় শুধু বর্ষা মৌসুমে জরিপ পরিচালনা করা হয়।[২৫] গবেষণার আওতায় থাকা সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ১০টি জেলার মধ্যে ৬টি জেলায় (লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, বরিশাল, ফরিদপুর, কুমিল্লা, মানিকগঞ্জ) ২০২৩ সালে মশা জরিপ করা হয়নি। শুধু বর্ষা মৌসুমে জরিপ করা হয়েছে এমন এলাকাগুলোর মধ্যে চট্টগ্রাম, গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অল্প নমুনা নিয়ে জরিপ পরিচালনা করা হয়, যা দিয়ে ডেঙ্গু মশার উপস্থিতির সঠিক চিত্র পাওয়া যায়নি।[২৬] তবে সব জরিপে এডিস মশার উপস্থিতির উদ্বেগজনক চিত্র পাওয়া যায়। কিছু ক্ষেত্রে মশা জরিপে সংগৃহীত তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে তাৎক্ষণিকভাবে সরবরাহ করতে না পারার ফলে তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে ফলাফল প্রকাশের মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে জরিপকৃত এলাকার ব্রুটো ইনডেক্স (মশার শূককীটের ঘনত্ব) ও হাউস ইনডেক্স (এডিস মশার ঘনত্ব) পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার বিষয়টি লক্ষ করা যায়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মশা জরিপের ফলাফল নিয়ে একটি সিটি করপোরেশন সংশয় প্রকাশ করে। তাদের বক্তব্য অনুসারে ওই সিটি করপোরেশনের একটি ওয়ার্ডের ব্রুটো ইনডেক্স ৮০ হলেও জরিপের পর দেড় মাসেও সেখানে কোনো ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়নি।

মশা জরিপ শুধু স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ-নিয়ন্ত্রণ শাখা কর্তৃক পরিচালনা করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে আইইডিসিআরসহ সারা দেশের বিভিন্ন গবেষণা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মশা জরিপের সক্ষমতা থাকলেও তাদের সহযোগিতা নিয়ে দেশব্যাপী জরিপ পরিচালনা করা হয় না। মশা জরিপের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বাজেট ও জনবলের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়েছে।

ডেঙ্গু সংক্রমণ চিহ্নিতকরণ ও সমন্বিত ডেটাবেইস প্রণয়ন: সাড়া প্রদান ও সক্ষমতার ঘাটতি

ডেঙ্গু আক্রান্ত ও মৃত্যুবিষয়ক তথ্য-উপাত্ত নিয়ে এখন পর্যন্ত সমন্বিত ডেটাবেইস প্রণয়ন করা হয়নি। গবেষণার আওতাভুক্ত ১০টি জেলার মধ্যে ৮টি থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এই ৮ জেলায় মোট ২ হাজার ৬৮৭টি নিবন্ধিত রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মাত্র ১৬৫টি হাসপাতাল ও রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র (৬ দশমিক ১ শতাংশ) থেকে তথ্য সংগ্রহ করে (সারণি ২)। সব হাসপাতাল থেকে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সক্ষমতার ঘাটতি রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর স্বল্পসংখ্যক হাসপাতাল থেকে শুধু ভর্তিকৃত রোগীদের তথ্য সংগ্রহ করে এবং তা মোট আক্রান্তের সংখ্যা হিসেবে প্রচার করে থাকে। ডেঙ্গু আক্রান্ত চিহ্নিত করতে কোভিড-১৯-এর মতো করে ডেডিকেটেড রোগ-নির্ণয়কেন্দ্র স্থাপন করা হয়নি। সারা দেশের সব সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের তথ্য নিয়ে সমন্বিত ডেটাবেইস প্রণয়ন করা সম্ভব না হওয়ায় সংক্রমণের শুরুতেই আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করার মাধ্যমে হটস্পট চিহ্নিত করা সম্ভব হচ্ছে না। হটস্পট চিহ্নিত না হওয়ার ফলে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে দ্রুত এই রোগ দেশব্যাপী

ছড়িয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া ডেঙ্গুর কোন ধরনের ভাইরাসের সংক্রমণ বেশি হচ্ছে তা সীমিতসংখ্যক হাসপাতালের তথ্য থেকে চিহ্নিত করা হচ্ছে।

সারণি-২ : গবেষণার আওতাভুক্ত জেলায় ডেঙ্গু তথ্য প্রদানকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা

জেলা	মোট রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র*	ডেঙ্গু তথ্য প্রদানকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা**
ঢাকা শহর	৯৪৭	৭৮
চট্টগ্রাম	৩৪৫	১৪
কুমিল্লা	৪২৯	১৭
বরিশাল	২৫৮	১০
ফরিদপুর	১৭২	২১
লক্ষ্মীপুর	১৪৭	১০
চাঁদপুর	২২৯	৮
পিরোজপুর	১৬০	৭
মোট	**২,৬৮৭**	**১৬৫**

* স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হসপিটাল সার্ভিস ম্যানেজমেন্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য

** মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য

এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম: অংশীজনদের ভূমিকা ও সমন্বয়ে ঘাটতি

আইনে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সুস্পষ্টভাবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করার কথা থাকলেও তাদের কার্যক্রম রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসাব্যবস্থা প্রণয়নের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অপরদিকে, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় মশক নিধন ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনা প্রণয়ন, নির্দেশনা প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভাগুলো স্থানীয়ভাবে মশক নিধন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় নিজেদের মধ্যে সমন্বয় না করে যার যার মতো কার্যক্রম পরিচালনা করছে। শুধু এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মশা জরিপ পরিচালনা করার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহায়তা করছে। অপরদিকে আইইডিসিআর মশা নিধনে কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষার মাধ্যমে ভূমিকা রাখছে। এসব কার্যক্রমে উন্নয়ন সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবকদের সীমিত পর্যায়ে অংশগ্রহণ লক্ষ করা গেছে।

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম

প্রয়োজনীয় জনবল, বাজেট, উপকরণ ও যন্ত্রপাতি: সক্ষমতার ঘাটতি

গবেষণার আওতাতাভুক্ত ১০টি জেলার মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, জেলাগুলোর সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার আয়তন ও হোল্ডিং সংখ্যার অনুপাতে বাজেট, জনবল ও মেশিন সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় না।

সারণি ৩ : সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার আয়তন, হোল্ডিং সংখ্যা অনুপাতে বাজেট, জনবল ও মেশিন সংখ্যার তুলনা

সিটি করপোরেশন	আয়তন (ব. কিমি)	হোল্ডিং	বাজেট (লাখ টাকা)		বিদ্যমান জনবল	যন্ত্রপাতি (ফগার মেশিন, স্প্রে)	জনবল: হোল্ডিং	হোল্ডিং প্রতি বাজেট (টাকা)
			বরাদ্দ	প্রকৃত ব্যয়				
ঢাকা উত্তর	১৯৬.২	৩৪০,০০০	৭,৬০০	৭৬০০	৮১১	৫৫১	১:৪১৯	২,২৩৬
ঢাকা দক্ষিণ	১০৯.৩	২৫৪,৮৯৫	২,৮৭৫	৩৫০০	৯৭৫	১৭৪৮	১:২৬১	১,১২৮
চট্টগ্রাম	তথ্য পাওয়া যায়নি							
কুমিল্লা	৫৩	৫০,৫০০	১২০	তথ্য পাওয়া যায়নি	১৮	৫৯	১:২৮০৬	২৩৮
বরিশাল	৫৮	৫৫,১০০	১৯৩	১৪২	১০০	৮২	১:৫৫১	৩৫০
পৌরসভা								
চাঁদপুর	২২	২৭,০০০	২৫	২৫	২০	২৭	১:১৩৫০	৯৩
পিরোজপুর	২৯.৫	১৫,৮৬৯	১৯	১৯	১২	১০	১:১৩২২	১২০
পটুয়াখালী	১৪.২	১৩,৯২৭	৫০	২৪.৬	৩২	১৪	১:৪৩৫	৩৬০
ফরিদপুর	২২.৪	৩৬,৫০০	৩.৫	৩.৫	২০	৩৫	১:১৮২৫	১০
লক্ষ্মীপুর	২৮.৩	২৪,৯৮৯	১.৫	৮	১২	৮	১:২০৮২	৬
মানিকগঞ্জ	৪২.২৮	২০,০০০	৪০	১১.৫	৩	১৬	১: ৬৬৬৭	৫৮

তথ্যের উৎস : মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত

সারণি ৩-এ দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে পৌরসভায় এডিস মশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বরাদ্দকৃত বাজেট, জনবল, যন্ত্রপাতি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের মশা নিয়ন্ত্রণ ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট যেখানে সর্বোচ্চ ৭৬ কোটি টাকা, সেখানে লক্ষ্মীপুর পৌরসভার বাজেট মাত্র ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। মানিকগঞ্জ পৌরসভায় মশক নিধন কর্মী মাত্র তিনজন এবং লক্ষ্মীপুর পৌরসভায় মশা নিধনে মাত্র আটটি মেশিন রয়েছে। এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হচ্ছে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশার উৎপত্তিস্থল ধ্বংস করা। কিন্তু পৌরসভায় হোল্ডিং অনুপাতে জনবল খুবই কম। মানিকগঞ্জ পৌরসভায় সর্বোচ্চ ৬ হাজার ৬৬৭টি হোল্ডিংয়ের জন্য মাত্র একজন কর্মী রয়েছেন। অন্যদিকে লক্ষ্মীপুর পৌরসভায় প্রতিটি হোল্ডিংয়ে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাত্র ছয় টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ডেঙ্গুর প্রকোপ বৃদ্ধি পেলেও অনেক প্রতিষ্ঠান তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থ বরাদ্দ পায়নি।

মশা নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগ : সাড়া প্রদান ও সক্ষমতার ঘাটতি

গবেষণার আওতাভুক্ত ১০টি জেলার মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সব সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম এখনো শুধু রাসায়নিক পদ্ধতির (লার্ভিসাইড ও অ্যাডাল্টিসাইড) মধ্যে সীমাবদ্ধ। লক্ষ্মীপুর পৌরসভা ছাড়া বাকি সব সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা রাসায়নিক পদ্ধতি, অর্থাৎ লার্ভিসাইড ও অ্যাডাল্টিসাইড পদ্ধতি প্রয়োগ করছে, লক্ষ্মীপুরে শুধু লার্ভিসাইড পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। এ ছাড়া গবেষণার আওতাভুক্ত সব সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা মশা নিধন ও নিয়ন্ত্রণে আংশিকভাবে পরিবেশগত পদ্ধতি ব্যবহার করলেও জৈবিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে না। কিছু কিছু এলাকায় পাবলিক প্লেসে মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা হলেও এখনো ঘরে ঘরে মশার প্রজননস্থল চিহ্নিতকরণ ও ধ্বংস করার কার্যকর কোনো উদ্যোগ লক্ষ করা যায়নি।

মশা নিধন কার্যক্রম মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণে ঘাটতি

> *"আমরা এত দিন ভুল পদ্ধতি ব্যবহার করেছি। এতে মশা ধ্বংস হয়নি, বরং অর্থের অপচয় হয়েছে। আমরা মিয়ামিতে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তা ঢাকায় মশা নির্মূলে কাজে লাগাতে চাই" -*
>
> মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন

কীটতত্ত্ববিদ ও জনস্বাস্থ্য গবেষকদের মতে, মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়ন যথাযথভাবে হচ্ছে না। ফলে একই ধরনের পদ্ধতি বছরের পর বছর ধরে প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থের অপচয় করা হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে শুরু করে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১১ বছরে মশা নিধনে দুই সিটি করপোরেশনের ব্যয় হয়েছে ১ হাজার ৮০ কোটি টাকা; যার মধ্যে উত্তর সিটি করপোরেশনের ব্যয় ছিল ৫৮৬ কোটি ৫২ লাখ টাকা এবং দক্ষিণ সিটির ব্যয় ৪৯২ কোটি ২৪ লাখ টাকা।[২৭] এ ছাড়া যথাযথ পরিবীক্ষণ না হওয়ায় মাঠপর্যায়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ প্রক্রিয়া ও মাত্রা অনুযায়ী কীটনাশক প্রয়োগ না করার অভিযোগ রয়েছে। জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে মশার উৎস নির্মূলে কার্যকর উদ্যোগ না নেওয়া এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভবনের ভেতরে মশা নিধন কার্যক্রম পরিচালিত না করে শুধু রাসায়নিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে অর্থের অপচয় হয়েছে এবং যা প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ারও অন্যতম একটি কারণ।

মশা নিধন কার্যক্রমে সক্ষমতার ঘাটতি

সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভাগুলোর মশক নিয়ন্ত্রণ কর্মী ও সুপারভাইজারদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। এসব কর্মী কেবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে কাজ করে থাকেন। কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগেরও ঘাটতি রয়েছে।

কীটনাশকের মান ও কার্যকারিতা পরীক্ষায় অবহেলা

মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোর কোনো কোনো এলাকায় ৫ থেকে ২৭ বছর ধরে একই কীটনাশক ব্যবহৃত হচ্ছে। কীটতত্ত্ববিদ

ও জনস্বাস্থ্য গবেষকদের মতে, একই কীটনাশক বহু বছর ধরে ব্যবহারের ফলে তা সহনশীল হয়ে পড়ে এবং ওই কীটনাশক প্রয়োগে মশা নিধন হয় না। গবেষণার আওতাভুক্ত কোনো পৌরসভাতেই কীটনাশকের কার্যকারিতা কীটতত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষা করা হয় না। আবার গবেষণার আওতাভুক্ত সিটি করপোরেশনগুলোর কীটনাশকের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হলেও সেখানে কীটতত্ত্ববিদ ও বিশেষজ্ঞদের কোনো সম্পৃক্ততা থাকে না। তবে ঢাকার দুটি সিটি করপোরেশন (উত্তর ও দক্ষিণ) যথাযথ কর্তৃপক্ষ যেমন আইইডিসিআর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও আইসিডিডিআরবির মাধ্যমে কীটনাশক পরীক্ষা করেছে।

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে স্বচ্ছতার ঘাটতি

সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণবিষয়ক স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশ না করার বিষয়টি লক্ষ করা গেছে। গবেষণায় সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভাগুলোর নিজস্ব ওয়েবসাইটে মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বাজেট, জনবল, যন্ত্রপাতি, মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য কর্মপরিকল্পনা, ডেঙ্গু-সম্পর্কিত হটলাইন নম্বর ইত্যাদি তথ্য স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। গবেষণার আওতাভুক্ত পাঁচটি সিটি করপোরেশনের মধ্যে দুটি সিটি করপোরেশন মশা নিধন কার্যক্রম সম্পর্কে অধিকাংশ তথ্য এবং দুটি সিটি করপোরেশন আংশিকভাবে দুই-একটি তথ্য প্রকাশ করেছে এবং একটি সিটি করপোরেশন এ-সংক্রান্ত কোনো তথ্য প্রকাশ করেনি। অন্যদিকে কোনো পৌরসভাই মশা নিয়ন্ত্রণে হটলাইন নম্বর, বাজেট, জনবল এবং যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কোনো তথ্য স্বপ্রনোদিতভবে প্রকাশ করেনি।

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে জবাবদিহি ব্যবস্থায় ঘাটতি

কীটনাশক ক্রয় কার্যক্রমে বিভিন্ন সময়ে অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে সম্পৃক্ত সিটি করপোরেশনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। গবেষণার আওতাভুক্ত নয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি প্রতিষ্ঠানে নাগরিকদের অভিযোগ জানানোর কোনো ব্যবস্থা নেই। অন্যদিকে নয়টি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র চারটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাঠপর্যায়ে ডেঙ্গু মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অবহেলার জন্য কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদাহরণ রয়েছে।

ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাব্যবস্থা

চিকিৎসাব্যবস্থায় সক্ষমতার ঘাটতি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, ২০২৩ সালের মে মাস থেকে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়তে থাকে। তবে মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, অধিকাংশ এলাকায় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ সংক্রমণের ব্যাপকতা শুরু হওয়ার আগে প্রস্তুতি গ্রহণ না করে জুন ২০২৩ পরবর্তী সময়ে প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করে। মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, স্থানীয় পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে সাধারণ শয্যার ব্যবস্থা করা হলেও অধিকাংশ এলাকায় জটিল রোগীদের সেবার জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক আইসিইউ শয্যার ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া একজন ডেঙ্গু রোগী গড়ে চার থেকে পাঁচ দিন হাসপাতালে অবস্থান করার ফলে দিনপ্রতি ভর্তি হওয়া রোগীর তুলনায় নতুন ও পুরোনো রোগী

মিলিয়ে প্রায় পাঁচ গুণ রোগী হাসপাতালে অবস্থান করে, যা ডেঙ্গু রোগীদের জন্য বরাদ্দকৃত শয্যার অনুপাতে অনেক বেশি। অধিকাংশ এলাকায় ডেঙ্গু রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত আইসিইউ শয্যা না থাকায় জটিল রোগীদের চিকিৎসাসংকটও পরিলক্ষিত হয়েছে।

সারণি-৪ : জেলাপর্যায়ে ডেঙ্গু চিকিৎসার প্রস্তুতি, বরাদ্দকৃত শয্যা ও দিনপ্রতি ডেঙ্গু রোগী

জেলা	প্রস্তুতি গ্রহণ	বরাদ্দকৃত শয্যা	আইসিইউ	দিনপ্রতি রোগী (সেপ্টেম্বর ২০২৩)
ঢাকা শহর	-	২,৫০০	১০৯	৮২১
কুমিল্লা	জুলাই ২০২৩	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	৪৮
বরিশাল	মার্চ ২০২৩	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	১১৯
চট্টগ্রাম	জুন ২০২৩	৪৫০	৩৩	১২৭
মানিকগঞ্জ	মে ২০২৩	২১০	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	১১৮
ফরিদপুর	জুন ২০২৩	১৫০	১০	৪৬
লক্ষ্মীপুর	জুন ২০২৩	৬০	০০	৬৮
চাঁদপুর	জুন ২০২৩	১০০	০০	৪৬
পিরোজপুর	জানুয়ারি ২০২৩	নির্দিষ্ট শয্যা নেই	০০	৫৯
পটুয়াখালী	তথ্য প্রদান করেনি			

তথ্যের উৎস: মাঠপর্যায় থেকে সংগৃহীত

হাসপাতালের চিকিৎসা কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ

মাঠপর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, জেলাপর্যায়ের হাসপাতালগুলোর চিকিৎসা কার্যক্রমে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে রোগী অনুপাতে সাধারণ শয্যা এবং আইসিইউ ও পিআইসিইউ শয্যার ঘাটতি, প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসামগ্রী ও জনবলের ঘাটতি এবং বাজেটঘাটতি অন্যতম। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জের মধ্যে রয়েছে- ডেঙ্গু রোগের জটিলতা অনুসারে সুশৃঙ্খল উপায়ে স্তরভিত্তিক চিকিৎসাব্যবস্থা না থাকা। বিভিন্ন এলাকায় বিশেষত ঢাকায় অপেক্ষাকৃত কম জটিল ডেঙ্গু রোগীদের প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসাসেবা নিতে প্রথমেই মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়। ফলে জটিল রোগীদের চিকিৎসা পেতে বিলম্ব ও শয্যাসংকটে পড়তে হচ্ছে। জটিল ডেঙ্গু রোগী ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে হাসপাতালে রোগী অনুপাতে জনবলের ঘাটতি থাকায় অনেক রোগী মারা যাচ্ছে। সঠিক সময়ে রোগ-নির্ণয় না হওয়া এবং চিকিৎসা গ্রহণ না করায় হঠাৎ করে রোগের জটিলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে ও রোগী দ্রুত মারা যাচ্ছে। এ ছাড়া ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে চিকিৎসক ও নার্সদের অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণেরও ঘাটতি রয়েছে। বিশেষজ্ঞ মতে, শহর ও গ্রামের মধ্যে দুই রকমের স্বাস্থ্যনীতি ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা কার্যক্রমের একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে অনেক জেলা হাসপাতালে সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন (রক্ত থেকে লোহিত রক্তকণিকা, প্লাটিলেট ও প্লাজমা পৃথক করা) নেই এবং চাহিদা অনুযায়ী প্লাজমার সরবরাহ খুবই কম ছিল।[২৮]

নারী, বয়স্ক ও ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও চিকিৎসা কার্যক্রমে ঘাটতি

বাংলাদেশে মোট ডেঙ্গুতে মৃত্যুর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ষাটোর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদের (১৯ শতাংশ)। এ ছাড়া আক্রান্তের সংখ্যা অনুপাতে ষাটোর্ধ্ব বয়সী ব্যক্তিদের মৃত্যুহার অনেক বেশি। গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই বয়সী আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে মৃত্যুর হার সবেচেয়ে বেশি (১ দশমিক ৭ শতাংশ)। উল্লেখ্য বাংলাদেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুর হার শূন্য দশমিক ৫ শতাংশ। এ ছাড়া মোট ডেঙ্গু মৃত্যুর ৫৬ দশমিক ৫ শতাংশ নারী। একটি গবেষণায় দেখা যায়, নারীদের মধ্যে বিলম্ব করে রোগ-নির্ণয় ও চিকিৎসা গ্রহণের প্রবণতা এই অধিক মৃত্যুর হারের কারণ।[২৯] এসব ঝুঁকিপূর্ণ ব্যক্তি তথা নারী ও বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিবিষয়ক কার্যক্রম বা চিকিৎসাসেবার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণে ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে, ২০ বছর এবং এর নিচের বয়সীদের মৃত্যু মোট মৃত্যুর ১৭ শতাংশ। এই বয়সীদের অধিকাংশ শিক্ষার্থী হলেও ঢাকার বাইরে বিদ্যালয়কেন্দ্রিক ডেঙ্গু মশা প্রতিরোধবিষয়ক কার্যক্রমে ঘাটতি লক্ষ করা গেছে।

চিত্র-৬ : বাংলাদেশে বয়সভেদে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হার

তথ্যের উৎস: স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২৫ অক্টোবর, ২০২৩ পর্যন্ত

ডেঙ্গু রোগ-নির্ণয় কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ

একটি গবেষণায় দেখা যায়, ডেঙ্গু রোগ-নির্ণয় কার্যক্রমে ব্যবহৃত অ্যান্টিজেন (এনএসওয়ান ও আইজিএম) টেস্টে ফলস নেগেটিভ আসছে। এনএস-১ পরীক্ষায় নেগেটিভ হওয়া ৪১ শতাংশ কেস পরে আরটি-পিসিআর পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছে।[৩০] শুরুতেই সঠিকভাবে রোগ-নির্ণয় না হওয়ায় শিশুসহ অনেক মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। আইইডিসিআর আগের বছরগুলোতে ডেঙ্গুর ধরন শনাক্তে

সহযোগিতা করলেও এ বছর তাদের অংশীজন করা হয়নি। সরকারিভাবে ঢাকার কোথায় কোথায় ডেঙ্গু পরীক্ষা করা যায়, সে বিষয়ে প্রচারের ঘাটতিও পরিলক্ষিত হয়েছে। সিটি করপোরেশনের নগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যেখানে কলকাতায় বিনা মূল্যে দেড় শতাধিক কেন্দ্রে ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৩২টি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের কেন্দ্রগুলোতে কিট সংকটে ডেঙ্গু পরীক্ষা হচ্ছে না।[৩১] ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য সরকারি হাসপাতালে ৫০ টাকা এবং বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে ৩০০ টাকা ফি নির্ধারণ করা হলেও কোনো কোনো বেসরকারি রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে অতিরিক্ত টাকা গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা গেছে। এ ক্ষেত্রে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা দেখা যায়নি।

এডিস মশা নিয়ন্ত্রণ ও চিকিৎসাব্যবস্থায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি

কিছু ক্ষেত্রে মশা নিধনে নিয়োজিত মাঠকর্মীদের ১০০ থেকে ৫০০ টাকা দিলে বাড়িতে গিয়ে 'অধিক কার্যকর ওষুধ' দিয়ে আসার অভিযোগ পাওয়া গেছে। কীটনাশক ক্রয়ে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (ওপেন টেন্ডারিং মেথড) ও সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়ে থাকে। ইজিপির মাধ্যমে ওপেন টেন্ডারিংয়ের কিছু ক্ষেত্রে 'সিঙ্গেল বিডিং'য়ের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। যেমন একটি কীটনাশক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান ওপেন টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে তিনটি সিটি করপোরেশনের ১৬টি ক্রয়াদেশ পায়, যার মধ্যে সাতটিতে তারা একক বিডার হিসেবে টেন্ডারে অংশগ্রহণ করে। অন্যদিকে কীটনাশক ক্রয়াদেশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য লক্ষ করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নিম্নমানের কীটনাশক সরবরাহের অভিযোগ পাওয়া গেছে। একটি প্রতিষ্ঠান ক্রয়াদেশে উল্লিখিত দেশ থেকে কীটনাশক ক্রয় না করে প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে অন্য দেশ থেকে কীটনাশক আমদানি করে। ওই কীটনাশক আমদানির ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উদ্ভিদ সংরক্ষণ উইং থেকে কীটনাশকের নিবন্ধন গ্রহণ করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি।[৩২] জালিয়াতির মাধ্যমে আমদানিকৃত নিবন্ধনবিহীন কীটনাশক যথাযথভাবে পরীক্ষা না করেই মশা নিধন কার্যক্রমে ব্যবহার করা হচ্ছে।[৩৩]

ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাব্যবস্থায় অনিয়ম ও দুর্নীতি

চিকিৎসাসামগ্রীর বাজারমূল্য নিয়ন্ত্রণ এবং ক্রয় ও সরবরাহ

ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসাব্যবস্থার ক্ষেত্রেও অনিয়ম-দুর্নীতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি করে ১০০ টাকার শিরায় দেওয়া স্যালাইন ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে।[৩৪] ঢাকার বাইরে ডেঙ্গু পরীক্ষার সুবিধা অপ্রতুল ছিল; বিশেষ করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসহ পৌরসভা এলাকার বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ডেঙ্গু কিট সংকট লক্ষ করা যায়।[৩৫] ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও রোগীদের ভয়াবহ আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এবং সংবাদমাধ্যমের প্রাপ্ত তথ্যমতে, একজন জটিল ডেঙ্গু রোগীর চিকিৎসা

ব্যয় সরকারি হাসপাতালে দৈনিক ৭ হাজার ১৪২ টাকা এবং বেসরকারি হাসপাতালে আইসিইউসহ দৈনিক ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা পর্যন্ত ব্যয় করতে হয়েছে। সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাসেবায় সংকট থাকায় প্রায় ১০ গুণ অর্থ ব্যয় করে বেসরকারি হাসপাতাল থেকে ডেঙ্গু রোগীরা সেবা নিতে বাধ্য হয়েছে।[৩৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে প্লাটিলেট কেন্দ্রীভূত (কনসেনট্রেশন) করার জন্য সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন রাজধানীসহ সারা দেশের মাত্র ১৯টি সরকারি হাসপাতালে সরবরাহ করেছে, যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল ছিল।[৩৭]

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দেশে ডেঙ্গুর প্রকোপ ধারাবাহিকভাবে বছরব্যাপী বিদ্যমান থাকলেও এই রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে রাজনৈতিক ও সরকারিভাবে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। আইন অনুযায়ী সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতাও লক্ষ করা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড ও আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসরণ না করে এবং কোভিড-সংকট মোকাবিলার অভিজ্ঞতা কাজে না লাগিয়ে সমন্বয়হীনভাবে ডেঙ্গু প্রতিরোধ এবং মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে সুশাসনের ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে। সুনির্দিষ্ট কৌশলবিহীন ও বিচ্ছিন্নভাবে পরিচালিত ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কার্যকর না হওয়া এবং ডেঙ্গুর প্রকোপ দেশব্যাপী ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া ও বছরব্যাপী অব্যাহত থাকার অন্যতম কারণও হচ্ছে মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি। ঢাকার বাইরে এডিস মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং ডেঙ্গু রোগের পর্যাপ্ত চিকিৎসাব্যবস্থা না থাকা এ বছর আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা ব্যাপক আকার ধারণের অন্যতম কারণ।

সুপারিশমালা

এডিস মশা ও ডেঙ্গু রোগ প্রতিরোধে এবং নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ফলাফলের আলোকে নিচের সুপারিশগুলো প্রস্তাব করা হলো–

১. ডেঙ্গুকে জাতীয় স্বাস্থ্যসংকট হিসেবে বিবেচনা সাপেক্ষে যথাযথ রাজনৈতিক ও সরকারিভাবে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সমন্বয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা ও মানদণ্ড অনুসরণ করে এডিস মশাসহ অন্যান্য মশা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে 'ন্যাশনাল ইন্টিগ্রেটেড ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' প্রণয়ন করতে হবে।

২. পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খাত ও প্রতিষ্ঠান এবং অংশীজনদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৩. পরিকল্পনা অনুসারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় বা দপ্তরের কর্মকর্তা, জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, কীটতত্ত্ববিদ, এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে 'ডেঙ্গু প্রতিরোধবিষয়ক জাতীয় কমিটি' করতে হবে, যারা কর্ম পরিকল্পনার যথাযথ বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন ও তদারকি করবে।

৪. মশক নিয়ন্ত্রণে সব ধরনের পদ্ধতির (পরিবেশগত পদ্ধতি, জৈবিক পদ্ধতি, রাসায়নিক পদ্ধতি, যান্ত্রিক পদ্ধতি) ব্যবহার নিশ্চিত করে সারা দেশে বছরব্যাপী সমন্বিত কার্যক্রম নিতে হবে।

৫. মশা নিধনে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে (যেমন মশার উৎস নির্মূল– বহুতল স্থাপনার প্রতিটি তলায় মশার উৎস চিহ্নিতকরণ ও নির্মূল, দুটি ভবনের মধ্যবর্তী জন-চলাচলহীন অংশে জমে থাকা পরিত্যক্ত বর্জ্য অপসারণ ইত্যাদি)।

৬. মশক প্রতিরোধে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানদণ্ড অনুসারে সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৭. উপযুক্ত কীটনাশক নির্ধারণ, কীটনাশকের কার্যকারিতা ও মশার কীটনাশক সহনশীলতা পরীক্ষা, বিভিন্ন পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগসহ মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত সব ধরনের মশক নিধন কার্যক্রম তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. মশক নিধনে শিক্ষার্থী, স্কাউটস, গার্লস গাইড, এনজিওকর্মীদের সম্পৃক্ত করে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে এলাকা বা মহল্লাভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে হবে। মশক নিধনকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে নিয়মিতভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে।

৯. সিটি করপোরেশন বা পৌরসভার জনসংখ্যা, আয়তন, হোল্ডিং সংখ্যা, ডেঙ্গু আক্রান্তের হার, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা ইত্যাদি বিবেচনা করে মাঠপর্যায়ের জনবলের চাহিদা নিরূপণ এবং জনবল নিয়োগ বা আউটসোর্সিং করতে হবে। এর জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় উপকরণের মজুদ ও সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।

১০. দেশের সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল এবং রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র থেকে ডেঙ্গু রোগের পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা বিষয়ক তথ্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের একটি কেন্দ্রীয় ডেটাবেইসে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ডেঙ্গু সার্ভেইলেন্স ও হটস্পট চিহ্নিত করার কাজে ব্যবহার করতে হবে।

১১. প্রাক-বর্ষা মৌসুমে কেন্দ্রীয় ডেটাবেইসে ডেঙ্গু রোগী চিহ্নিত হওয়ার সাথে সাথে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিতে হবে।

১২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন গবেষণাপ্রতিষ্ঠান বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তা নিয়ে প্রতিবছর ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব শুরুর আগেই সারা দেশে নিয়মিতভাবে মশা জরিপ করতে হবে।

১৩. জনস্বাস্থ্য গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী ডেঙ্গুর সার্ভেইলেন্স করা এবং এলাকাভিত্তিক সংক্রমণের ধরন, প্রাদুর্ভাবের কারণ চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে হবে।

১৪. মশা জরিপ বা সার্ভেইলেন্সের মাধ্যমে চিহ্নিত হটস্পট বা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বিশেষ দল বা র‍্যাপিড অ্যাকশন টিমের মাধ্যমে নজরদারির ব্যবস্থা এবং তাৎক্ষণিকভাবে সমন্বিত পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৫. কোভিড-১৯-এর অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র চালু করতে হবে, যেখানে বিনা মূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার সুবিধা রাখতে হবে। কোন কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডেঙ্গু পরীক্ষা করানো হয়, সে বিষয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

১৬. জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, কীটতত্ত্ববিদ, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি গবেষণা সংস্থার মাধ্যমে ডেঙ্গুবিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

১৭. এডিস মশা, ডেঙ্গু রোগের প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে করণীয় সম্পর্কে অবহিত করতে সব যোগাযোগমাধ্যমে (সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম) প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে। এলাকাভিত্তিক মাইকিং, গান, পথনাটক, ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ-সংক্রান্ত প্রচার কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

১৮. পাঠ্যপুস্তকে সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, মশাবাহিত সংক্রামক রোগসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে করণীয় সম্পর্কিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

১৯. মশক নিধন কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতি ও দায়িত্বে অবহেলার বিষয়গুলো তদন্ত করে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

২০. এডিস মশা ও ডেঙ্গু রোগের প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে অবহিত করা, আক্রান্ত ব্যক্তির পরীক্ষা ও চিকিৎসাসেবা বিষয়ক তথ্য প্রাপ্তি এবং মশক নিধন ও চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য একটি সমন্বিত হটলাইন নম্বরের ব্যবস্থা করতে হবে।

২১. মশক নিধন ও ডেঙ্গু রোগের চিকিৎসাব্যবস্থা সম্পর্কিত গৃহীত কার্যক্রমবিষয়ক প্রতিবেদন, বিভিন্ন কমিটি সভার কার্যবিবরণী ইত্যাদি প্রকাশ করতে হবে।

তথ্যসূত্র

[১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, *ডেঙ্গু অ্যান্ড সিভিয়ার ডেঙ্গু*, ১৭ মার্চ, ২০২৩, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue (২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩)।

[২] পারনালী ধর চৌধুরী, সি. এমদাদ হক, এবং এস মিশেল ড্রিজার। 'ডেঙ্গু ডিজিস রিস্ক মেন্টাল মডেলস ইন দ্য সিটি অব ঢাকা, বাংলাদেশ: জাক্সটাপজিসন্স অ্যান্ড গ্যাপস বিটুইন দ্য পাবলিক অ্যান্ড এক্সপার্টস' *রিস্ক অ্যানালাইসিস*, ৩৬, নং ৫ (২০১৬): ৮৭৪-৮৯১, https://www.researchgate.net/publication/282047789 ।

[৩] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *ন্যাশনাল হেলথ বুলেটিন ২০১৭*, http://www.dghs.gov.bd/images/docs/Publicaatios/HealthBulletin2017Final13_01_2018.pdf (১০ অক্টোবর, ২০২৩)।

[৪] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *ডেঙ্গু প্রেস রিলিজ*, ২৫ অক্টোবর, ২০২৩, https://old.dghs.gov.bd/index.php/bd/home/5200-daily-dengue-status-report ।

[৫] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *ডেঙ্গু প্রেস রিলিজ*, প্রাগুক্ত।

[৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *ডেঙ্গু প্রেস রিলিজে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ।*

[৭] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *ডেঙ্গু প্রেস রিলিজ*, প্রাগুক্ত।

[৮] টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি), https://sustainabledevelopment.un.org/sdg3 (২৫ অক্টোবর, ২০২৩)।

[৯] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), *ঢাকা শহরে এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়*, ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯, https://www.ti-bangladesh.org/articles/research/6087 ।

[১০] ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি), *পলিসি ব্রিফ, মশা নিয়ন্ত্রণ ও ডেঙ্গু প্রতিরোধে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ এবং উত্তরণের উপায়*, ৭ জুলাই, ২০২৩, https://www.ti-bangladesh.org/articles/policy-brief/6727।

[১১] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, *হ্যান্ডবুক ফর ইন্টিগ্রেটেড ভেক্টর ম্যানেজমেন্ট,* https://www.who.int/neglected_diseases/vector_ecology/resources/9789241502801/en/ (১৫ অক্টোবর, ২০২৩)।

[১২] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, *ডিজিজ আউটব্রেক নিউজ*, ডেঙ্গু-বাংলাদেশ, প্রাগুক্ত।

[১৩] সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮, http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1274.html?lang=en।

[১৪] স্থানীয় সরকার বিভাগ, *ডেঙ্গুসহ অন্যান্য মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে জাতীয় নির্দেশিকা*, ২০২১, https://lgd.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lgd.portal.gov.bd/publications/66828b17_5d1e_42df_a4c8_7096aad18348/2021-11-09-05-28-129f3b68177ea7c90a1aa1f565e10b8a.pdf (৫ অক্টোবর, ২০২৩)।

[১৫] প্যান আমেরিকান হেলথ অর্গানাইজেশন, রিপোর্টেড কেস অব দ্য ডেঙ্গু ফিভার ইন দ্য আমেরিকা, ২২ অক্টোবর, ২০২৩, https://www3.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/indicadores-dengue-en/dengue-nacional-en/252-dengue-pais-ano-en.html।

[১৬] স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, *ডেঙ্গু প্রেস রিলিজ*, প্রাগুক্ত।

[১৭] বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য সংকলন ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ২২ অক্টোবর, ২০২৩।

[১৮] এমএস হোসেন, এ এ নোমান, এস এ এ মামুন, এট আল. টুয়েন্টি-টু ইয়ারস অব ডেঙ্গু আউটব্রেকস ইন বাংলাদেশ: এপিডেমিওলজি, ক্লিনিক্যাল এক্সপেট্রাম, সেরোটাইপস, অ্যান্ড ফিউচার ডিজিস রিস্ক, *ট্রপ মেড হেলথ*, ৫১, ৩৭ (২০২৩), https://doi.org/10.1186/s41182-023-00528-6 (১২ অক্টোবর, ২০২৩)।

[১৯] জাতীয় সংসদ, *চব্বিশতম অধিবেশনের আলোচনার ধারণকৃত রেকর্ডিং*, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩।

[২০] দৈনিক যুগান্তর, *'ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ করা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাজ নয়: স্বাস্থ্যমন্ত্রী'*, ২৪ জুলাই, ২০২৩, https://www.jugantor.com/national/699697/।

[২১] দ্য ডেইলি স্টার বাংলা, *'মশা মারার দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের একার না : স্থানীয় সরকারমন্ত্রী'*, ৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/politics/news-512316।

[২২] বাংলা ট্রিবিউন, *'সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়ার চেয়ে দেশের ডেঙ্গু পরিস্থিতি ভালো-স্থানীয় সরকারমন্ত্রী'*, ২২ অক্টোবর, ২০২২, https://www.banglatribune.com/national/769080/।

[২৩] দেশ রূপান্তর, *'ডেঙ্গু নির্মূল সম্ভব নয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে'*, ৫ জুলাই, ২০২৩, https://www.deshrupantor.com/capital/2023/07/05/436629/।

[২৪] প্রথম আলো, *'ঢাকায় মশা কমছে না কেন'*, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/ej7d9cby55।

[২৫] বাংলা ট্রিবিউন, *'সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে এডিস, ভয়াবহ স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের শঙ্কা'*, ২৮ আগস্ট, ২০২৩, https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/70208/।

[২৬] বাংলা ট্রিবিউন, *'সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে এডিস, ভয়াবহ স্বাস্থ্য বিপর্যয়ের শঙ্কা'*, ২৮ আগস্ট, ২০২৩, https://bangla.dhakatribune.com/bangladesh/70208/।

[২৭] যমুনা টিভি, '১১ বছরে দুই সিটিতে মশার পেছনে খরচ ১ হাজার ৮০ কোটি টাকা, তবুও কমেনি উপদ্রব', ২০ আগস্ট, ২০২৩, https://jamuna.tv/news/476863।

[২৮] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, 'পুউর ট্রিটমেন্ট, স্যালাইন শর্টেজ এড টু ডেঙ্গু পেশেন্টস ওস আউটসাইড ঢাকা, ৪ জুলাই, ২০২৩, https://www.tbsnews.net/bangladesh/health/women-higher-risks-dengue-cases-deaths-rise-alarmingly-660114।

[২৯] নাজমুল হায়দার, মো. আসাদুজ্জামান, মোহাম্মদ নাঈম হাসান, মাহবুবুর রহমান, আহমেদ রায়হান শরীফ, শাহ আলী আকবর আশরাফী, শুই শান লি এবং আলিমুদ্দিন জুমলা। 'বাংলাদেশস ২০২৩ ডেঙ্গু আউটব্রেক এজ/জেন্ডার-

রিলেটেড ডিসপারিটি ইন মরবিডিটি অ্যান্ড মরটালিটি অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ভেরিয়াবিলিটি অব এপিডেমিক বারডেন।' *ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব ইনফেকসাস ডিজিস*, ১৩৬ (২০২৩): ১-8. https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(23)00711-7/fulltext।

[৩০] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, 'অ্যান্টিজেন টেস্টে নেগেটিভ হলেও *ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকেই: গবেষণা'*, (২ অক্টোবর, ২০২৩), https://publisher.tbsnews.net/bangla/171070।

[৩১] সমকাল, *'ভয় ধরালেও নেই বিনা মূল্যে পরীক্ষার উদ্যোগ'*, (৮ জুলাই, ২০২৩), https://samakal.com/t-20/article/2307182040/।

[৩২] দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, *'ইররেগুলারিটিস ইন বিটিআই ইমপোর্ট: ঢাকা নর্থ বাকলিস্টস মার্শাল অ্যাগ্রোভেট, পান টু স্যু, (১৮ আগস্ট*, ২০২৩), https://www.tbsnews.net/bangladesh/irregularities-bti-import-dhaka-north-blacklists-marshal-agrovet-684630।

[৩৩] বাসস, *'ডেঙ্গুসহ মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম পর্যালোচনায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত'*, ১৯ জুলাই, ২০২৩, https://www.bssnews.net/bangla/national/98931।

[৩৪] মানবজমিন, *'টাকা দিয়েও মিলছে না স্যালাইন'*, (২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩), https://mzamin.com/news.php?news=74888; দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, *'পুউর ট্রিটমেন্ট, স্যালাইন শর্টেজ অ্যাড টু ডেঙ্গু পেশেন্টস ওউস আউটসাইড ঢাকা*, ৪ জুলাই, ২০২৩, https://www.tbsnews.net/bangladesh/health/poor-treatment-saline-shortage-add-dengue-patients-woes-outside-dhaka-704302।

[৩৫] নিউজ বাংলা ২৪.কম, *'কিট সংকটে বন্ধ ডেঙ্গু পরীক্ষা'*, (২২ আগস্ট, ২০২৩), https://www.newsbangla24.com/news/230517/Dengue-test-discontinued-in-kit-crisis; প্রথম আলো, *লক্ষ্মীপুরের সরকারি হাসপাতালে ডেঙ্গু শনাক্তকরণ কিটের সংকট*, (২২ আগস্ট, ২০২৩), https://www.prothomalo.com/bangladesh/district/qbeojhhv22।

[৩৬] বিবিসি নিউজ বাংলা, *'এক পরিবারে ১৭ ডেঙ্গু রোগী, দুই মাসে খরচ ৮ লাখ'* (১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩), https://www.bbc.com/bengali/articles/c16k7nw1jnwo; যুগান্তর। *'ডেঙ্গু চিকিৎসায় আইসিইউ ব্যয়ে রোগীদের নাভিশ্বাস'*, (১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩), https://www.jugantor.com/national/717005/।

[৩৭] ঢাকা পোস্ট, *'ডেঙ্গু পরীক্ষার সরকারি-বেসরকারি ফি কত?'* (২০২৩, জুলাই ৮), https://www.dhakapost.com/health/206637।

গবেষক পরিচিতি

ইকরামুল হক ইভান

টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে সহ-সমন্বয়ক হিসেবে কর্মরত। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি), ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়-এর কমিউনিকেশনস বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। সাংবাদিক হিসেবে দেশের শীর্ষস্থানীয় গণমাধ্যম দৈনিক প্রথম আলো, চ্যানেল টোয়েন্টিফোর, চ্যানেল নাইনে প্রায় ছয় বছর অতিবাহিত করে উন্নয়ন যোগাযোগ পেশায় যুক্ত হন। তার গবেষণা আগ্রহের ক্ষেত্র হচ্ছে– গণমাধ্যম ও নিউ মিডিয়া, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া এবং শুদ্ধাচার।

কাওসার আহমেদ

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট-কোয়ান্টিটেটিভ হিসেবে কর্মরত। টিআইবিতে যোগ দেওয়ার আগে কাওসার আহমেদ ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার নামের সংস্থায় কাজ করেছেন। এর পাশাপাশি তার এশিয়া ফাউন্ডেশন, ইউএনডিপি ও এসডিজির বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি উচ্চশিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে হেলমুট-স্মিট স্কলারশিপ নিয়ে জার্মানি গমন করেন এবং ইউনিভার্সিটি অব এরফুর্টের উইলি ব্র্যান্ট স্কুল অব পাবলিক পলিসি থেকে পাবলিক পলিসি বিষয়ে দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি মূলত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, আমলাতন্ত্রের রাজনৈতিকীকরণ, ফ্রন্টলাইন ব্যুরোক্রেসি এবং নীতি বাস্তবায়নবিষয়ক গবেষণায় আগ্রহী। ২০১৪ সালে প্রকাশিত Local Governance and Decentralization: Politics and Economics শীর্ষক গ্রন্থে তার লেখা তিনটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে।

কাজী মাহদী আমিন

টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে সহ-সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। উন্নয়নকর্মীর পাশাপাশি তিনি একজন ছোটগল্প লেখক ও কবি। তার লেখায় মানুষের অস্তিত্ববাদ, একাকিত্ব, মনস্তত্ত্ব, ও শহুরে জীবনের ছাপ পাওয়া যায়। তা ছাড়া, উন্নয়নকর্মী হিসেবে বিগত ৮ বছরে মাহদী বাংলাদেশের প্রায় সব জেলায় দারিদ্র্য, নারীবান্ধব কর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণ, ডিজিটাল সাক্ষরতা, দুর্নীতি ও শরণার্থী ব্যবস্থাপনা বিষয়ে যোগাযোগবিষয়ক দলিল প্রস্তুত করেছেন। পাশাপাশি উন্নয়নবিষয়ক প্রচার ও জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে তিনি কাজ করে থাকেন। মাহদী আমিন ২০১৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি বিভাগে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন।

কে. এম. রফিকুল আলম

টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগে সহ-সমন্বয়ক, ডেটা ভিজ্যুয়ালাইজেশন হিসেবে কর্মরত। তিনি কম্পিউটার সায়েন্স ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে বিএসসি ও এমএসসির পাশাপাশি ফলিত পরিসংখ্যান ও ডেটা সায়েন্সে দ্বিতীয় মাস্টার্স ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। উন্মুক্ত সরকারি ডেটা ব্যবহার করে সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিতকরণে কৌশল নির্ধারণ এবং কার্যকরী টুল উন্নয়ন তার আগ্রহের প্রধান জায়গা। বাংলাদেশে সরকারি ই-ক্রয়কার্যক্রমে প্রতিযোগিতার প্রবণতা বিশ্লেষণ (২০১২-২০২৩) বিষয়ক প্রকাশনা যার বড় উদাহরণ। বাংলাদেশ ও নেপালের সরকারি ক্রয়কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে একটি স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং টুল (ই-পিএমএস) উন্নয়নে তার পরিকল্পনা কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হ্যাককরাপশন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছে। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামার ভিত্তিতে হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি (Know Your Candidate-KYC) ড্যাশবোর্ড তৈরিও তার অন্যতম আলোচিত কাজ। স্কোপাস-ইনডেক্স জার্নাল ও কনফারেন্সে রফিকুল আলমের ৪টি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

তাসলিমা আক্তার

কনসালট্যান্ট হিসেবে বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রম ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ করেন। তিনি টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য খাত ও স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান, মাধ্যমিক শিক্ষা এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও প্রক্রিয়া। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জরিপের সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন।

ফাতেমা আফরোজ

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সিভিল সার্ভিস কলেজ থেকে গভর্নেন্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং ভিয়েনাভিত্তিক ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্টি-করাপশন অ্যাকাডেমিতে মাস্টার অব আর্টস ইন অ্যান্টি-করাপশন স্টাডিজ বিষয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সুশাসন, দুর্নীতি, জাতীয় সংসদ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, জেন্ডার ইত্যাদি।

ফারহানা রহমান

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তিনি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় স্থানীয় সরকার খাত ও প্রতিষ্ঠান। এ ছাড়া তিনি প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, জাতীয় বাজেট পর্যালোচনা, ২০০৪ সালের বন্যা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, এলআর ফান্ড, রাজউক, প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে গবেষণা করেছেন। এ ছাড়া টিআইবির জাতীয় খানা জরিপের সাথে তিনি বিশেষভাবে জড়িত।

মুহাম্মদ বদিউজ্জামান

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে পরিচালক হিসেবে কর্মরত। একজন উন্নয়ন গবেষক হিসেবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি-সংঘাত, স্থানীয় সরকার, সুশাসনসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণা প্রবন্ধগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। 'বাংলাদেশে স্থানীয় শাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ : রাজনীতি ও অর্থনীতি' বইয়ে তার একাধিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন এবং পরে নেদারল্যান্ডসের ইরাসমাস ইউনিভার্সিটি রটারডাম থেকে উন্নয়ন গবেষণায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

মো. জুলকারনাইন

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর এবং পরে স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে জনস্বাস্থ্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়ের মধ্যে রয়েছে সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও ব্যাংকিং খাত এবং এসব খাতভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি। এ ছাড়া তিনি টিআইবির জাতীয় খানা জরিপসহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন জরিপের সাথেও জড়িত ছিলেন। টিআইবি ছাড়াও তিনি পপুলেশন কাউন্সিল বাংলাদেশ, জেমস পি গ্রান্ট স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও ফোরাম ফর পাবলিক হেলথ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কাজ করেছেন।

মো. নেওয়াজুল মওলা

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ ফেলো-ক্লাইমেট ফাইন্যান্স গভর্নেন্স (সিএফজি) হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরবর্তীতে তিনি ইনডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ থেকে ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে মাস্টার অব সাইন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। সামাজিক গবেষণা এবং এর বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার নিবিড় অভিজ্ঞতা রয়েছে। টিআইবিতে 'জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন' ইউনিটে কাজের সুবাদে তিনি পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং অর্থায়নসংক্রান্ত বিষয়ের সুশাসনগত দিকগুলো বিশ্লেষণ করেন এবং জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের ওপর বিভিন্ন গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। টিআইবিতে যোগদানের আগে তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি, আইসিডিডিআরবি এবং ব্র্যাকের সাথে কাজ করেছেন। তার কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণায় তার আগ্রহের ক্ষেত্রগুলো হলো পরিবেশ ও জলবায়ু, জলবায়ু অভিযোজন ও অর্থায়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের সুশাসন, জলবায়ুতাড়িত অভিবাসন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

মো. মাহ্ফুজুল হক

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (সিএফজি) হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন

করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন, জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন, পানি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয় তার গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। তার গবেষণা কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন এবং সুশাসন, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, অভিযোজন অর্থায়নে সুশাসনের মানদণ্ড নির্ধারণ, বন্যা মোকাবিলায় প্রস্তুতি এবং ত্রাণ কার্যক্রমে শুদ্ধাচার পর্যবেক্ষণ।

মো. মোস্তফা কামাল

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয় হচ্ছে সুশাসন, দুর্নীতি, পাবলিক বিশ্ববিদ্যলয়ে প্রভাষক নিয়োগ, প্রান্তিক মানুষ ও সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, নগর ব্যবস্থাপনা, এসডিজি, এনজিও ইত্যাদি। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইসিডিডিআরবিতে স্বাস্থ্য খাতের একাধিক গবেষণাকর্মে সম্পৃক্ত ছিলেন।

মো. সহিদুল ইসলাম

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট (সিএফজি) হিসেবে কর্মরত। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। পরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাজবিজ্ঞানে এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। টিআইবিতে যোগ দেওয়ার আগে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (বিআইডিএস), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ ট্রাস্ট এবং ইনস্টিটিউট অব কালচারাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিসার্চসহ (আইসিডিআর) বিভিন্ন স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের সাথে গবেষণার কাজ করেছেন। তার গবেষণার ক্ষেত্র সামাজিক পুঁজি, প্রজননস্বাস্থ্য, অভিবাসন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নীতি। এ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক জার্নালে তার ৪০টির বেশি গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

মো. সাজ্জাদুল করিম

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি বাংলাদেশ সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড স্টাডিজ (বিসিএএস) প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার গবেষণার মূল বিষয়গুলোর মধ্যে চিকিৎসাবর্জ্য ব্যবস্থাপনা, জলবায়ু পরিবর্তন (প্রশমন, অভিযোজন ও অর্থায়ন), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পানিসম্পদ উন্নয়ন, সংসদ ব্যবস্থা, জেন্ডার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

মো. সাজেদুল ইসলাম

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে ডেটা অ্যানালিস্ট হিসেবে কর্মরত। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্যপ্রযুক্তি এবং ফলিত পরিসংখ্যান ও তথ্যবিজ্ঞানের ওপর আরও দুটি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি

অর্জন করেন। ডেটাবেইস এবং ডেটা বিশ্লেষণে তার গভীর অভিজ্ঞতা রয়েছে। টিআইবিতে কাজ করার সময় তিনি সেবা খাতে দুর্নীতি : জাতীয় খানা জরিপ ২০২১, ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে সুশাসনসহ বিভিন্ন গবেষণায় ডেটা বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। টিআইবিতে যোগ দেওয়ার আগে তিনি জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচিতে গভর্নমেন্ট ক্যাপাসিটি বৃদ্ধিকরণ প্রোগ্রামে কাজ করেছেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশের কয়েকটি স্বনামধন্য সফটওয়্যার কোম্পানিতে সফটওয়্যার প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান সাখিদার

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট-কোয়ান্টিটেটিভ হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। টিআইবিতে কাজ করার আগে তিনি আইইডিসিআর, আইপাস বাংলাদেশ এবং এমিনেন্সের মতো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে গবেষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার গবেষণার মূল বিষয়গুলোর মধ্যে জনস্বাস্থ্য, জেন্ডার, জলবায়ু পরিবর্তন, সংসদব্যবস্থা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া গবেষণা ও তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতির ওপর আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম

টিআইবির আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের পচিালক। তিনি একাধারে গণমাধ্যম ও উন্নয়নকর্মী। ব্যবসা ও অর্থনৈতিক সাংবাদিকতায় ১৮ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মোহাম্মদ তৌহিদ বর্তমানে উন্মুক্ত ডেটার ব্যবহার ও দেশে ডেটা সাংবাদিকতা বিস্তারে কাজ করছেন। উন্মুক্ত সরকারি ডেটা ব্যবহার করে সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিত করণে কৌশল নির্ধারণ এবং কার্যকরী টুল উন্নয়ন তার আগ্রহের প্রধান জায়গা। বাংলাদেশে সরকারি ই-ক্রয়কার্যক্রমে প্রতিযোগিতার প্রবণতা বিশ্লেষণ (২০১২-২০২৩) বিষয়ক প্রকাশনা যার বড় উদহারণ। বাংলাদেশ ও নেপালের সরকারি ক্রয়কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে একটি স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং টুল (ই-পিএমএস) উন্নয়নে তার পরিকল্পনা কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হ্যাককরাপশন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছে। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামার ভিত্তিতে হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি (Know Your Candidate-KYC) ড্যাশবোর্ড তৈরিও তার অন্যতম আলোচিত কাজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ডিগ্রি অর্জনকারী মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম ২০১৫ সালে জাতিসংঘের রেহাম-আল ফারাহ মেমোরিয়াল জার্নালিস্ট ফেলো হিসেবে নির্বাচিত হন। তিনি দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ে অস্ট্রিয়ার ইন্টারন্যাশনাল এন্টি-করাপশন একাডেমি (আইএসিএ) থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন।

রাজিয়া সুলতানা

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ ফেলো হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি সিউল, দক্ষিণ কোরিয়ার ইউহা উইমেনস ইউনিভার্সিটি থেকে সমাজকল্যাণ নীতিতে পিএইচডি এবং মাস্টার্স সম্পন্ন করেছেন।

তিনি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি) প্রতিষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েট রিসার্চ ফেলো হিসেবে কাজ করেছেন। এ ছাড়া তিনি কোরিয়ায় খণ্ডকালীন গবেষণা সহকারী হিসেবে কাজ করার পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে অংশগ্রহণ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ড. রাজিয়া বর্তমানে কোরিয়ায় ইউহা উইমেনস ইউনিভার্সিটির সমাজকল্যাণ বিভাগের 'সোশ্যাল ইমপ্যাক্ট ল্যাব'-এ গবেষণার সাথেও জড়িত আছেন। তার গবেষণা এবং প্রকাশনার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জেন্ডার, অভিবাসন এবং অসমতা, সোশ্যাল ইন্টারপ্রাইজ, সামাজিক নীতি মূল্যায়ন, প্রান্তিক মানুষ ও সম্প্রদায়ের উন্নয়ন গবেষণা, অরগানাইজেশন ডাইভারসিটি ও কালচার এবং সুশাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়। তার চারটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ আন্তর্জাতিক জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

রাবেয়া আক্তার কনিকা

টিআইবির গবেষণা ও পলিসি বিভাগে রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট-কোয়ালিটেটিভ হিসেবে কর্মরত। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। গুণগত গবেষক হিসেবে তিনি সিআইপিআরবি এবং আইপাস বাংলাদেশসহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন। তার গবেষণার প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে জনস্বাস্থ্য, জেন্ডার, নগর উন্নয়ন, গণতন্ত্র অধ্যয়ন, সংসদ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

রিফাত রহমান

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিভাগ থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন। ডেটা অ্যানালাইসিসের প্রতি আগ্রহ থাকায় মাইক্রোসফট থেকে ডেটা ম্যানেজমেন্ট বিষয়েও তিনি কোর্স সম্পন্ন করেছেন। তিনি ১০ বছর যাবৎ ডেটাপ্রক্রিয়া ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন বহুজাতিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় কাজ করেছেন। রিফাত রহমান জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুদের "কাজের বিনিময়ে অর্থ" কর্মসূচির জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় "ট্র্যাকিং অ্যান্ড পেমেন্ট সিস্টেম" ডেভেলপ করেন, যা এখন পর্যন্ত ১ লাখের বেশি রোহিঙ্গা পরিবারকে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া, উন্মুক্ত সরকারি ডেটা ব্যবহার করে সুশাসনের সমস্যা চিহ্নিতকরণে কৌশল নির্ধারণ এবং কার্যকরী টুল উন্নয়ন তার আগ্রহের প্রধান জায়গা। বাংলাদেশে সরকারি ই-ক্রয়কার্যক্রমে প্রতিযোগিতার প্রবণতা বিশ্লেষণ (২০১২-২০২৩) বিষয়ক প্রকাশনা যার বড় উদাহরণ। বাংলাদেশ ও নেপালের সরকারি ক্রয়কার্যক্রমের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে একটি স্বয়ংক্রিয় মনিটরিং টুল (ই-পিএমএস) উন্নয়নে তার পরিকল্পনা কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত হ্যাককরাপশন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার জিতেছে। ২০২৪ সালে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া প্রার্থীদের হলফনামার ভিত্তিতে হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি (Know Your Candidate-KYC) ড্যাশবোর্ড তৈরিও তার অন্যতম আলোচিত কাজ।

দেশব্যাপী দুর্নীতিবিরোধী চাহিদা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান; সরকারি ও বেসরকারি সেবা খাতে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ, বিশেষত দুর্নীতির প্রকৃতি, প্রক্রিয়া, মাত্রা ও ব্যাপকতা নিরূপণের জন্য টিআইবি গবেষণা ও তার ভিত্তিতে অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সরকার ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, নীতি ও কৌশলকাঠামোয় প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের দুর্নীতিবিরোধী ও সুশাসন-সহায়ক আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুদৃঢ় করা এবং প্রয়োগে সহায়ক ভূমিকা পালন করা এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

টিআইবি পরিচালিত ও প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ নিয়ে 'বাংলাদেশে সুশাসনের সমস্যা : উত্তরণের উপায়' শীর্ষক ১৩টি সংকলন ইতিমধ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের চতুর্দশতম সংকলন ২০২৪ সালের অমর একুশে বইমেলা উপলক্ষে প্রকাশিত হলো। সংকলনটিকে দুইটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে– প্রথম অধ্যায়ে শুদ্ধাচার ব্যবস্থা এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেবা খাত নিয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণার সারসংক্ষেপ সংকলিত হয়েছে।

মূল্য : ৪০০ টাকা

978-984-35-6013-1

Transparency International Bangladesh (TIB)
MIDAS Centre (Levels 4 & 5)
House 05, Road 16 (New) 27 (Old), Dhanmondi, Dhaka 1209
Tel: (+880-2) 41021267-70, Fax: (+880-2) 41021272

info@ti-bangladesh.org **www.ti-bangladesh.org** **TIBangladesh**